রাসায়েল ও মাসায়েল

৭ম খন্ড

জাস্টিস মালিক গোলাম আলী

রাসায়েল ও মাসায়েল

সপ্তম খন্ড

বিচারপতি মালিক গোলাম আলী

অনুবাদ

আকরাম ফারুক

মুনীরুযযামান ফরিদী

সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবাইল : ০১৭৫৩৪২২২৯৬

E-mail : shotabdipro@yahoo.com

www.moudoodiacademy.org

রাসায়েল ও মাসায়েল ৭ম খণ্ড
বিচারপতি মালিক গোলাম আলী

অনুবাদ
আকরাম ফারুক
মুনীরুযযামান ফরিদী

সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শ. প্র : ৩৭
ISBN 984-645-014-1

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩১১২৯২, মোবা : ০১৭৫৩৪২২২৯৬
ই-মেইল shotabdipro@yahoo.com
www.moudoodiacademy.org

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৯৫
তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা মাত্র

RASAIL O MASAIL Vol. 7 By Justice Malik Ghulam Ali, Published by Shotabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone 8311292, Mob 01753422296, E-mail: shotabdipro@yahoo.com www.moudoodiacademy.org, First Edition August 1995, 3rd Print: February 2012.

Price Tk. 140.00 Only.

আমাদের কথা

বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর বিখ্যাত গ্রন্থ রাসায়েল ও মাসায়েলের পরিচয় নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। দেশ-বিদেশের লোকেরা মাওলানাকে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্দোলন, সংগঠনসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল দিক ও বিভাগের উপর অসংখ্য প্রশ্ন করেছেন। তিনি তাঁর সম্পাদিত তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে এ সকল প্রশ্নের প্রামাণ্য, যুক্তিভিত্তিক ও সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন। পত্রিকায় এ প্রশ্নোত্তরগুলো 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এ শিরোনামে মাওলানা যেসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সেগুলো গ্রন্থাকারে পাঁচ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচটি খন্ডই বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিদেশ ভ্রমণ, কারানির্যাতন এবং অসুস্থতা ও ব্যস্ততাসহ বিভিন্ন কারণে তিনি নিজের কলমে উক্ত শিরোনামের সবগুলো প্রশ্নের জবাব দেবার সুযোগ পাননি। তাঁর সুযোগ্য বিশেষ সহকারী ছিলেন বিচারপতি মালিক গোলাম আলী। দীনী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে মাওলানার সাথীত্বে থেকে তিনি নিজেকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন একজন সেরা আলেমের মর্যাদায়। তিনিই রাসায়েল ও মাসায়েল শিরোনামের সেসব প্রশ্নের জবাব দেন। মাওলানার ইন্তেকালের পরেও তাঁর জবাবদানের ধারা অব্যাহত থাকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জবাব সম্বলিত রাসায়েল ও মাসায়েল দুই খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ ৬ষ্ঠ ও ৭ম খন্ড।

ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী রাসায়েল ও মাসায়েল ৬ষ্ঠ খন্ড ইতোমধ্যেই অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে। ৭ম খন্ডও এখন পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারায় মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং এ গ্রন্থকে তাঁর বান্দাদের সঠিক দীনী জ্ঞান লাভের মাধ্যম বানিয়ে দিন। আমীন।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ঢাকা

প্রশ্নোত্তর

কতিপয় নিবন্ধ

প্রশ্নোত্তর

রসূলের (সঃ) স্বভাব সম্পর্কে পারদর্শী হওয়ার দাবী

প্রশ্ন ঃ কাদিয়ানী সম্প্রদায় এবং হাদীস অস্বীকারকারীরা মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছে যে, মাওলানা মওদূদী রসূলের স্বভাব সম্পর্কে পারদর্শী হওয়ার দাবী করেছেন। তারা বলে, তিনি নাকি গোটা হাদীস সম্ভার থেকে যে কোনো হাদীসকেই শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ বলার অধিকার রাখেন। তারা আরো বলছে, মুনীর তদন্ত কমিশনের সামনে মাওলানা আমীন আহ্সান ইসলাহী একথা স্বীকারও করেছেন।

অভিযোগকারীরা এ ব্যাপারটিকে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর "নুবুওয়াত" দাবীর সমপর্যায়ভুক্ত এক মহা অপরাধ সাব্যস্ত করছে। দয়া করে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা দিন।

উত্তর ঃ আপনি যে অপবাদ ছড়ানোর উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে আমরাও অবহিত। জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার অভিযানের এটি একটি অংশ বিশেষ মাত্র। আপনার প্রশ্ন দেখে মনে হয়, আপনি পুরাপুরিভাবে বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। এজন্য আপনার মনের প্রশান্তি ও পূর্ণ জ্ঞান লাভের লক্ষ্যে সংক্ষেপে হলেও বিষয়টি তুলে ধরছি ঃ

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর যে বক্তব্য দুটিকে ভিত্তি করে এই অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে, সর্বপ্রথম সে দু'টিকে উদ্ধৃত করা সমীচীন হবে। 'তাফ্হীমাত' গ্রন্থের 'কুরআন ও হাদীস' এবং 'ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা' নামক দুটি প্রবন্ধে সে কথাগুলো রয়েছে। সেখান থেকে বক্তব্য দুটি উদ্ধৃত করা হলো ঃ

> 'উসূলে দিরায়াত' (হাদীসের ভাষা, বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গী পর্যালোচনার মাধ্যমে তার সত্যাসত্য নিরূপণের নীতিমালা) দ্বারা হাদীসের যথার্থতা ঐ ব্যক্তিই করতে পারেন, যিনি কুরআনের গভীর জ্ঞান অর্জন করে ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ অতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং হাদীস ভান্ডারের অধিকাংশ গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে হাদীস যাচাই করার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দক্ষতা লাভ করেছেন। অত্যধিক জ্ঞান-গবেষণা এবং পুনঃ পুনঃ চর্চা আলোচনার ফলে মানুষের মধ্যে এমন এক নৈপূণ্য ও দক্ষতা জন্মে যদ্দরুন তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেন এবং ইসলামের চেতনা ও মূলমন্ত্র তার মন-মগজে বদ্ধমূল হয়ে যায়। অতঃপর একটি হাদীস দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে

পারেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে এমন কথা বলা অথবা এমন কাজ করা সম্ভব ছিল কিনা?"

"মা'আয্ আল্লাহ! (আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই) এর অর্থ কখনো এ নয় যে, তাঁরা (আইম্মায়ে মুজ্‌তাহিদীন) কোনো হাদীসকে শুদ্ধ জেনেও তা বর্জন করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁদের নিকট হাদীসের বিশুদ্ধতা শুধু বাইরের দলিল প্রমাণ তথা সনদের উপর নির্ভরশীল ছিলনা। বরঞ্চ বর্ণনাকারীদের সূত্র ও সনদ ব্যতীত অন্য একটি কষ্টিপাথরও তাদের নিকট বর্তমান ছিল, যদ্বারা তারা হাদীসসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালাতেন। সেই কষ্টি পাথরে যাচাই করে যখন কোন হাদীস সম্পর্কে তারা নিশ্চিন্ত হতেন যে, এটি সত্যের কাছাকাছি, তখন তাঁরা সেটিকে গ্রহণ করতেন। চাই তা নিছক হাদীস শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে কম গ্রহণীয় হোকনা কেন। এই দ্বিতীয় কষ্টি পাথর কোনটি? আমরা পূর্বেই ইংগিত করেছি যে, যাকে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনী বুঝ ও অন্তর্দৃষ্টি (তাফাক্‌কুহ) দানে অনুগৃহীত করেছেন, তার মধ্যে কুরআন ও সীরাত (রসূলের জীবনচরিত) সম্বন্ধে সুগভীর ও সুবিস্তৃত পড়াশুনা করার কারণে এক বিশেষ ধরনের প্রকৃতি জন্মে। এর একটি সুন্দর উদাহরণ হলো, একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ স্বর্ণকারের অন্তর্দৃষ্টি যা ধাতুর সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গুণাগুণ পর্যন্ত পরখ করে থাকে। তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সামগ্রিকভাবে শরী'আতের গোটা বিধানের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। ঐ বিধানের মূল প্রকৃতি তার নখদর্পণে থাকে। অতঃপর তার সামনে যখন খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এসে হাজির হয়, তখন তাঁর সূতীব্র রুচি বা বোধশক্তি তাকে বলে দেয় কোন জিনিসটি ইসলামের স্বভাব ও তার প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আর কোনটি নয়। হাদীস শাস্ত্রের রিওয়ায়াতসমূহের প্রতি যখন তিনি দৃষ্টি দেন, তখন তাঁর এ কষ্টি পাথরই গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে মানদণ্ডে পরিণত হয়। ইসলামের স্বভাব প্রকৃতিও হুবহু নবীসত্তারই স্বভাব প্রকৃতি। যে ব্যক্তি ইসলামের স্বভাব ও মেজাজ উপলব্ধি করতে পারে এবং বেশী করে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রসূলের গভীর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান চালিয়ে যায়, সে ব্যক্তি রসূলের স্বভাব সম্পর্কে এমন পারদর্শী হয়ে যায় যে, হাদীসের বর্ণনাসমূহ দেখার সাথে সাথেই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে দেয় যে, তার ভেতর কোন্ কথাটি কিংবা কোন কাজটি তার প্রাণাধিক প্রিয় রসূলের হয়ে থাকতে পারে? কিংবা কোনটি সুন্নাতে নববীর নিকটবর্তী? এমন কি যে সব 'মাসায়েল' বা বিষয়াদি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাতে কোনো দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়না সে ব্যাপারেও তিনি বলতে পারেন যে, নবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যদি অমুক মাস'আলাটি উত্থাপন করা হতো, তাহলে তিনি সেটার ফায়সালা এরূপ দিতেন।"

মাওলানা মওদূদীর উপরোক্ত বক্তব্য দুটি থেকে তিনটি কথা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হচ্ছেঃ

এক, লেখক নিজের জন্য এ দাবী করছেননা যে, তিনি রসূল (সঃ)-এর স্বভাব সম্পর্কে পারদর্শী। বরং তিনি হাদীস শাস্ত্রের বিজ্ঞ ইমামদের জন্য এক সাধারণ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন মাত্র।

দুই, কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে নববী এবং হযরতের আদেশ-নির্দেশাবলী সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা অনুসন্ধান এবং পৌনঃপুণিক চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে বিশেষ একটি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা জন্ম নেয়। ঐ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে একজন হাদীস অনুসন্ধানী তার নিখুঁত রুচি এবং বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা এবং অনুভূতি ও উপলব্ধির সাহায্যে হাদীসের শব্দ ও মর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখেই সহসা বলে দিতে পারেন, এ বাণীটি নবী (সঃ)-এর অথবা এটি তাঁর নয়।

তিন, এই ধরনের রুচি বা প্রজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি হাদীস পরখ ও যাচাই করার একমাত্র মাপকাঠি নয়। বরং হাদীস পরীক্ষণের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে এটিও একটি উপায় মাত্র। এখন এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল, যে ব্যক্তি লেখকের ঐ উক্তিসমূহ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, লেখক এ সমস্ত আলোচনা এজন্য করেছেন যাতে তিনি রসূলের স্বভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ বলে পরিচিত হন; সে ব্যক্তির মিথ্যাচার, জালিয়াতি ও ধোঁকাবাজি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

এখানে অবশ্যি দুটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করা যেতে পারে, এক, বাস্তবিক পক্ষে কি হাদীসবেত্তাগণ এরূপ বলেছিলেন, নাকি মাওলানা মওদূদী তাঁদের নামে এ কথা চালিয়ে দিয়েছেন? দুই, মুহাদ্দিসীনে কিরাম যদি এ অভিমত দিয়েই থাকেন, তবে তা কতটুকু শুদ্ধ বা অশুদ্ধ? প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, সকল হাদীস বেত্তাই এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এই শাস্ত্রীয় রুচিবোধ শক্তির ভিত্তিতে অনেক হাদীস সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন ঃ

الحديث عليه ظلمة او متنه مظلم.

অর্থাৎ এ হাদীসের উপর অন্ধকার পড়েছে কিংবা এর বক্তব্য অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কোনো কোনো সময় কোনো হাদীস দেখেই তারা বলেছেন, "আমাদের মন এটিকে কবুল করতে অস্বীকার করছে। এখানে বেশী অভিমতের উদ্ধৃতি দেয়া অসম্ভব। তবে কিছু উদ্ধৃতি আমরা অবশ্যি এক্ষেত্রে পেশ করছিঃ

হযরত হাকিম (রহঃ) স্বীয় বিখ্যাত "মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস-হাদীস বিজ্ঞানের পরিচয়" উল্লেখ করেছেন ঃ ইবনে জাওযী (রহঃ) বলেন, "মুনকার (কৃত্রিম ও প্রত্যাখ্যাত) হাদীস শুনামাত্র হাদীস বেত্তার গা শিউরে ওঠে এবং তার অন্তর ঘৃনায় ভরে ওঠে।"

'রবী ইবনে খসীম (রহঃ)-এর উক্তিতে আছে ঃ "অধিকাংশ হাদীসের মধ্যে উজ্জ্বল দিবালোকের আলোকচ্ছটা বিদ্যমান থাকে যদ্দরুন আমরা তার সত্যাসত্য উদঘাটনে সক্ষম হই।"

ইবনে দাকীকুল ঈদ উক্তি করেছেন, "অনেক সময় মুহাদ্দিসগণ কোনো হাদীসকে বানোয়াট (জাল) সাব্যস্ত করার জন্য শুধু শব্দাবলীর উপর নির্ভর করেন।"

'বাল্‌কীনী' (রহঃ) এর ব্যাখ্যা দান করেছেন এভাবে ঃ "এর উদাহর এরূপ যেমন একজন ভৃত্য বছরের পর বছর ধরে খিদমত্‌ করতে করতে তার প্রভুর পছন্দ ও অপছন্দ সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকে। অনন্তর এক ব্যক্তি এসে বললো, তোমার প্রভু অমুক বস্তু অপছন্দ করেন। অথচ সে জানে তার প্রভু এটি পছন্দ করেন। সুতরা সে তৎক্ষণাৎ তাকে মিথ্যুক বলে ফেলবে।"

এসব উদ্ধৃতি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট এ সত্য সম্পূর্ণ পরিচিত ও স্বীকৃত। এ কারণেই হাদীস অস্বীকারকারীদের মুখপত্র 'তুলু'য়ে ইসলাম' পত্রিকা যখন প্রথম প্রথম মাওলানা মওদূদীর লেখা নিজের পাতায় উদ্ধৃত করেছিল, তখন হাফিজ মুহাম্মদ আস্‌লাম সাহেব জীরাজপুরী তুলুয়ে ইসলাম পত্রিকাতেই সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন ঃ "একথা এককভাবে মওদূদী সাহেবই শুধু বলছেননা, বরং সকল মুহাদ্দিসই একথা বলে আসছেন এবং এ ধরনের কথাবার্তা বলা মানুষকে নির্ভেজাল ব্যক্তিত্ব পূজার দিকে দাওয়াত দেয়ারই নামান্তর মাত্র।"

প্রথম প্রথম কথা মাত্র এতটুকুই বলা হয়েছিল। কিন্তু যে সমস্ত মাসয়ালা পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষীগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী মহান মনীষীবৃন্দের নিকট অবিসংবাদিত সত্য বলে চলে আসছিল, হাদীস অস্বীকারকারী, কাদিয়ানী এবং এ ধরনের অন্যান্য লোকেরা এগুলিকে যতক্ষণ জামায়াতে ইসলামী এবং মাওলানা মওদূদীর নব আবিষ্কার বলে চালাতে না পারে এবং ইচ্ছামত জামায়াতকে গালাগাল না করতে পারে, ততক্ষণ তাদের মনে শান্তি আসেনা। ইসলাম ত্যাগীর প্রাণদন্ড, বিবাহিত ব্যাভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা' দাস-দাসীদের মালিকানা, ব্যক্তি মালিকানা ইত্যাদি সম্পর্কিত মাসয়ালাসমূহের মধ্যে এমন কোন্‌ মাসয়ালা আছে যে সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী এমন একক ও নতুন মতামত ব্যক্ত করেছে, যা চৌদ্দশো বছর ধরে মুসলমানদের মধ্যে সর্বব্যাদিসম্মত ও সর্বস্বীকৃত বলে প্রচলিত হয়ে আসেনি?

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, হাদীসের ইমামগণের এই অভিমত শুদ্ধ নাকি অশুদ্ধ যে, অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধমে হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধ যাচাইয়ের ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়ে থাকে? এর উত্তরে বলা যায় যে, বিশ্বজাহানের প্রত্যেকটি জিনিষ ভাল-মন্দ, ভুল-নির্ভুল, উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায়। ঐসব জিনিষের মধ্য থেকে কোনো একটি জিনিস যদি অব্যাহতভাবে ব্যবহার করা হতে থাকে, তাহলে এর ফলে ঐ জিনিসটি আসল, না নকল তা চিনবার এক প্রকার স্বাভাবিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি কষ্টি পাথরের ভূমিকা পালন করতে থাকে। এটি একটি বাস্তব সত্য। এ সত্যকে কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে, যে একেবারেই হঠকারী ও একগুঁয়ে। আর অস্বীকার করতে পারে তারা, যারা হাদীসের মূল্যমান এবং রিসালাতের পদমর্যাদা এমনভাবে অস্বীকার করে যেমনভাবে অস্বীকার করছে উপরোল্লিখিত দুটি

সম্প্রদায়। এ ধারণা আদৌ ঠিক নয় (যেমন জীরাজপুরী সাহেব বলেছেন) যে, এ মাপকাঠিটি সম্পূর্ণতঃ ব্যক্তি নির্ভর এবং প্রত্যেক মুহাদ্দিসের নিজস্ব রুচি ও মেযাযের প্রতীকরূপে পরিগণিত হবে। যেহেতু ঐ রুচি ও মননশীলতা সৃষ্টিকারী এবং তার লালন ও বিকাশকারী হাদীসের ভান্ডার সর্বকালে একই রয়েছে। তাই এই রুচি, মননশীলতা ও যাচাই ক্ষমতার মধ্যে একটা ঐক্যতান ও সংহতির ভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে থাকে। যদি কোথাও অনৈক্য এবং বিভিন্নতা দেখা দেয়ও তাহলে যেহেতু এ ক্ষমতা ও রুচিবোধ হাদীস যাচাই এর একমাত্র মানদন্ড নয়, সে জন্য এতে কোনো উদ্বেগের কারণ দেখা দেয়না যে, কেবলমাত্র এরই কারণে প্রত্যেক মুহাদ্দিসের মানদন্ড ব্যক্তিগত রূপ ধারণ করবে এবং অনান্য মুহাদ্দিস থেকে আলাদা হয়ে যাবে।

আর একটি অভিযোগ তোলা হয়েছে এই যে, মাওলানা ইসলাহী সাহেব আদালতে মাওলানা মওদূদী রসূলের স্বভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ বলে রায় দিয়েছেন। আসল ব্যাপারটি ছিল এই যে, কাদিয়ানী আইনজীবীগণ বিচারালয়ে সাক্ষীদের নিকট হরেক রকম উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করতে থাকেন। এক পর্যায়ে মাওলানা ইসলাহীর সাক্ষ্য প্রদানকালে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে, রসূলের স্বভাব সম্পর্কে পারদর্শী বলতে কি বুঝায়? মাওলানা ইসলাহী সাহেব উত্তর দিলেনঃ যে ব্যক্তি নবী, অনবী এবং মিথ্যা নবীর কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন। তৎক্ষণাৎ কাদিয়ানী আইনজীবী স্বীয় তর্কশাস্ত্রীয় বিশেষ কৌশলে প্রশ্ন করে বসলেনঃ আপনি কি মাওলানা মওদূদীকে রসূলের স্বভাব সম্পর্কে পারদর্শী বলে মনে করেন? মাওলানা ইসলাহী সাহেব উত্তরে বললেন, "মাওলানা মওদূদী সাহেবের প্রতি আমার সুধারণা এই যে, তিনি নবী, অনবী এবং ভন্ড নবীর কথাবার্তা ও ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন।"

আমাদের বুঝে আসেনা যে এই উত্তর দানে হাদীস অস্বীকারকারী ও কাদিয়ানী গোষ্ঠী ব্যতীত আর কোনো বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী লোক কিভাবে আপত্তি-অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন? তবে কি মাওলানা ইসলাহী সাহেবের এ কথাই বলা উচিত ছিল যে, মাওলানা মওদূদীর প্রতি তাঁর কুধারণা এই যে তিনি সত্য নবী ও ভন্ড নবীর কথা ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননা?

মির্যা গোলাম আহমদ এবং মাওলানা মওদূদীর বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সাযুজ্য কেবলমাত্র ঐসব লোকেরাই আশা করতে পারে, যারা রিসালাতের মহান মর্যাদা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। কাদিয়ানবাসী মির্যা সাহেব যে দাবী উত্থাপন করেছেন তা হলো, এই যে, নবুওয়াত ও রিসালাতের পদমর্যাদা লাভ করার দরুন আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন জ্ঞান দান করেছেন, যার কারণে তিনি যে কোনো হাদীস চাইবেন গ্রহণ এবং যে কোনো হাদীস বর্জন করতে পারেন।

শরী'আতের যাবতীয় বিধানাবলীর ব্যাপারে চাই তার উৎস কুরআন হোক কিংবা হাদীস মির্যা গোলাম আহমদের মূল দৃষ্টিভঙ্গী এটাই। যে ব্যক্তির মাথায় বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে এবং অন্তরে কণামাত্র আল্লাহর ভয় আছে সে কিভাবে এ কথাকে মাওলানা

মওদূদীর উসূলে দিরায়াতে হাদীস তথা হাদীস নিরীক্ষার তাত্ত্বিক মূলনীতি সংক্রান্ত উক্তির সাথে মিলিয়ে একাকার করে ফেলতে পারেন, যা হাদীস বিশেষজ্ঞ সকল ইমামই মেনে চলে আসছেন। [তরজুমানুল কুরআন, আগষ্ট ১৯৫৪ইং]

মুসলিম নামধারীদের অনৈসলামী কার্যকলাপ

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি একটি ধর্মীয় সংগঠনের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তিনখানা পুস্তক অত্যধিক তৎপরতাসহকারে প্রচার করছেন এবং লোকদেরকে সেগুলো পড়াচ্ছেন। এ তিনখানা পুস্তকই আরশাদুল কাদেরী সাহেব লিখেছেন। তিনি বিহারের (ভারত) অধিবাসী। পুস্তকগুলোর নাম ঃ 'জামায়াতে ইসলামী', 'তাবলীগী জামায়াত' এবং 'যাল্‌যালে'।

প্রথম দুটি কিতাব স্পষ্টতই জামায়াতে ইসলামী ও তাবলীগী জামায়াতের বিরুদ্ধে এবং তৃতীয় কিতাবখানা দেওবন্দী আলিমগণের প্রতিবাদে লিখিত। প্রথমোক্ত পুস্তকে মাওলানা মওদূদীর বহু উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, যেগুলো পুস্তকাদি ছাড়াও তরজমানুল কুরআনের পুরান সংখ্যাসমূহ থেকে নেয়া হয়েছে। এ সংখ্যাগুলি এখন সহজে পাওয়া যায়না। বরঞ্চ তরজমানুল কুরআনের কিছু সংখ্যা এখন দুর্লভ হয়ে পড়েছে। এ জন্যে সন্দেহ হচ্ছে যে, কি জানি, এতে কিছু ভেজাল মিশিয়ে দেয়া হয়নি তো?

সম্পূর্ণ বইটির উত্তর দেয়া কঠিন বৈ কি, বরং নিস্ফল বটে, তবে আপনি যদি সে সব কিছুর মধ্যে থেকে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি মাত্র হলেও বাছাই করে নেন এবং এগুলির মূল কথা পরিষ্কার করে তুলে ধরেন, তাহলে জনগণের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মুখে যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার দাবী করে, তারা কার্যতঃ কি ধরনের অসাধু ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে?

আর যদি আপনারা একেবারেই নীরব থাকেন তবে তার এ অর্থও নেয়া যেতে পারে যে, তাদের এ অপবাদগুলো সঠিক ও যথার্থ এবং এর কোনো জওয়াব দেয়া আসলেই সম্ভব নয়।

আরশাদুল কাদেরী সাহেবের নামের সাথে বিশ্ব ইসলামী মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী লেখা হয়েছে। এ থেকে মনে হয় যে, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এটি প্রচার করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে সকলকেই কুধারণায় নিমজ্জিত করা হচ্ছে।

উত্তর ঃ কাদেরী সাহেবের 'জামায়াতে ইসলামী' নামক পুস্তিকা আমার দৃষ্টিতে পড়েছে। তার কিছু উদ্ধৃতাংশ নমুনাস্বরূপ পেশ করছি। এ থেকে প্রত্যেকেই সহজে অনুমান করতে পারে যে, এই ব্যক্তিটি আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের হিসাব নিকাশ থেকে কি পরিমাণ বেপরোয়া এবং মিথ্যাচারে কত বেশী পারদর্শী ও সাহসী। তিনি তার বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর পুস্তক 'তান্‌কীহাত' (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব) থেকে একটি বচন উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"কুরআন ও সুন্নাতে রসূলের শিক্ষা সব কিছুর চেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য, কিন্তু কুরআন-হাদীসের পুরান ভান্ডার হতে নয়।" -(তানকীহাত পৃঃ ১১৪)

এ কথার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ "যতক্ষণ না নতুন রসূল পয়দা হবে, ততক্ষণ কুরআন ও হাদীসের নতুন ভান্ডার কোত্থেকে প্রস্তুত হতে পারে? দেখা যাক, ভবিষ্যতে কোন্ ধরনের আজগুবী ও উদ্ভট ব্যাপার ঘটতে থাকে?

'তান্কীহাত'-এর যে নিবন্ধ হতে এ বাক্যটি গ্রহণ করে তাকে বিকৃত করা হয়েছে, সে নিবন্ধের শিরোনাম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। এ চতুরতা এজন্য করা হয়েছে যাতে এর মূল উৎস সহজে পাওয়া না যায়। এতদসত্ত্বেও আমি অনুসন্ধান চালিয়ে এর সেই সংস্করণটি পেয়েছি যার ১১৪ পৃষ্ঠায় এ কথাটি বিদ্যমান রয়েছে। পুরা কথাটি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"কুরআন ও সুন্নাতে রসূলের শিক্ষা সব কিছু থেকে অগ্রগণ্য; কিন্তু তাফসীর ও হাদীসের পুরান ভান্ডার থেকে নয়। ঐসবের অধ্যাপনার জন্য এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা কুরআন ও সুন্নাহর নিগুঢ় তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন।"

(তানকীহাত পৃঃ ১১৪ পঞ্চম সংস্করণ মাক্তাবা জামায়াতে ইসলামী, দারুল ইসলাম, পাঠান কোট)।

কাদেরী সাহেবের কারসাজি দেখুন 'তাফসীর' শব্দকে 'কুরআন' শব্দ দ্বারা বদল করে পাঠককে বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন যে, মাওলানা মওদূদী কোনো এক নতুন কুরআন শিক্ষার পরামর্শ দিচ্ছেন। অথচ মাওলানা সাহেবের দাবী শুধু এতটুকু যে, তাফসীর এবং হাদীসের পুরান ভান্ডার অথবা সেগুলোর হুবহু অনুবাদ পরিপক্ক, পারদর্শী ও প্রশস্ত দৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষকের মাধ্যমে ছাড়া নব্য শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে ধরা উচিত হবে না।

প্রাচীন তাফসীরসমূহে কাঁচাপাকা অনেক রকম তথ্য বর্তমান। হাদীসের ভান্ডারেও সহীহ, যঈফ, মওজু হরেক রকমের হাদীস বিদ্যমান। শুদ্ধ বলে খ্যাত কিতাবসমূহেরও অসংখ্য হাদীস এমন পাওয়া যায় যাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সাযুজ্য টানা কিংবা একটাকে অপরটা থেকে অগ্রাধিকার দেয়া যার তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মূল শব্দ পাল্টিয়ে, কাটছাঁট ও বিকৃত করার পর এরূপ অর্থ বের করা হচ্ছে যে, কুরআন-হাদীস এখন পুরান হয়ে গেছে। এখন কোনো নতুন কুরআন-হাদীস দরকার যেগুলোর শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন।

এই পুস্তিকার ২৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, মাওলানা মওদূদী অন্য জায়গায় লিখেছেনঃ

"ফকীহগণের আইনের কড়াকড়ি নারীজাতির জীবনকে ধ্বংসের দিকে এবং তাদেরকে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হওয়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।" (তরজমানুল কুরআন, মে-১৯৪৯ইং)

প্রকৃত ব্যাপারটি এই যে, এ লেখাটি আদৌ মাওলানা মওদূদীর নয়, এবং ১৯৪৯

সালের মে মাসে পত্রিকার কোনো সংখ্যাই ছাপা হয়ে আদৌ কখনো প্রকাশিত হয়নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর 'তরজুমানুল কুরআন'-এর প্রকাশনা এক বছর পর্যন্ত বন্ধ ছিল।

১৯৪৮ইং সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর '৪৮ পর্যন্ত 'তরজুমাল কুরআন-এর মাত্র চারটি কপি মাসিক হিসাবে ছেপে মওলানা মওদূদী প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। অতঃপর তিনি জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হয়ে যান। তরজুমানুল কুরআনের প্রকাশ পুনরায় বন্ধ হয়ে পড়ে এবং পুরা আট মাস সেপ্টেম্বর '৪৮ হতে মে '৪৯ পর্যন্ত তা বন্ধ থাকে। বিরতির পর ১৯৪৯ সালের জুনে গিয়ে পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রেস, প্রিন্টার ও পাবলিশার পরিবর্তিত হয়ে প্রকাশিত হতে সক্ষম হয়। জুনের ('৪৯) এ সংখ্যাটিতে বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিবরণী এবং ঘোষণা প্রোজ্জ্বলভাবে মুদ্রিত আছে। মওজুদ এ সংখ্যাটি যার মনে চায়, দেখে নিতে পারে।

উপরে যেমন উল্লেখ করেছি, আবারো আমি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিচ্ছি যে, ১৯৪৯ সালের মে সংখ্যায় তরজুমানুল কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে যে বক্তব্য মাওলানা মওদূদীর প্রতি আরোপ করা হয়েছে তা কখনো তাঁর কলম থেকে বের হয়নি। এটি তাঁর ভাষা কিংবা বর্ণনা ভঙ্গীও নয়।

আমি আরশাদুল কাদেরী সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করছি যে তিনি যেন মাওলানা সাহেবের কোনো পুস্তক অথবা পত্রিকা হতে এ কথাটি বের করে দেখান, অন্যথায় 'দুনিয়া ও আখিরাতে মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ' কুরআনে বিঘোষিত এই শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকেন।

স্বীয় পুস্তিকার ২৯ পৃষ্ঠায় এই ব্যক্তি তরজুমানুল কুরআনের আর একটি বক্তব্য মাওলানা মওদূদীর প্রতি এভাবে আরোপ করেছেন যে, "হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের ইসলামী চেতনার বিরূপ সমালোচনা করে মাওলানা মওদূদী লিখছেন ঃ

> "ইসলামী সচেতনতা কোনো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম অনৈসলামী মনোভাবের উপস্থিতিও বরদাশত করতে রাজি হয়না এবং এ ব্যাপারে প্রবৃত্তির দাবী পূরণে সে এতখানি বিরূপ যে, খালিদ ইবনে ওয়ালীদের ন্যায় বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তির পক্ষেও তার মধ্যে তারতম্য করা মুশকিল হয়ে পড়েছিল।" (তরজুমানুল কুরআন, রবীউস্‌সানী '৫৭ হিঃ)

এখানে আবার শুধু মাস ও বছরের বরাত দেয়া হয়েছে কিন্তু পৃষ্ঠা নম্বর অথবা প্রবন্ধের শিরোনাম দেয়া হয়নি। যে প্রবন্ধ হতে এ বাক্যটি আনা হয়েছে, সে বিষয়ের শিরোনাম হচ্ছে "ইসলাম ও জাহিলিয়াতের সংঘাত" এবং এটি সদরুদ্দীন ইসলাহী সাহেবের লেখা। মওদূদী সাহেব বা ইসলাহী সাহেবের যারই লেখা হোক- এদিকে না তাকিয়ে উদ্ধৃতাংশের পূর্বাপর মিলিয়ে দেখলে তার মধ্যে আপত্তির কিছু আছে বলে মনে হয়না।

তথাপি এটি কি ধরনের ন্যায়বিচার এবং কোন্ ধরনের সততা যে, অন্যান্যের কথা ও লেখা মাওলানা মওদূদীর ঘাড়ে জেনেশুনে চাপিয়ে দেয়া হয়। কোনো পত্রিকায় অথবা

কোনো সংবাদপত্রে কিছু ছাপা হলে তার মালিক কিংবা সম্পাদক শুধু এ জন্যেই তার রচয়িতা হয়ে যাননা যে তাদের পত্রিকায় তা ছাপা হয়েছে।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বতন্ত্র এক বর্ণনাভঙ্গী এবং চিন্তাধারা থাকে, যার দায়িত্ব একমাত্র তিনিই গ্রহণ করে থাকেন। এই উদ্ধৃতি পেশ ও অপবাদ আরোপ করতে গিয়ে আরো যে সত্যের অপলাপ করা হয়েছে, সেটি এই যে, এখানে মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহীর পূর্ণাংগ বক্তব্য তুলে ধরা হয়নি। ইসলাহী সাহেব সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত খালিদ (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে একজন শত্রুকে আঘাত করেছিলেন। এমন সময় কালেমায়ে তাইয়েবা পড়া সত্ত্বেও খালিদ ইবনে ওয়ালীদ তাকে হত্যা করে ফেলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হুযূর (সঃ) কঠোরভাবে খালিদের নিকট কৈফিয়ত তলব করেন এবং বলেন ঃ "তুমি কি তার দিল ফেড়ে দেখেছিলে? আমি কিন্তু এ কাজের দায়িত্ব নিতে পারিনা।"

এ হাদীসের বর্ণনা দেয়ার পর এ বাক্যটিতে কেবল ঐ ব্যক্তিই আপত্তি-অভিযোগ তুলতে পারে, যে ব্যক্তি বাস্তবিক পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সত্ত্বাকেই আপত্তির লক্ষ্যবস্তু বানানোর ধৃষ্টতা দেখাবে। এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, হযরত (সঃ) কেন খালিদ (রাঃ) কে তাঁর একাজের জন্য তিরস্কার করেছিলেন এবং কেনই বা তিনি ঐ কাজ থেকে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করেছিলেন, এটাই আপত্তির ব্যাপার!

অতঃপর কাদেরী সাহেব একটিমাত্র মিথ্যা দোষারোপ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী সাহেবের এই নিবন্ধ থেকে আরো তিনটি ভুল উদ্ধৃতি স্বীয় পুস্তকের ৩০, ৩২ এবং ৩৩ পৃষ্ঠায় চিন্তা-ভাবনা না করেই মাওলানা মওদূদীর প্রতি আরোপ করেছেন। তিনটি উদ্ধৃতিই আরম্ভ করেছেন এ ভাষায়ঃ "মাওলানা মওদূদী এক স্থানে লিখছেন.....মাওলানা মওদূদী এ ভাষায় প্রথম খলীফার ছিদ্রান্বেষণ করেছেন ......এখানে দ্বিতীয় খলীফার বিরূপ সমালোচনা করেছেন।"

ঐ তিন পৃষ্ঠায় ইনিয়ে বিনিয়ে যেসব বচন জড়ো করা হয়েছে, তার একটি শব্দও মাওলানা মওদূদীর লেখা থেকে নেয়া হয়নি।

অতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়ার আশংকা যদি আমার না হতো, তবে আমি সমস্ত উদ্ধৃতিই এবং সেগুলোকে আরশাদুল কাদেরী সাহেব কি পরিমাণ বিকৃত করেছেন তা তুলে ধরতাম।

আলোচ্য মূল বচনগুলোতে যদিও কোনো খুঁত নেই, এবং তার কোনো একটি কথায়ও আপত্তি থাকতে পারেনা; কিন্তু এগুলো দিয়ে মাওলানা মওদূদীকে দায়ী করা স্পষ্ট ধোঁকাবাজি ও জালিয়াতি। সম্ভবতঃ এই জালিয়াতি এই ভেবে করা হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার পুরান পত্রিকা কারো কাছে নেই। কেউই তা খুঁজে পাবেনা এবং বুঝতে পারবেনা যে, আসলে ওটা মাওলানা মওদূদী সাহেবের লেখা, না অন্য কারো?

যারা এ ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তাদের আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ঐ ঘোষণা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ঃ

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ـ

"কোনো গোষ্ঠীর প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটা উত্তেজিত না করে যে, তোমরা সুবিচার ত্যাগ করবে। সর্বাবস্থায় সুবিচার করতে থাকো। এটিই সততার নিকটতম কাজ।" (তরজামানুল কুরআন -জুন-১৯৭৬ইং)

দাড়ির পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক

প্রশ্ন ঃ মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগও আছে যে, তিনি তাঁর লেখাসমূহের মধ্যে এক মুঠোর কম দাড়ি রাখা জায়েয বলেছেন। অথচ 'দূররে মুখতার' কিতাবে বলা হয়েছে যে, এক মুঠোর কম দাড়ি রাখা কেউই জায়েয বলেননি । এ যেন 'ইজমা' হয়ে গেছে, এর বিপরীত যে করবে সে ফাসিক বলে গণ্য হবে।

অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করে বলুন, মাওলানা মওদূদীর কথার সপক্ষে কোনো শরীয়তী দলিল আছে, কি নাই।

উত্তর ঃ এ অভিযোগেরও উত্তরদানের পূর্বে জরুরী মনে করছি, আসলে মাওলানা মওদূদীর মূল কথাটি কি তা পেশ করে দেয়া। মাওলানা সাহেব 'রাসায়েল ও মাসায়েল' প্রথম খন্ডে লিখেছেন ঃ দাড়ির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো পরিমাণ নির্দিষ্ট করেননি। শুধু এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, দাড়ি রাখতে হবে। ফাসিক লোকদের ফ্যাশন থেকে যদি আপনি দূরে থাকতে চান, তাহলে এতটুকু দাড়ি রাখুন যে, সমাজের সাধারণ পরিভাষায় তাকে দাড়ি রাখা বলে গণ্য করা যায়। (আপনার মুখে যেন এতটুকু দাড়ি না থাকে যা দেখে মনে করা হয় যে আপনি কয়েকদিন দাড়ি কামাননি) তা হলেই শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য আপনার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে বলে ধরা হবে, চাই তা দ্বারা ফকীহদের দেয়া শর্ত পূরণ হোক কিংবা না হোক।

এ কথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, কোনো সহী হাদীসে নবী (সঃ) কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বলে আদৌ কোনো প্রমাণ নেই।

হযরত (সঃ) সাধারণভাবে এ আদেশই দিয়েছেন যে, তোমরা দাড়ি বাড়াও এবং মোচ খাটো করো। এ আদেশ বাস্তবে পালন করতে গিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণার আশ্রয় নিতে হয়েছে। গবেষনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে মতভেদের উদ্ভব হয়েছে।

কারো নিকট দাড়ি সীমাহীনভাবে বাড়ানো এবং নিজের অবস্থায় রেখে দেয়াকেই সুন্নতের দাবী। আবার কারো নিকট একমুঠো দাড়ি রাখা সুন্নত, এর বেশী করা মাকরূহ। কারো নিকট কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই, শুধুমাত্র দাড়ি রাখাই শরীয়তের দাবী।

যাঁরা এক মুঠো দাড়ি রাখা সুন্নত মনে করেন, তাদের প্রধান দলিল হলো আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রাঃ) অভ্যাস। কেননা তিনি এক মুঠের চেয়ে বেশী হলে দাড়ি ছেঁটে নিতেন। অথবা হাদীস সূত্রে জানা যায় যে, তিনি হজ্জ ও উমরার সময় এরূপ করেছিলেন।

স্বয়ং হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে এমন কোনো সুস্পষ্ট রিওয়ায়েত নেই যা থেকে জানা যায় যে, তিনি এক মুঠো দাড়ি রাখাকে সুন্নত মনে করতেন এবং সুন্নত মনে করা অবস্থায় এ পরিমাণটি কি তার নিকট ন্যুনতম না সর্বাধিক।

প্রকৃত কথা হলো হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর এ কাজ সুন্নতের অনুসরণ ধরে নিলেও এ থেকে দু'প্রকার অভিমত বের করা যেতে পারে।

এক, যদি এ কাজ হজ্জ ও উমরাহর সাথে নির্দিষ্ট ছিল বলে ধরে নেয়া হয়, তাহলে এ কথা বলার অবকাশ আছে যে, এ পরিমাণটি ন্যূনতম এবং এটুকু শুধু ঐ সময়ের জন্য তিনি রাখতেন। আসলে সাধারণত তিনি হয়তো এর চেয়ে বেশী রাখতেন।

দুই, যদি একে তাঁর সাধারণ অভ্যাস বলে ধরে নেয়া হয় যে, তিনি এক মুঠের বেশী হলে তা ছেঁটে নিতেন অর্থাৎ এক মুঠের বেশী হতে দিতেননা, তা হলে এটাও প্রমাণিত হতে পারে যে, এ পরিমাণটি তাঁর নিকট সর্বাধিক ছিল। চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে হাদীসের সাধারণ বক্তব্য থেকে সুনির্দিষ্ট বিধি নির্ণয়ের এই পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে যদি কিছু ফকীহ এক মুঠের বেশী দাড়ি ছাটিয়ে দেয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করতে পারে, তাহলে এটা বুঝে আসেনা যে, এক মুঠো থেকে কম পরিমাণ দাড়ি রাখা জায়েয কিংবা মুবাহ হওয়াতে শরীয়তে বাধা কোথায়?

অবশ্যি, "দূররে মুখতার"-এর লেখকের একথা বলা যে, এক মুঠো পরিমাণ দাড়ি রাখায় 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর কম করা কারো নিকটই মুবাহ বলে সাব্যস্ত হয়নি, এটি এমন একটি দাবী যার প্রমাণ পাওয়া সত্যি বড় কঠিন।

আমি অন্যান্য ফিক্‌হী মাযহাবের কথা না হয় বাদই দিলাম, খোদ হানাফী মাযহাব পন্থী আল্লামা আইনী (রহঃ) এর লেখা কিতাব "উম্‌দাতুল ক্বারী"র 'কিতাবুল লিবাস' 'বাবু তাক্‌লীমিল আযফার' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি। এর মধ্যে তিনি দাড়ি লম্বা করা বিষয়ক হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম তাবারী (রহঃ) এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করছেন ঃ

قد ثبتت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص هذا الخبر ان اللحية محظور اعفاءها واجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده فقال بعضهم حد ذلك ان يزاد على

قدر القبضة طولا وان ينتشر عرضا فيقبح ذالك..وقال اخرون يأخذه من طولها وعرضها مالم يفحش اخذه ولم يجدوا فى ذالك حدًّا -

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ কথার প্রমাণ আছে যে, (দাড়ি লম্বা করা সম্পর্কিত) হাদীসের অর্থ দাড়ি একেবারেই ছেড়ে দেয়া নয় বরং এর মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা আছে। দাড়ি স্বতস্ফূর্তভাবে লম্বা হতে দেয়া নিষিদ্ধ। বরং তাকে কাটছাঁট করে (সাইজমত) রাখা ওয়াজিব। অবশ্যি সলফে সালেহীন (পূর্ববর্তী নেক লোকদের) মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে। কেউ বলেছেন, তার দৈর্ঘ এক মুঠো থেকে লম্বা হবে এবং প্রস্থে এমনভাবে যেন ছড়িয়ে না পড়ে যাতে দৃষ্টিকটু মনে হয়।..... অন্যান্য লোকেরা বলেছেন যে, দৈর্ঘ-প্রস্থে ছাটবে কিন্তু খুব বেশী ছোট করবেনা। তাঁরা এ ব্যাপারে কোনো সীমা নির্ধারণ করেননি।"

অতঃপর তিনি আরো বলছেন ঃ

غير ان معنى ذالك عندى مالم يخرج من عرف الناس -

"আমার মতে এর অর্থ হলো দাড়ি এ পর্যন্ত ছাটা জায়েয, যে পর্যন্ত লোকসমাজের প্রচলিত রীতিবহির্ভূত না হয়।"

এখন কোনো ব্যক্তি যদি ইনসাফের সাথে দৃষ্টি দেয় এবং হিংসা ক্ষুব্ধ মন থেকে যদি মুক্ত থাকে, তাহলে সে অবশ্যি উপলব্ধি করতে পারে যে, মাওলানা মওদূদীর উপরোল্লিখিত বক্তব্য এবং উমদাতুল ক্বারীর বক্তব্যের ভেতর অন্তত এমন কোনো বড় পার্থক্য নেই যদ্দরুন একজনকে বরদাশত করা হবে এবং অপরজনের বিরোধিতার জন্য শত্রুতামূলক অভিযান পরিচালনা করাকে জরুরী মনে করা হবে। -(তরজুমানুল কুরআন ডিসেম্বর -১৯৬২ইং)

দাজ্জাল প্রসঙ্গ

প্রশ্ন ঃ মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়, তার মধ্যে একটি অভিযোগ হচ্ছে তিনি দাজ্জালের আগমন অস্বীকার করেছেন এবং যে সব হাদীসে দাজ্জালের উল্লেখ আছে, সেগুলোকে তিনি নিছক গল্প-গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এতদূরও বলেছেন যে, নবী (সঃ) নাউযুবিল্লাহ এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন এবং দাজ্জাল সম্পর্কে তিনি যা কিছু বলেছেন, তা সবই ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানদের সামনে যখন এসব জিনিস মাওলানা মওদূদীর প্রতি আরোপ করা হয়, তখন মাওলানা মওদূদীর প্রতি তাদের ধারণা মারাত্মকভাবে খারাপ হয়ে ওঠে। এজন্যে এটি অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে যে, প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার ও স্পষ্টরূপে তুলে ধরা হোক। আর যদি কোনো ভুল কথা মাওলানার কলম থেকে বের হয়েই থাকে, তবে তা সংশোধন করা হোক।

উত্তর ঃ প্রশ্নের ভেতর যে অভিযোগের উল্লেখ করা হয়েছে, তার সমস্ত অংশসহ গোটা বর্ণনাই আগাগোড়া ভুল ও ভিত্তিহীন। মাওলানা মওদূদী একজন প্রশ্নকারীর উত্তরে যা কিছু লিখেছেন, তা রাসায়েল ও মাসায়েল প্রথম খন্ডে ছাপা হয়েছে। তার মধ্যে এমন কোনো বস্তু ছিলনা, যার অর্থ গ্রহণ করা এবং যাকে সঠিক লক্ষ্যে ব্যবহার করা কোন কঠিন কাজ ছিল।

তা সত্ত্বেও কোনো কোনো ভদ্রলোক ঐ লেখার এমন বিকৃত অর্থ করা শুরু করে দেন, যার কারণে মারাত্মক ধরনের ভুল বুঝাবুঝির আশংকা দেখা দিয়েছিল। তাই ১৯৫৫ইং সালে মাওলানা মওদূদী যখন জেলে ছিলেন, তখন তাঁকে এ পরিস্থিতি ওয়াকিফহাল করা হলো।

এরপর তিনি তাঁর পূর্বের লেখার একটি ব্যাখ্যা লিখিত আকারে তরজমানুল কুরআনে প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়ে দেন। অবিকল ঐ ব্যাখ্যাটি এখানে তুলে ধরা সময়োপযোগী হবে ঃ

"রাসায়েল ও মাসায়েল' ১ম খন্ডে বর্তমান 'দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসের পর্যালোচনা' বিষয়টির দিকে এক বন্ধু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, তাতে কয়েকটি শব্দ ও বাক্যে নাকি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মর্যাদার প্রতি কটাক্ষ প্রকাশ পেয়েছে।

আল্লাহ্ মাফ করুন। কোনো মুসলমান কি রিসালাতের ঐ মহান দরবারের প্রতি কটাক্ষ তথা বেআদবী করতে পারে? এরূপ যদি করে, তবে সে কি এক মুহূর্তের জন্যও ঈমানের আওতায় থাকতে পারে?

আমার সম্পর্কে কোনো দ্বীনী ভাইয়ের এ কুধারণা পোষণ করা উচিৎ নয় যে, আমি এহেন কুফ্রী কামে জড়িয়ে পড়তে পারি। তবে এতটুকু সম্ভব যে, কোনো বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে যে প্রকাশ ভঙ্গীমার আশ্রয় নেয়া হয়েছে তা হয়তো আমার মতে শরীয়তের সীমা অথবা আদবের পরিমন্ডলেই আছে, অথচ কোনো ভাই অনুভব করেন যে, ওতে সীমা লংঘন করা হয়েছে।

আমি বিষয়টি উপস্থাপন করতে যা কিছু লিখেছিলাম তা পুরো দায়িত্ব নিয়ে বুঝে শুনে লিখেছিলাম যে, এতে শরীআত ও আদবের খেলাপ কিছু হচ্ছেনা এবং এখনো আমি তাই মনে করছি। বন্ধুটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরও আরো গভীরে তলিয়ে দেখ্লাম; কিন্তু এখনো সীমালংঘনের গন্ধ খুঁজে পেলামনা। তবুও অবহিত হওয়ার পর

মনে করছি কোনো ব্যক্তি সীমা লংঘন হয়েছে বলে মনে করতে পারে। তাই ঐ বক্তব্যের শব্দ ও ভাষা বদলিয়ে দেয়া উত্তম বলে মনে করছি। এতে কোনো ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকবেনা।"

অতঃপর মাওলানা পূর্বেকার উত্তরের কতক অংশ পরিবর্তন করেছিলেন। এই পুরো ব্যাখ্যাটি ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীর তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয়েছিল। জেল থেকে বের হওয়ার পর মাওলানা 'রাসায়েল ও মাসায়েল' প্রথম খন্ডের নতুন সংস্করণের কিতাবখানির পরিমার্জন করেন। এ সময় তিনি নিজের লেখার এক আধ স্থানে বক্তব্য উপস্থাপনে আরো পরিবর্তন আনেন। নতুন সংস্করণে এই পুরো উত্তর যেরূপে প্রকাশিত হয়ে আসছে উত্তম মনে হচ্ছে তা এখানেও উদ্ধৃত করে দিই, যাতে পাঠকদের সামনে একই সাথে তা উপস্থিত হয়ে পড়ে। নিম্নে সেই উত্তরের প্রতিলিপি দেয়া হলো ঃ

"আমি যে জিনিসকে গল্প-গুজব বলে আখ্যায়িত করেছি, তা হচ্ছে এ ধারণা যে, দাজ্জাল কোথাও বন্দী আছে। তবে মস্তবড় এক ধাপ্পাবাজ (দাজ্জাল) যে আবির্ভূত হবে' এ ব্যাপারে আমি একমত এবং আমার নামাযে-ঐ দু'আও আমি পড়ে থাকি, যা স্বয়ং রসূল থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যান্য অনেক কিছু থেকে আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে এটাও রয়েছে যে,

اعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال-

"মাসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে, হে আল্লাহ, তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

দাজ্জাল সম্পর্কে যত হাদীস নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তার প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে রসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা এতটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ যে, একজন বড় দাজ্জাল আবির্ভূত হবে, তার এই গুণাবলী থাকবে এবং এই এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে সে আবির্ভূত হবে। তবে তাঁকে এটা বলে দেয়া হয়নি যে, ঐ দাজ্জাল কবে নাগাদ আবির্ভূত হবে, কোথায় আবির্ভূত হবে। সে কি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর যুগে পয়দা হয়েছে? কিংবা তার যুগের পর কি পরিমাণ দূর ভবিষ্যতে পয়দা হবে? এ সব ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য হাদীসসমূহ থেকে পাওয়া যায়না। এসব বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন কথা রসূলুল্লাহ (সঃ) হতে হাদীসসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। ঐ সব হাদীসের ভাষা ও বক্তব্যের পার্থক্য এবং হুযূর (সঃ) এর বাচনভঙ্গী থেকেও বুঝা যায় যে, তিনি ওহীর ভিত্তিতে নয়, বরং নিজস্ব ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে এসব কথা বলেছেন।

কখনো তিনি এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, দাজ্জাল খুরাসান থেকে আবির্ভূত হবে। আবার কখনো তিনি বলেছেন, ইসপাহান হতে, আবার কখনো বলেছেন, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী এলাকা হতে বের হবে। সম্ভবত ২ অথবা ৩ হিজরী সনে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণকারী এক ইহুদী শিশু ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, এই সেই দাজ্জাল। সর্বশেষ রিওয়াতে দেখা যায়, ৯ হিজরী

সনে ফিলিস্তিনের একজন খৃষ্টান পাদ্রী (তামীম দারী) এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ) কে একটি কাহিনী শুনান। কাহিনীটি এই ঃ একদা তিনি এক সামুদ্রিক সফরে (রোম সাগর কিংবা আরব সাগরে) একটি অনাবাদ দ্বীপে পৌঁছলেন। সেখানে তিনি এক বিস্ময়কর ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান। তিনি তাকে দাজ্জাল বলে ধারণা করেন। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) তার এ বর্ণনাকে ভুল বলে সাব্যস্ত করার কারণ খুঁজে পাননি। অবশ্যি, তিনি তার দ্বিধা প্রকাশ করেছিলেন এভাবে যে, এ বর্ণনা মতে দাজ্জালের আগমন রোম বা আরব সাগর এলাকায় কিন্তু আমার মনে হয়, সে পূর্বাঞ্চল থেকে আগমন করবে।

এ সব হাদীসের প্রতি এক নজরে দৃষ্টি দিলে ইল্‌মে হাদীস ও উসূলে দ্বীন সম্বন্ধে সামান্যতম জ্ঞানও যার আছে, তার পক্ষে এটা উপলব্ধি করা আদৌ কঠিন হবেনা যে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ সম্পর্কিত যাবতীয় কথাবার্তার মধ্যে দুটি অংশ বিদ্যমান রয়েছেঃ এক দাজ্জালের আগমন ঘটবে। সে নানা গুণের অধিকারী হবে। সে অনেকগুলো ফিত্‌না ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এতটুকু পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও অকাট্য ভবিষ্যদ্বাণী, যা তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখানে কোনো বর্ণনাই অন্য কোন বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক হিসাবে দেখা যায়না।

দুই, দাজ্জাল কবে এবং কোথায় আসবে এবং সে কোন ব্যক্তি। এ ব্যাপারে হাদীসগুলো সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেনি। বরং অধিকাংশ রিওয়ায়াতে সন্দেহ এবং অনুমান নির্দেশক শব্দসমূহ বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ) কে এ কথা বলা ঃ "এ-ই যদি দাজ্জাল হয়, তবে তুমি এর হত্যাকারী নও। আর যদি এ দাজ্জাল না হয় তবে তুমি একজন চুক্তিবদ্ধ অনুগত নাগরিককে হত্যা করার কোনো অধিকার রাখনা।" অথবা অন্য এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "যদি আমার জীবদ্দশায় সে আগমন করে, তাহলে আমি দলিল-প্রমাণ দিয়ে তার মুকাবিলা করবো, অন্যথায় আমার পর আমার প্রভু তো প্রত্যেক মুমিনকে সাহায্য ও সহায়তা দিয়েই থাকেন।"

এটি অত্যন্ত পরিষ্কার কথা যে, এ দ্বিতীয় অংশের দ্বীনী ও নীতিগত অবস্থান এমন নয়, এবং হতেও পারেনা, যেমনটি প্রথমটির। যে ব্যক্তি বিষয়টির যাবতীয় খুঁটিনাটিকেও ইসলামী আকাইদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে সে ভুল করে। বরং এর প্রত্যেকটি অংশকে শুদ্ধ মনে করাও সমীচিন হবেনা। ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কে হযরত (সঃ)-এর সন্দেহ হয়েছিল যে, হয়তো সেই দাজ্জাল হবে।

হযরত উমর (রাঃ) তো কসমই খেয়ে বললেন যে, এই লোকটিই দাজ্জাল। কিন্তু সে পরে মুসলমান হয়ে গেলো। মক্কা ও মদীনায় (হারামাইন) বসবাস করতে লাগলো। মুসলমান অবস্থায় মারাও গেলো। তার নামাযে জানাযা মুসলমানরাই পড়লেন। এরপর এখন পর্যন্ত ইবনে সাইয়াদের ওপর দাজ্জাল হওয়ার সন্দেহ পোষণের অবকাশ কিভাবে থাকতে পারে?

তামীম দারী (রাঃ)-এর (ভ্রমণ) কাহিনীকে হযরত (সঃ) তো প্রায় সত্য বলে মনেই করে ফেলেছিলেন। কিন্তু আজ সাড়ে তের শো বছর অতিবাহিত হয়ে চললো, ঐ অদ্ভুত ব্যক্তিটি আবির্ভূত হলোনা, যাকে তামীমে দারী কোনো এক দ্বীপে আটক দেখেছিলেন। এতে তাকে দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করে তামীমে দারী যে খবর দিয়েছিলেন, তা যে ঠিক ছিলনা, তা প্রমাণিত হতে আর কিছু বাকী থাকে কি? হুযূর (সঃ) আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁরই যুগে অথবা তাঁর অন্তর্ধানের নিকটবর্তী যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। কিন্তু বাস্তবে কি দেখা গেল, সাড়ে তেরশো বছর চলে গেল, এখনো তার আবির্ভাব ঘটলনা। এসব বিষয় যদি এমনভাবে উপস্থাপন বা বর্ণনা করা হয় যাতে মনে হয় যেন এটি ইসলামী আকাইদের অন্তর্ভুক্ত; তা হলে তা যেমন ইসলামী আদর্শের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হবেনা, তেমনি তাকে হাদীসসমূহের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন বলেও আখ্যায়িত করা যাবেনা। এ জন্য আমি যেমন উপরেও বলেছি, এ জাতীয় কোনো উক্তি যদি নবী (সঃ) এর অনুমান, ধারণা এবং আশংকার অনুরূপ বাস্তবায়িত না হয়ে থাকে তাহলে এতে রিসালাতের নিশ্চিত ও মহান মর্যাদায় যেমন কোনো বিচ্যুতি আসেনা, তেমনি সৃষ্টি হয়না "ইসমতে আম্বিয়া" (নবীদের নিষ্পাপতা) এর ওপরও কোনো কলংক। আর এসব জিনিসে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য শরীয়ত আমাদেরকে বাধ্যও করছেনা। এই নীতিগত সত্যকে তা'বীরে নাখ্‌ল (খেজুর গাছের লিঙ্গগত রেণু মিশ্রণ) হাদীস পরিষ্কাররূপে তুলে ধরেছে।" (অর্থাৎ কিছু ব্যাপারে আমি মানুষ হিসাবে বলি, যার সাথে নবুওয়াতী পদমর্যাদার সম্পর্ক থাকেনা।) এর সাথে সাথে একথাও পাঠকদের দৃষ্টিতে থাকা উচিত যে মাওলানা মওদূদী স্বীয় পুস্তিকা 'খতমে নবুওয়াতে' এবং কাদিয়ানীদের সম্পর্কে তদন্ত আদালতের সম্মুখে নিজের তৃতীয় জবানবন্দীতে ঐ সমস্ত হাদীস একত্রিত করেছিলেন, যার মধ্যে ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, মাহদী (আঃ) এর আগমন এবং দাজ্জালের আবির্ভাবের বিবরণ মওজুদ ছিল। তিনি এ সবের মাধ্যমে দলিল প্রমাণসহ সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, আখেরী যামানায় 'আদ্‌দাজ্জাল' আবির্ভূত হয়ে নিজেকে ঈসা (আঃ) বলে দাবী করবে। সে দুনিয়ায় বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করতঃ ব্যাপক গোমরাহী, জুলুম ও অত্যাচারের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অতপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসল মসীহকে পুনরায় মর্তে প্রেরণ করবেন। তিনি এসে এসব ফিৎনাকে নাস্তনাবুদ করে ছাড়বেন। মাওলানা মওদূদীর এসব লেখা থেকে এ বাস্তব সত্যটি উদঘাটিত হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে দাজ্জালকে অস্বীকার করার অভিযোগের ভেতর সত্যের লেশমাত্র বিদ্যমান নেই।

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে যে, যদি তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের অস্বীকারকারী না হবেন, তাহলে দাজ্জালের বন্দী হওয়াকে নিছক গালগল্প বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? অথচ তামীমে দারী এ ঘটনাটি নবী (সঃ) এর সামনে যখন বর্ণনা করেছিলেন তখন তিনি কোনো এক দ্বীপে একটি লোককে বাঁধা অবস্থায় দেখেছিলেন, যে নিজেকে দাজ্জাল বলে পরিচয় দিয়েছিল, তখন হুযূর (সঃ) তাকে সত্য

বলে মেনে নিয়েছিলেন। অধিকন্তু ঘটনাটি একদল সাহাবীর সামনেও বলা হয়েছিল।

হযরত তামীম (রাঃ) এর ঘটনা সহীহ মুসলিম এবং সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফের কোনো কোনো বর্ণনা মতে জানা যায় যে, এ ঘটনা তার সামনেই ঘটেছে। কিন্তু অপর বর্ণনা মতে জানা যায় যে, ঘটনাটি তার নিজ চোখে দেখা এবং তারই সামনে সংঘটিত নয়, বরং তাঁর জাতির কিংবা গোত্রের অন্যান্য লোকদের সামনে ঘটা ঘটনা, যারা ছিল খৃষ্টান। তারা মুসলমান হয়েছে বলে কোনোই প্রমাণ নেই।

এক হাদীসের ভাষা এই যে, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ

ان بنى عم لتميم الدارى ركبوا فى البحر.

অন্য একটি হাদীসের ভাষা ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

ان اناسا من قومه كانو فى البحر.......

তৃতীয় হাদীসের ভাষা ঃ হুযূর (সঃ) বলেন ঃ

كان يحدثنى تميم الدارى عن رجل.....

কিছু প্রেক্ষিত ও নিদর্শন বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে, সমুদ্রে দাজ্জালের বন্দী অবস্থায় থাকার কাহিনী কিতাবীদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল।

হাফিয ইবনে হাজর 'ফাতহুল বারী'তে না'ঈম ইবনে হাম্মাদের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়ামন উপসাগরের কোনো দ্বীপে দাজ্জাল বন্দী অবস্থায় আছে। এরই পর তিনি বলছেন ঃ

"এসব রাবী (বর্ণনাকারীগণ) নির্ভরযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এ কথার সম্ভাবনা আছে যে, তাঁরা এসব বর্ণনা আহলে কিতাবের (কিতাবীদের) কোনো কোনো গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন।"

একটু এগিয়ে ইবনে হাজার বলছেন ঃ

এ ব্যাপারে গুরুতর অসঙ্গতি থাকার কারণে ইমাম বুখারী (রহঃ) বর্ণনাসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার দেয়ার নীতি অবলম্বন করেছেন। সুতরাং তিনি শুধুমাত্র ইবনে সাইয়াদ সম্পর্কিত হযরত জাবির (রাঃ) এর ঐ হাদীস গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন, যা হযরত উমর (রাঃ) এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তিনি হযরত তামীম (রাঃ) এর সেই হাদীসকে উদ্ধৃত করেননি, যা ফাতিমা বিনতে কয়েস বর্ণনা করেছেন-অর্থাৎ যাতে দাজ্জালের বন্দী হওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর বর্ণনাসমূহে একথা নিশ্চিতরূপে এসেছে যে, নবী (সঃ) হযরত তামীম দারী (রাঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কে বলেছিলেনঃ

"এটি আমার ঐ কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা আমি তোমাদের কাছে বলে আসছিলাম"। কিন্তু এখানে চিন্তা করার বিষয় হলো সেই কথাটি, যা হুযূর (সঃ)

সাহাবায়ে কিরামের সামনে ইরশাদ করেছেন এবং তামীম (রাঃ)-এর বর্ণনার সাথে তার মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল।

সে কথাটি ছিল দাজ্জাল দুনিয়াতে চার দিকে ফিৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে, কিন্তু সে মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করতে পারবেনা।

সাহাবায়ে কেরামের সামনে বহুবার হযরত (সঃ) একথাই বর্ণনা করেছিলেন এবং হযরত তামীম (রাঃ)-এর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে তিনি এ কথাটির উপর জোর দিয়েছিলেন। এ ভাষণটি পেশ করার সময় তিনি তাঁর মুবারক লাঠিটি দ্বারা মিম্বরে আঘাত করেছিলেন। তবে সুনির্দিষ্টভাবে দাজ্জালের সমুদ্রে বন্দী থাকার ব্যাপারটি নবী (সঃ) পূর্বেও কখনো উল্লেখ করেননি এবং তামীম (রাঃ)-এর কাহিনী বর্ণনার সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়ার প্রশ্নও কখনো পয়দা হয়নি।

অধিকন্তু তামীম (রাঃ) এর বর্ণনার ঐ অংশের সাথে মতভেদের উল্লেখ করে নবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে ঃ

الآ انه فى بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق -

এ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, দাজ্জাল কোন দ্বীপে বন্দী হয়ে আছে তা নবী (সঃ) এর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়নি। এটি তামীম দারী (রাঃ) কিংবা তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিজস্ব বর্ণনা মাত্র, এর সমর্থন নবী (সঃ) এর পক্ষ থেকে পাওয়া যায়না। বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বর্ণনা ভঙ্গী হতে কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণের কিছু অংশের সাথে তাঁর দ্বিমত আর কিছু অংশের ব্যাপারে তাঁর নীরবতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখানে এক নীতিগত প্রশ্ন এসে যায় যে, নবী (সঃ) এর দরবারে যদি এমন কোনো খবর বর্ণনা করা হয়, যা থেকে শরীয়তের কোনো মাস'য়ালা উদ্গত হয়না; এরূপ ক্ষেত্রে তাঁর নীরবতা ঐ খবরের সত্য প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিনা?

ইবনে হাজর (রঃ) 'ফাতহুল বারী' এর উল্লিখিত পরিচ্ছেদে 'তাক্রীর' (অনুমোদন ও সমর্থন) এর ওপর আলোচনা করতে গিয়ে ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ-এর গবেষণা পর্যালোচনার সারাংশ বর্ণনা করেছেন যে, এরূপ অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব থাকা ঘটনার সম্ভাব্যতা ও শুদ্ধতার প্রমাণ হিসাবে ধরে নেয়া যায়না।

হাফিজ ইবনে হাজর (রহঃ) এই সাথে একথাও সংযুক্ত করেছেন যে, নবী (সঃ) এর চুপ থাকাতে এটি প্রমাণিত হয়না যে, ঘটনাটির সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা সমান সমান হয়ে গেল।

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর এ কথাকেও আপত্তিকর এবং নবী (সঃ)-এর মর্যাদাহানিকর সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে যে, দাজ্জালের ব্যাপারে যত কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তার কিছু অংশ ওহী দ্বারা সমর্থিত নয়, কেননা তার মধ্যে সন্দেহ ও

অনুমান ভিত্তিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুতঃ এরূপ উপলব্ধি শুধু যে, মাওলানা মওদূদী একাই করেছেন এবং তিনি একাই এ উক্তি করেছেন তা নয়। বরং অন্যান্য মুহাদ্দিস এবং হাদীসের ভাষ্যকারের এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। তাই দেখতে পাই 'ফাতহুল বারী'র যে আলোচনা উপরে দেয়া হয়েছে তাতে ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়া না হওয়ার প্রশ্নে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইবনে হাজর বলেছেন ঃ

এটা সুস্পষ্ট যে, নবী (সঃ) এর ওপর ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো ওহী নাজিল হয়নি, বরং দাজ্জালের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে তাকে অবহিত করা হয়েছিল। ইবনে সাইয়াদের ব্যক্তি চরিত্রে এমন কিছু নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, যদ্দরুন তাকে দাজ্জাল বলে অনুমান করা হতো। এজন্যই হুযূর (সঃ) তার সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিয়ে যাননি। ইবনে সাইয়াদ সংক্রান্ত হাদীসগুলির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রায় এ ধরনের উক্তিই করেছেন ইমাম নববী (রঃ)। তার ভাষা হলো ঃ

وظاهر الاحاديث ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يوح اليه بانه المسيح الدجّال ولا غيره وانما اوحى اليه بصفات الدجّال.

যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপরে বর্ণিত হলো, তা একজন চিন্তাশীল ও ন্যায়পন্থী ব্যক্তিকে এই মর্মে আশ্বস্ত করার জন্য যথেষ্ট যে, মাওলানা মওদূদী এ প্রশ্নে এমন কোনো কথা তোলেননি, যা সত্য ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হতে পারে, অথবা তার মধ্যে আল্লাহ মাফ করুন, রিসালতের অবমাননার এতটুকুও সম্ভাবনা পাওয়া যেতে পারে। (তরজমানুল কুরআন জানুয়ারী, ১৯৬৩ইং)

সাহাবায়ে কিরাম কি সত্যের মাপকাঠি?

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে যেসব অমূলক ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে এটিও একটি যে, জামায়াত সাহাবায়ে কিরামকে সত্যের মাপকাঠি বলে স্বীকার করেনা এবং তাদের সমালোচনাকে জায়েয মনে করে। অথচ মুসলমানদেরকে সাহাবায়ে কিরামের ত্রুটি অন্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং কুরআন ও হাদীস সাহাবী (রাঃ) দের মর্যাদার প্রশংসায় সোচ্চার রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেনঃ আমার সাহাবীরা নক্ষত্রসমূহের ন্যায়, যারই তোমরা অনুসরণ করবে, সত্যপথ পেয়ে যাবে।

যদিও জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক রাখে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহর রহমতে একজন খাঁটি মুসলমানের ন্যায় তাঁর রসূল (সঃ) এর পর যে মানবগোষ্ঠীর প্রতি সবচে' বেশী ভক্তি ও ভালবাসার অনুভূতি নিজেদের অন্তরে পোষণ করেন, তারা হলেন

সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর দল। আর জামায়াতের প্রত্যেকেই নিজেকে এ অভিযোগ থেকে মুক্ত মনে করে থাকেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও মুসলিম জনসাধারণকে কুধারণা থেকে বাঁচানোর জন্য জরুরী মনে হচ্ছে যে, আসল ব্যাপারটি পরিষ্কাররূপে তুলে ধরা হোক। এ প্রশ্নে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থানও স্পষ্ট করা দরকার এবং কুরআন ও হাদীসের কিংবা সলফেসালেহীনের সর্বসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এর মিল অথবা অমিল আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আশা করা যায় যে, জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ অন্তরে স্বস্তি লাভ করবেন এবং অভিযোগকারীদের মুখ বন্ধ না হলেও অন্তত পক্ষে সাধারণ মুসলমানগণের ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেনা। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এখানে কয়েকটি জরুরী বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে ঃ

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের মূল বক্তব্য

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে উপরোল্লিখিত অভিযোগের ভিত্তি তার গঠনতন্ত্রের একটি মূল বক্তব্যের সাথে সম্পৃক্ত দেখানো হয়ে থাকে, অথচ তার পুরো শব্দাবলীও বিরোধীরা তুলে ধরেননা। বরং তারা দু'একটি বাক্য পূর্বাপর বক্তব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়ে থাকেন। এ জন্য সমীচীন মনে হচ্ছে যে, বিস্তারিত ব্যাখ্যার পূর্বে জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রের ঐ মূল কথাটি এখানে তুলে ধরা হোক, যাকে ভিত্তি করে বার বার এ অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আসছে। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র (মূল উর্দু) ধারা-৩ এর ৬ উপধারা নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

> "রসূলে খোদা ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে সত্যের মাপকাঠি মেনে নিবেনা, কাউকে সমালোচনার উর্ধে মনে করবেনা, কারো মানসিক গোলামীতে নিমজ্জিত হবেনা। আল্লাহর নির্ধারিত এ পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠিতে প্রত্যেককে যাচাই করবে ও পরখ করে নিবে। এ মাপকাঠির (আল্লাহর রসূল) বিচারে যে যে মর্যাদায় পড়বে, তাকে ঐ মর্যাদা দান করবে।"

এটি হচ্ছে ঐ মূলকথা, যা থেকে ঐসব অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে। অথচ এতে একথা আদৌ নেই যে সাহাবায়ে কিরামের দলের সমালোচনা করা যেতে পারে, কি পারে না। বরং এর মধ্যে এতটুকু বলা হয়েছে যে, আসল মাপকাঠি শুধু আল্লাহর রসূল (সঃ)। এর ভেতর থেকে খোঁড়াখুড়ি করে ও ইনিয়ে বিনিয়ে অভিযোগকারীরা নিজেরাই এ অর্থ আবিষ্কার করেছে যে, নবী (সঃ) ছাড়া কাউকে সমালোচনার উর্ধে মনে না করার মানেই হলো সাহাবায়ে কিরামের সমালোচনাকে বৈধ জানা জরুরী। আর যায় কোথায়? জামায়াতে ইসলামী যে এই মতের প্রবক্তা, তাতে আর সন্দেহ নেই।

অতপর ঐ অভিযোগকারীগণ সমালোচনাকে নিন্দাবাদ ও ছিদ্রান্বেষণের সমার্থকও বানিয়ে নিয়েছেন যাতে তারা আমাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিতে পারেন যে, আমরা সাহাবায়ে কিরামের দোষ চর্চাকে বৈধ মনে করি এবং তাদের ওপর দোষ আরোপও নাকি আমরা করে যাচ্ছি।

এরপর আপত্তি উত্থাপনকারীগণ যে অতিরিক্ত আরো একটি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা এই যে, তারা মূল বচনের এই অংশটি একেবারেই বাদ দিয়ে গেছেন। যেখানে বলা হয়েছেঃ "এ মাপকাঠির বিচারে যে ব্যক্তি যে মর্যাদা পাবে তাকে সেই মর্যাদা দেবে।" যেহেতু এ বাক্যটি তাদের যাবতীয় অভিযোগের পূরা ভিত্তিই চূর্ণ করে দেয়, তাই তারা এটিকে আদৌ উল্লেখই করেননি। এ থেকে অনুমান করা যায় এসব ভদ্রলোকের কুৎসা রটনার আকাংখা কত তীব্র, আর সেজন্য অন্যদের দীন ও ঈমানে ত্রুটি খুঁজে বের করা তাদের কাছে কত প্রিয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমীরে জামায়াতের ব্যাখ্যা

এরপর তারা আরো জুলুমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন এভাবে যে, তাদের এ ধরনের অভিযোগ খুঁড়ে বের করার উত্তরে উপরোল্লিখিত মূল বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বারংবার প্রদত্ত হয়েছে, তা থেকে তারা সর্বদাই চোখ বন্ধ করে রেখেছেন এবং নিজেদের অভিযোগ বার বার পুনরাবৃত্তি ও প্রচার করতে দ্বিধা করছেননা।

উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্য করুন, গঠনতন্ত্রের এ অংশ এবং বিশেষতঃ তার শব্দাবলী 'মি'য়ারে হক' (মাপকাঠি) এবং 'তানকীদ' (সমালোচনা) এর ব্যাখ্যা জামায়াতে ইসলামীর তদানীন্তন আমীর মাওলানা মওদূদী কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এইরূপ দিয়েছেন ঃ

"আমরা সত্যের মাপকাঠি বলতে ঐ বস্তুকে বুঝাই, যার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা সত্য (হক) এবং যার পরিপন্থী হওয়া মিথ্যা (বাতিল) বলে সাব্যস্ত হয়। এই দৃষ্টিতে সত্যের মাপকাঠি শুধু আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নত। সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি নন। বরং তাঁরা কিতাব ও সুন্নাতের মাপকাঠিতে পুরাপুরি উত্তীর্ণ প্রমাণিত হয়েছেন।

কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে যাচাই করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এই (সাহাবীদের) মহান দলটি পুরোপুরি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ জন্যই তাদের ইজমা (সম্মিলিত মত) আমাদের নিকট শরীয়তের অন্যতম দলিল।

কেননা আমাদের মতে কিতাব ও সুন্নাতের সামান্যতম বিরোধী কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। (তরজমানুল কুরআন- রাসায়েল ও মাসায়েল জিলদ-৫৬ সংখ্যা-৫)

অতপর অপর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ

"সমালোচনা (তানকীদ) অর্থ দোষ চর্চা বা ছিদ্রান্বেষণ করা কোনো মূর্খ ব্যক্তি বুঝলেও বুঝতে পারে, কিন্তু আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে এটা আশা করা যায়না যে, তিনি এ শব্দ হতে এ অর্থ বুঝাবেন। আসলে সমালোচনা অর্থ মূল্যায়ন করা, পরীক্ষা করা অথবা যাচাই করা ও পরখ করা।

খোদ গঠনতন্ত্রের উল্লিখিত উক্তির গৃহীত ব্যাখ্যাও যথাস্থানে দেয়া হয়েছে। এরপর

দোষ চর্চার অর্থ শুধু ঐ ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারে যে, ফিতনাবাজ ও গোলযোগ পাঁকাতে ইচ্ছুক। অধিকন্তু এ বাক্যটির তাৎপর্য ও লক্ষ্য আরো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহর রসূলকে মাপকাঠি মেনে নেয়ার পর ঐ মাপে যার যে মর্যাদা প্রাপ্য হবে, তাকে সেই মর্যাদা দেয়া হবে।

এরপরও এ থেকে কেমন করে এ অর্থ গৃহীত হতে পারে যে, আল্লাহর কুরআন ও রসূলের হাদীসসমূহে সাহাবায়ে কিরামের যে ভুয়সী প্রশংসা এসেছে, তা মেনে নেয়া ওয়াজিব নয়?" (পুস্তিকা জামায়াতে ইসলামী সত্যের ওপর আছে কি?)

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে উপরে বর্ণিত বক্তব্য এবং তার উত্থাপিত ব্যাখ্যা অত্যন্ত সহজ ও সাধারণভাবে বোধগম্য।

প্রত্যেক লেখাপড়া জানা মানুষ ওটা পড়ে সহজেই অনুধাবন করতে পারে যে, এ থেকে সাহাবায়ে কিরামের অবমাননা ও অমর্যাদার দিক ফুটে উঠে, না তাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়।

মুল বচনে যদি সমালোচনা (তানকীদ) শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে তাকে অযথা ধাঁধা বানিয়ে নেয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। এ শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ শুধু এই যে, কোনো জিনিসের মৌলিক এবং সারবত্তা যাচাই ও পরখ করা মাত্র। যদি ঐ জিনিসটি মূলতঃ নিখাদ সোনা হয়, আর যদি হয় মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ, তাহলে মাপকাঠিতে মাপার পর তার সৌন্দর্য ও কৃতিত্ব আরো প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কুরআনের ফায়সালা

কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলের আলোকে সমস্ত সাহাবীকে সামগ্রিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছে এবং কোনো বিষয়ে তাদের একমত হয়ে যাওয়াও (ইজমা) শরীআতের দলিল হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন আলোচনা সাপেক্ষ থেকে যায়। আর তা হচ্ছে, এক এক সাহাবীর একক কথা ও কাজ অথবা কিছু সংখ্যক সাহাবীর বিভিন্ন কথা শরীয়তের দলিল হিসাবে গণ্য হবে কিনা। কিতাব ও সুন্নাতের কষ্টি পাথরে যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই এবং কোনো রকম প্রশ্ন উত্থাপন না করে শুধু সাহাবীদের কথা ও কাজ মনে করে তা অন্ধভাবে মেনে নেয়া ওয়াজেব হবে কিনা?

এ ব্যাপারে আমরা যখন কিতাবুল্লাহর দিকে সর্বপ্রথম তাকাই, তখন আমরা দেখতে পাই যে, কোনো স্থানেই সাহাবায়ে কিরামের ব্যক্তিগত কথা, কাজ এবং চারিত্রিক মানকে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র কোনো আদর্শ বা দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়নি। বরং সকল মুসলমানের সাথে সাহাবায়ে কিরামকেও এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যে, যখন কোনো ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে বিতর্ক ও মতভেদ সৃষ্টি হবে, তখন তা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে নিয়ে যাবে।

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْئٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

"তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ জন্ম নিলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে নিয়ে যাও।" (সূরাতুন্ নিসা -আয়াত ৫৯)

আল্লাহর এ মহান নির্দেশের লক্ষ্য সর্বপ্রথম স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামই। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ফায়সালা দিয়েছেন যে, এক একজন সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে ও আলাদাভাবে সত্যের মাপকাঠি নয়, বরং মতভেদের সময় সাহাবীদের জন্যও এই সিদ্ধান্ত যে, তাঁরাও যেন কিতাব এবং সুন্নাতের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে।

হাদীসের ফায়সালা

কুরআন মজীদের পর যখন হাদীসে রসূলের দিকে ফিরে তাকাই, তখন সেখানেও আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কিরামের ব্যক্তিগত কথা অথবা কাজের অনুসরণ আমাদের জন্য ওয়াজিব এই মর্মে কোনো দলিল নেই।

অবশ্যি কোনো কোনো হাদীসে সন্দেহাতীতভাবে পাওয়া যাচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আমার পর আবু বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)কে অনুসরণ করো।" কিন্তু এতে এ অর্থ হয়না যে, তাঁদের ব্যক্তিসত্ত্বার নিঃশর্ত অনুসরণ করতে হবে। বরং এর অর্থ হলো খলীফায়ে রাশিদ হওয়ার কারণে তাদের ঐ আদর্শকে আঁকড়ে ধরো। আর এর সমর্থন পাওয়া যায় সাহাবায়ে কিরামের ইজমাতে।

যদি এর অর্থ এরূপ না নেয়া হতো, তাহলে এ দু'জন মহান ব্যক্তি অন্যান্য সাহাবীকে নিজেদের মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করা এবং বিতর্ক সৃষ্টি করার আহবান জানাতেননা এবং সাধারণ সাহাবীগণও তাঁদের সাথে দ্বিমত পোষণের সাহস করতেননা। (অথচ সবাই জানে যে, তাঁরা দু'জনই নিজেদের চিন্তা-ভাবনার সাথে মতভেদ করার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং বাস্তবে সাহাবীরা তাঁদের সাথে মতভেদ করার সাহস দেখিয়েছিলেন।)

হাদীস 'আসহাবী কান্ নুজুম' এর তাৎপর্য

হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ) সম্পর্কিত ঐ হাদীস ব্যতীত শুধু একটি রিওয়ায়াত এমন পাওয়া যায়, যা থেকে মোটামুটিভাবে বুঝা যেতে পারে যে, সাহাবায়ে কিরামের একক ও ব্যক্তিগত কথা বা কাজকে দলিলরূপে গ্রহণ করার পক্ষে প্রমাণ আছে। রিওয়ায়াতটি সাধারণতঃ এভাবে বর্ণনা করা হয় ঃ

اصحابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.

"আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তাঁদের মধ্য থেকে যারই তোমরা অনুসরণ করবে সঠিক রাস্তা পেয়ে যাবে।"

যদিও উসূলে ফিকাহর কিতাবসমূহে জায়গায় জায়গায় এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করা হয়ে থাকে, কিন্তু আমার জানা মতে, এমন কোনো ফিকাহ শাস্ত্রবিদ বা উসূলে ফিকাহবিদ নেই, যিনি এই রিওয়ায়াত দ্বারা সাহাবীদের ব্যক্তিগত কথা ও কাজ সাধারণভাবে ও ব্যাপকভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে দলিলরূপে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। উসূল শাস্ত্র বিষেশজ্ঞ আলিমগণ এ রিওয়ায়াতের অন্য ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, যা আলোচনা করার মত ক্ষেত্র এটি নয়।

এ হাদীসটি (রিওয়ায়াতটি) এবং শব্দ ও ভাষার দিক দিয়ে এর প্রায় কাছাকাছি আরো কিছু হাদীস রয়েছে যা সাহাবী ও আহলে বায়ত (রসূল পরিবার) এর পক্ষে বর্ণিত হয়েছে। এ ধরনের হাদীস সংক্রান্ত একটি কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় এবং উল্লেখ করাও জরুরী। আর তা হচ্ছে, হাদীস শাস্ত্রবিদ এবং রিজাল শাস্ত্রবিদদের মধ্যে যারা দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ তাদের নিকট এসবের সনদ দুর্বল। এজন্য আকীদা নির্ধারণ এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এগুলি দ্বারা দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করা বৈধ নয়। এমনকি ফযীলত বর্ণনা ও নেক কাজে উৎসাহ দান মূলক কথা-বার্তার ক্ষেত্রেও এসবের দুর্বলতার উল্লেখ ছাড়া বর্ণনা করা সমীচীন নয়। 'সিহাহ্ সিত্তাহ' তথা নির্ভরযোগ্য শুদ্ধতম ছয়টি হাদীসগ্রন্থসমূহে এগুলো সংকলিত হয়নি।

হাফিজ ইবনে আব্দুল বারর্ 'জামি' বয়ানুল ইলম' কিতাবে উপরোক্ত রিওয়ায়াতের সনদ উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

এটি এমন একটি সনদ যাকে কোনো বিষয় প্রমাণ করতে দলিল হিসেবে দাঁড় করানো যায়না। ইবনে হাযম 'আল আহকাম' কিতাবে ঐ হাদীসটির বর্ণনাকারীদেরকে ত্রুটিপূর্ণ বলে উল্লেখ করার পর লিখেছেন ঃ

هذه رواية ساقطة. خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قطّ.

"এ রিওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্যতার মানের নিচে অবস্থিত। এটি মিথ্যা ও জাল হাদীস। এটি এমন একটি অগ্রহণযোগ্য ও বাজে হাদীস, যা কখনো শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়নি।"

হাফিজ ইবনে হাজর (রহঃ) তাখরীজে কাশ্শাফ গ্রন্থে ঐ রিওয়ায়াত এবং ঐ ধরনের মর্ম ধারণকারী সমস্ত হাদীসের সনদগুলোকে দুর্বল ও বাজে জিনিস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম শওকানী (রহঃ) 'ইরশাদুল ফুহূল' কিতাবের ৮৩ পৃষ্ঠায় ইজমা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং সেখানে লিখেছেন ঃ
"এর মধ্যে সুস্পষ্ট আপত্তি আছে"। অতপর তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এর একজন রাবী (বর্ণনাকারী) অত্যন্ত দুর্বল। তিনি আরো বলেছেন যে, অন্য একজন রাবী ইবনে

মুঈনের নিকট চরম মিথ্যাবাদী এবং ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট প্রত্যাখ্যাত। অন্য একটি ধারার রাবীকে ইবনে হাতিম 'ভারী দুর্বল' ইমাম বুখারী (রহঃ) 'অগ্রহণযোগ্য' হাদীস বলেছেন। (ইমাম বুখারীর (রহঃ) পরিভাষায় এটি অত্যন্ত কঠিন সমালোচনার ভাষা।) ইবনে মুঈন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ لا يساوى فلسًا -
'এই রাবীর এক কানাকড়িও দাম নেই'।

ইবনে আদী ঐ রাবীর বর্ণনাসমূহকে জাল বলে সাব্যস্ত করেছেন। হাফিজ ইবনে কায়্যিম 'ই'লামু মুকি'ঈন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের আল-কওলু ফিত্‌তাকলীদে এ বর্ণনাকে অশুদ্ধ প্রমাণ করেছেন।

সাহাবীদের উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী ইমামদের দৃষ্টিভংগী

মোটকথা, সাহাবীদের কথা ও কাজকে শরীয়তের দলিলরূপে মেনে নেয়ার পক্ষে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূল থেকে কোনো প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়না। এ কারণেই উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এ ব্যাপারে প্রায় ইজমা (সর্ববাদীসম্মত মত) হয়ে আছে যে, যদি কোনো বিষয়ে কেবলমাত্র একজন অথবা কয়েকজন সাহাবীর কথা ও কাজ বর্ণিত হয়, তবে তাকে আদিল্লায়ে শর্‌ইয়্যাহ (শরী'আতী দলিল চতুষ্টয়- কুরআন-হাদীস-ইজমা-কিয়াস) এর ভেতর গণ্য করা যেতে পারেনা। এ বিপরীতে কোনো সাহাবীর কথা বা কাজ থাকুক অথবা না থাকুক তাতে কিছু এসে যায়না। তাকে কিতাব ও সুন্নাতের নিক্তিতে ওজন দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবেনা। এরূপে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে মাসআলায় মতভেদ দেখা যাবে, সে ক্ষেত্রেও নিশ্চিতভাবে যাচাই-বাছাই, অনুসন্ধান এবং অগ্রাধিকার প্রদানের নীতি অবলম্বন করতে হবে। যে কথা বা কাজ কিতাব ও সুন্নাতের আসল মাপকাঠিতে অধিক সামঞ্জস্যশীল প্রতীয়মান হবে, তাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে মাপ জোপে যেটি যতটুকু পেছনে পড়বে সেটিকে ততটুকুই বর্জন করতে হবে। সবল ও দুর্বল বিবেচনার এই গবেষণা এবং এই যাচাই ও পরখ করার নামই হলো সমালোচনা (তানকীদ)।

এ মাস'আলার বিভিন্ন দিককে সুস্পষ্ট করার জন্য জরুরী মনে হচ্ছে যে, কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সর্বস্বীকৃত ইমাম ও ফকীহর মতামত ও বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করে দিই ঃ

হানাফীদের দৃষ্টিভংগী

"ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর দু'টি মত ১৯৬৩ইং সালে আগস্ট মাসের 'তরজমানুল কুরআনে' নির্ভরযোগ্য সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। একটি মত এই যে, "কিতাব ও সুন্নাত থেকে যখন কোনো বিধান পাইনা, তখন আমি ইজমায়ে সাহাবীর অনুসরণ করে থাকি। তাদের মধ্যে মতভেদ দেখলে আমার ইচ্ছামত যে কোনো সাহাবীর কথা গ্রহণ করি এবং আমার ইচ্ছামত যে কোনো সাহাবীর মত বর্জন করি।"

ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় মত ঃ "সাহাবীদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতভেদ দেখলে আমি তখন কিয়াস (যুক্তি) প্রয়োগ করি।"

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফিকাহবিদ শামসুল আইম্মাহ ইমাম সারাখ্‌শী স্বীয় কিতাবুল উসূল প্রথম খন্ডে ইজমায়ে সাহাবা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করছেন ঃ

"ইজমা'র শরী'আতী দলিল (হুজ্জাত) হওয়ার কারণ এই যে, তাতে একটা কথায় ঐকমত্য পাওয়াতে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এরূপ ব্যাপার একজনের বক্তব্যের বেলায় ঘটেনা, বরং একটি দল তথা বহুজনের বেলায় এটি সম্ভব। তুমি কি দেখ না যে, একটি দল বিরোধিতা না করা সত্ত্বেও একজনের কথা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হয়না।"

এথেকে জানা গেল যে, যদিও কারো থেকে ভিন্ন কথা অথবা তার বিপরীত কথা পাওয়া যায়, তবুও এক ব্যক্তির কথা দলিল হয়না।

একই খন্ডের শেষের দু'পৃষ্ঠায় ইমাম সারাখ্‌শী আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, সাহাবী যদি এরূপ বলেন ঃ

أُمرنا بكذا او نُهينا عن كذا او السنّة هكذا.

"আমাদেরকে এ কাজে আদেশ করা হয়েছে অথবা এ কাজ থেকে বারণ করা হয়েছে কিংবা সুন্নাত এটি", তাহলেও এরূপ বলাতে ঐ কাজটি রসূলের নির্দেশ বা রসূলের সুন্নাতে পরিণত হওয়া জরুরী হয়না। কেননা ওতে এরূপ অর্থ করার অবকাশ থেকে যায় যে, ওটি ছিল বিশেষ কোনো নেতার আদেশ অথবা কোনো শহর বা এলাকা সংশ্লিষ্ট আদেশ কিংবা ওটি ছিল বিশেষ কোনো রীতি প্রথা বিষয়ক।

অতঃপর ইমাম সাহেব ঐ কিতাবের দ্বিতীয় খন্ডে ১০৫ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত শিরোনামযুক্ত পরিচ্ছেদ দাঁড় করেছেনঃ

فصل فى تقليد الصحابى اذا قال قولا ولا يعرف له مخالف -

এ অধ্যায়েও তিনি সাহাবীদের এমন কথার অনুসরণ করা বা না করার আলোচনা করেছেন, যার বিপরীত অন্য কোনো সাহাবীর কথা প্রসিদ্ধ ও পরিচিত নেই। এ শিরোনামের অধীনে তিনি লিখেছেন ঃ

"সাহাবীদের রায়ের ভিত্তিতে কতেক ফতওয়া পাওয়া যায়। এ কথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু রায় তো কখনো ভুলও হয়ে থাকে। সুতরাং সাহাবীদের ব্যক্তিগত ফতওয়া সঠিক ও বেঠিক দু-ই হওয়ার আশংকা ও সম্ভাবনা থেকে যায়।"

এ ধরনের ফতওয়ার বিপরীত রায় ত্যাগ করা জায়েয নয়, যেমন করে জায়েয নয় তাবিয়ীর কথার বিপরীত রায় বর্জন করা।

আরো অগ্রসর হয়ে ইমাম "সারাখশী হানাফী মাযহারের যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন, তার সারাংশ হলো যে, যখন সাহাবীদের কথা এমন বিষয়ে পাওয়া যাবে, যে বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পক্ষ থেকে বক্তব্য আসার সম্ভাবনা থাকে, তখন সাহাবীদের ফতওয়া নিজের মতের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে মাস'আলায় কিয়াসের (যুক্তি-বুদ্ধিনির্ভর সিদ্ধান্ত) দখল নেই অথবা সাহাবীর কথা কিয়াস বিরোধী পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ সাধারণতঃ যুক্তি বা কিয়াসের যে দাবী সাহাবীর কথা তার উল্টা, এমন সব মাস'আলায় সাহাবীর কথা অগ্রগণ্য হবে এবং কিয়াস ত্যাগ করা হবে।

এর কারণ এই যে, সাহাবীর অযৌক্তিক কিংবা যুক্তি বিরোধী কথার ব্যাপারে এটি খুবই সম্ভব যে, এ কথাটি স্বয়ং রসূল থেকে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সাহাবী মনগড়াভাবে কিছু বলেননি। এ কথা গ্রহণ করা স্রেফ সাহাবীর কথা হিসেবে নয়, বরং এই হিসেবে যে, এর ভিত্তি রসূলের কথা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার একটা পটভূমিগত সাক্ষ্যও বিদ্যমান।

যদি সামান্য তলিয়ে দেখা যায়, তবে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হানাফী ইমামগণ কিয়াসসিদ্ধ (যুক্তিগ্রাহ্য) বিষয়কে যুক্তিমুতাবিক এবং যুক্তিবিরোধী বলে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। এরই ভিত্তিতে তারা নিজেদের এক ধরনের ইজতিহাদ থেকে সাহাবীর উক্তিকে অগ্রগণ্য মনে করেছেন, আবার অন্য ধরনের ইজতিহাদকে সাহাবীর উক্তির ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই পৃথক পৃথক ধরনের মর্যাদা নিরূপণ ও অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যাপারটিই আসলে সমালোচনা তথা পরিক্ষণ ও নিরীক্ষণের একটি রূপ।

এখানে এ বিষয়টিও হৃদয়ঙ্গম করা দরকার যে, উপরোক্ত সমস্ত আলোচনাই সাহাবীর ঐ কথা ও কাজ সম্পর্কে, যার বিরুদ্ধে অন্য কোনো সাহাবীর কথা ও কাজ পাওয়া যায়না। যেখানে সাহাবীদের কথা, কাজ বা অভ্যাসে বিভিন্নতা দেখা দেবে, সেখানে সর্বাবস্থায় গ্রহণ ও বর্জন ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। তথাপি এখানেও বিনা যুক্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া যাবেনা। বরং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলের বেশী নিকটবর্তী ও বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাকে অগ্রগণ্য বলে সাব্যস্ত করতে হবে।

অন্য ভাষায় বললে এরূপই বলতে হয় যে, ইজতিহাদী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাকলীদ (অন্ধ অনুকরণ) এর পরিবর্তে তানকীদ ও তারজীহ (বাছ বিচার ও অগ্রাধিকার) এর নীতি অবলম্বনে কাজ করতেই হবে।

শাফেয়ীদের মতামত

এরপর শাফিয়ী মযহাবের দৃষ্টিভঙ্গী দেখুন। ইমাম গাযালী (রহঃ) আল-মুস্তাসফা, প্রথম খন্ড ১৫৩ পৃষ্ঠায় বাবুল আসলিসসানী মিনাল উসূলিল মাওহুমা-কওলুস সাহাবী (সাহাবীর কথা) বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই বলছেন ঃ কারো মতে,

সাহাবীর নীতি-আদর্শই শর্তহীনভাবে দলিল, কারো মতে, যুক্তিগ্রাহ্য নয়- এমন ব্যাপারে তা দলিল, আবার কারো মতে, স্রেফ হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ) এর কথা দলিল বলে গণ্য হবে। তারপর লিখেছেন ঃ

والكل باطل عندنا- فان من يجوز عليه الغلط والسهو ولم يثبت عصمته فلا حجة فى قوله- فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطاء وكيف تدعى عصمتهم من غير حجة متواترة وكيف يُتصور عصمة قوم يجوز عليهم الاختلاف؟ وكيف يختلف المعصومان- كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة فلم ينكر ابو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد بل اوجبوا فى مسائل الاجتهاد على كل مجتهد ان يتبع اجتهاد نفسه- فانتفاع الدليل على العصمة ووقوع اختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة ادلّة قاطعة-

"আমাদের নিকট সাহাবীর একক নীতি-আদর্শ দলিল হওয়া সম্পর্কিত সকল মতই অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল বলে গণ্য। যে মানুষ ভুল বিচ্যুতি মুক্ত নয় এবং যার পক্ষে ইসমত বা নিষ্পাপতা প্রমাণিত নয়, তার কথা দলিল হতে পারেনা। সুতরাং সাহাবীর কথা সনদ বা একটি বিধানের জন্য দলিল হিসেবে কিরূপে গৃহীত হতে পারে অথচ তাদের থেকে ভুলত্রুটি প্রকাশিত হওয়া সম্ভব বলে প্রমাণিত।

সর্বসম্মত দলিল প্রমাণ ব্যতীত তাদের নির্ভুল হওয়ার দাবী করা কেমন করে সঙ্গত হবে! যাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, তাদেরকে ত্রুটিমুক্ত বলে ধরা যায় কিরূপে? দু'জন নিষ্পাপের মধ্যে মতভেদ কেমন করে সম্ভব?

এসব কিভাবে সম্ভব যখন সাহাবীগণ সাহাবীদের সাথে মতভেদ করা জায়েয বলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ) নিজেদের

বিরুদ্ধে ইজতিহাদকারীদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেননি, বরং প্রত্যেক মুজতাহিদকে ইজতিহাদী মাসায়েলে স্ব স্ব ইজতিহাদ অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় বলে রায় দিয়েছেন। সাহাবীদের নিষ্পাপ ও ত্রুটিমুক্ত হওয়ার দলিল না পাওয়া, তাদের পারস্পরিক মতবিরোধ এবং তাদের সাথে মতভেদ করার জন্য তাদের প্রকাশ্য আহ্বান জানানো- এ তিনটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রমাণ করার জন্য অকাট্য দলিল"

তারপর ইমাম গাযালী (রহঃ) ইমাম শাফিয়ীর দুটি মত উল্লেখ করেছেন। প্রথম মতটি ছিল এই যে, সাহাবীর কথা যদি প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তার বিপরীত কোনো কথা না পাওয়া যায়, তবে সাহাবীর তাকলীদ (অনুকরণ) জায়েয (ওয়াজিব নয়)। অতপর প্রথম মত প্রত্যাহার করে শেষ এবং নতুন যে দৃষ্টিভঙ্গী ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) গ্রহণ করেছিলেন তাহলো ঃ

"আলিম ব্যক্তি কোনো একক সাহাবীর অনুকরণ (তাকলীদ) করবেনা, যেমন তিনি অন্যকোনো আলিমের অনুকরণ করেননা।)

এরপর ইমাম গাযালী বলেন ঃ

"এমতই আমাদের নিকট শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য, কেননা যেসব কারণে একজন আলিমের পক্ষে অন্য একজন আলিমের অনুকরণ করা হারাম তাতে সাহাবী এবং অসাহাবীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায়না।"

তারপর ইমাম গাযালী (রহঃ) ঐসব লোকের দলিলগুলি উল্লেখ করেছেন, যারা ফাযাইলে সাহাবী (সাহাবীদের গুণাবলী ও মর্যাদা) সম্বলিত আয়াত ও হাদীসসমূহের ভিত্তিতে সাহাবীদের অনুকরণ-অনুসরণ করা জায়েয অথবা জরুরী বলে মনে করেছেন, তার জওয়াবে তিনি বলেছেন ঃ

قلنا هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد فى علمهم ودينهم ومحلهم عند الله تعالىٰ ولا يوجب تقليدهم لا جوازًا ولا وجوبًا-

আমরা বলবো এসব কিছুই প্রশংসা ও প্রশস্তি, যদ্দরুন সাহাবায়ে কিরামের কর্মমান, দীনদারী এবং আল্লাহর নিকট তাঁদের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণিত হয়। এ থেকে তাঁদের প্রতি গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু এগুলো ব্যক্তিগত তাঁদের তাকলীদ করার বৈধতা বা অপরিহার্যতার দলিল হতে পারেনা।

অতঃপর এ জওয়াব নিম্নের শব্দ ও ভাষা দিয়ে শেষ হয় ঃ

كل ذالك ثناء لا يوجب الاقتداء اصلاً-

এসব প্রশংসা ও মর্যাদা জ্ঞাপক। এর দ্বারা অন্ধ অনুকরণ আদৌ বাধ্যতামূলক হয় না।

আল্লামা সাইফুদ্দীন আমাদী "الاحكام فى اصول الاحكام" গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে 'সাহাবীদের পথ' বিষয়ক আলোচনার সূচনায় বর্ণনা করেছেন যে, অসাহাবীর জন্য সাহাবীর কথা দলিল হবে কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ আছে। আশাইরাহ্ মু'তাযিলাহ, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (একটি মত অনুযায়ী) এবং ইমাম আবুল হাসান হানাফীর নিকট 'কওলে সাহাবী' 'হুজ্জাত' (দলিল) নয়। কারো নিকট কিয়াসের বিরোধী মাস'আলা হলে দলিল বলে গণ্য হবে। আবার কারো নিকট আবু বকর এবং উমরের (রাঃ) কথা দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

অবশেষে তিনি বলেন,

গ্রহণযোগ্য মত হলো, সাহাবীর কথা কোনো ক্রমেই দলিল নয়। আরো সামনে গিয়ে "المسئلة الثانية" শিরোনামে তিনি প্রশ্ন তোলেন ঃ যখন এটি প্রমাণিত হয়েছে যে কোনো বিশেষ সাহাবীর মত ও পথ অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়, তখন অসাহাবী ব্যক্তি তার হুবহু অনুকরণ করবে কি? এরপর তিনি নিজেই এ জওয়াব দিচ্ছেন ঃ والمختار امتناع ذالك مطلقًا "অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও সর্বজনগ্রাহ্য মত হলো তাবিরী ও মুজতাহিদগণের জন্য একক সাহাবীর অনুকরণ (তাকলীদ) সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ।"

ইমাম শওকানী

ইমাম শওকানী

امام شوكانى" ارشاد الفحول' الفصل السابع فى الاستدلال ' البحث الخامس، فى الصحابى

পঞ্চম অধ্যায়ে সাহাবীদের প্রসংগ। এই অধ্যায়ে তিনি নিজের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্য নিম্নের ভাষায় আলোচনা করেছেনঃ

والحق انه ليس بحجة - فان الله سبحانه لم يبعث الى هذه الامة الآنبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وليس لنا الا رسول واحد وكتاب واحد وجميع الامة مأمور باتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق

بين الصحابة ومن بعدهم فى ذالك كلهم مكلّفون بالتكاليف الشرعية وباتباع الكتاب والسنة فمن قال انها تقوم الحجّة فى دين الله عز وجلّ بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع اليهما فقد قال فى دين الله بما لا يثبت -

"হককথা এই যে, (সাহাবীর কথা) হুজ্জাত (দলিল) নয়। কেননা আল্লাহ সুব্হানাহু তায়ালা এ উম্মতের কাছে নবী মুহাম্মদ (সঃ) ব্যতীত অন্য কাউকে পাঠাননি। আমাদের জন্য এক রসূল ও এক কিতাব ছাড়া আর কিছু নেই। আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীর সুন্নতেরই অনুসারী থাকবে বলে এই উম্মতকে আদেশ করা হয়েছে। আর এ ব্যাপারে সাহাবী এবং তাদের পরবর্তী লোকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

সুতরাং তাদের সকলেরই ওপর শরীয়তের বিধি-নিষেধ সমানভাবে আরোপিত হয়েছে। কিতাব ও সুন্নতের অনুসরণ করার জন্য তাদের সকলকেই সমানভাবে আদেশ করা হয়েছে।

এরপরও যে বলবে যে, আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীর সুন্নত আর যা কিছু এ উভয় উৎস থেকে উৎসারিত- এগুলি ব্যতীত আল্লাহ্‌র দীন ইসলামের মধ্যে অন্য কোনো জিনিস দলিল হিসাবে বর্তমান আছে, সে আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে এমন কথা বললো, যা প্রমাণিত নয় এবং যার কোনো ভিত্তি নেই।"

শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহঃ)

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষের দিকে التنبيه على مسائل শিরোণামে একটি পরিচ্ছেদে লিখেছেন :

"সাহাবীদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, তাবিয়ীদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এবং তাবে তাবিয়ীদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক কথায় সকলের মধ্যেই ঐকমত্য (ইজমা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এঁদের কেউ তাঁদের মধ্যে থেকে কিংবা তাঁদের পূর্ববর্তী কারো থেকে কিছু গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে এবং তার থেকে হুবহু সবকিছুই গ্রহণ করলে তা অচল ও নিষিদ্ধ হবে।"

তারপর শাহ সাহেব اليواقيت والجواهر শিরোনামে মায়হাব সমূহের ইমামদের মন্তব্য উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নে দেয়া হলো :

ইমাম মালিক

"আল্লাহ্‌র রসূল ব্যতীত প্রতিটি মানুষই এমন, যার কথার কিছু অংশ গ্রহণ করা এবং কিছু অংশ ত্যাগ করা যেতে পারে।"

ইমাম শাফিয়ী

لا حجة في قول احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم -

"রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছাড়া কারো কথা দলিল (হুজ্জাত) হতে পারে না।"

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

ليس لاحد مع الله ورسوله كلام -

"মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল-এর কথার সমতুল্য আর কারো কথা হতে পারেনা।"

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং উদ্ধৃতিসমূহ থেকে একটি সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছে যে, দীন ইসলামে বাধ্যতামূলক ও অকাট্য দলিল প্রমাণ এবং সনদ একমাত্র কিতাবুল্লাহ ও সুন্নতে রসূল এবং তার পরে ইজমায়ে সাহাবা।

একজন সাহাবী অথবা কয়েকজন সাহাবীর কথা ও কাজকে কিতাব, সুন্নত এবং ইজমায়ে সাহাবার মত আবশ্যিক ও অকাট্য দলিল এবং যাচাই-বাছাই এর উর্ধে মনে করা যাবেনা। একে নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করা যাবেনা।

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে যে নীতিগত কথা বলা হয়েছে তাথেকে যদি কোনো অতিরিক্ত কথা বের করা হয়, তবে তা উপরে যে কথাগুলো বলা হলো অতটুকুই। আর এসব কথা সম্পূর্ণ সঠিক ও শুদ্ধ। এতে সাহাবীদের কোনো অবমূল্যায়ন হয়না। চিরাচরিত ঐতিহ্যগত রীতিনীতির বরখেলাফও কিছু এতে নেই।

জামায়াতে ইসলামী গঠনতন্ত্রে শুধুমাত্র আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রুকন (সদস্য)দের কাছে দাবী করছে যে, তারা যেন নবী ও অনবীর মধ্যে পার্থক্য করেন এবং অনবীকে যেন তারা সমালোচনার (পরখ করার) উর্ধে মনে না করেন।

এ থেকে অনাহূতভাবে এবং জোর করে এ অর্থ বের করা পরিষ্কার জুলুম হবে যে, জামায়াতে ইসলামীর উপর ও নীচের সব লোকের জন্য এটি জরুরী কিংবা জায়েয হয়ে গেছে যে, তারা সাহাবীদের ব্যক্তিগত অথবা তাঁদের মধ্যকার বিতর্কমূলক বিষয়সমূহে নাক গলাবে অথবা পান্ডিত্য প্রদর্শন করবে।

গঠনতন্ত্রে এ বাক্যটির সংযোজন ও জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ২২ বছর অতিবাহিত হলো। কিন্তু এযাবৎ এমন একটিও উদাহরণ পাওয়া যায়নি যে, জামায়াতের কোনো সদস্য এ বাক্যটি থেকে অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে কোনো সাহাবীর কথা ও কাজের ব্যাপারে কোনো অবমাননাকর উক্তি করেছেন অথবা সাহাবায়ে কিরামের

ব্যাপারে অন্য কোনো ভঙ্গীতে বে-আদবী ও অসম্মানজনকভাবে কোনো টিপ্পনী কেটেছেন।

পক্ষান্তরে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী মহলে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় যে, 'আবু যারেসানী' বা দ্বিতীয় আবুযার গিফারী' বলে কাউকে কাউকে উপাধি দেয়া হয়েছে।

এ ধরনের উপাধিদানকারী ও গ্রহণকারীগণের মধ্যে এতটুকুও অনুভূতি জাগ্রত হতে দেখা যায়নি যে, এতে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা প্রকাশ পাচ্ছে কিনা?

উপরের ছত্রগুলিতে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য কখনো এ নয় যে, সাহাবায়ে কিরামের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা কোনোক্রমেই ধর্তব্য নয় এবং তা থেকে আমাদের জন্য কোনোই পথ নির্দেশনা পাওয়া যায়না।

উপরে বর্ণিত যে সব জ্ঞানী-গুণী জনের বক্তব্য ও মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একজনও এমন নেই যিনি সাহাবীদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ ছুড়ে ফেলে দিতে চান এবং জামায়াতেরও কোনো ব্যক্তির চিন্তাধারা বা দৃষ্টিভঙ্গি এমন নয়।

জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য যার নজরে পড়েছে, তিনি অনায়াসেই অনুধাবন করতে পারেন যে, তার ভেতর জীবন সমস্যার সমাধান কল্পে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কিতাব ও সুন্নতের সাথে সাথে সাহাবীদের জীবনচরিত ও কার্যকলাপ তো দূরের কথা তাবিয়ীন, মুহাদ্দিসীন এবং আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীনের কথাবার্তা থেকে পর্যন্ত সাহায্য-সমর্থন নেয়া হয়েছে।

সত্য কথা এই যে, এ সমস্ত ঐতিহ্য ভান্ডার আমাদের জন্য অমূল্য সম্পদ এবং দুর্লভ উত্তরাধিকার, যার প্রয়োজন আমাদের কখনো ফুরাবেনা।

তবে বিতর্ক শুধু এই ব্যাপারে যে, একক সাহাবীর প্রত্যেকটি কথা হুবহু কিতাব ও সুন্নতের ন্যায় নিঃশর্ত অনুসরণীয়, না কি তা গ্রহণ করার পূর্বে দেখতে হবে যে, এটি কিতাব ও সুন্নতের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? [তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর, ১৯৬৩ইং]

বাইবেলে রদবদলের প্রমাণ

প্রশ্ন ঃ আমি একজন কলেজ ছাত্র। আমার একজন খৃস্টান সহপাঠি আছে। তার সাথে প্রায়ই আমার ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্ক হয়। আমি তাকে বলি ঃ 'বাইবেলে অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়েছে।' কিন্তু সে একথা অস্বীকার করে। আমার কাছে রদবদলের প্রমাণ দাবী করে। সে বলে, ১৯৪৭ ঈসায়ী সালে মৃতসাগরের উপকূলে ইঞ্জিলের কিছু কপি পাওয়া গেছে। তা থেকে প্রমাণিত হয়, বর্তমান বাইবেল অকাট্য সত্য। এখন বাইবেলে রদবদল হবার প্রমাণ কিভাবে দেয়া যেতে পারে, তা আপনার নিকট জানতে চাচ্ছি।

আমার সহপাঠী আরেকটি কথা বলছে। তাহলো, হযরত মূসা (আঃ) নাকি ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন ঃ "আমার পরে আখেরী নবী আসবেন, তার নাম হবে ঈসা।"

জবাব ঃ আপনার সহপাঠী বন্ধু বাইবেলকে রদবদল করার কথা অস্বীকার করছেন? এতো আশ্চর্যের কথা! বাইবেল একবার পড়েছে এবং তার সংকলন পদ্ধতি ও আলোচ্য বিষয়গুলোর উপর মনোনিবেশ করে চিন্তা করেছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি অতি সহজেই বাইবেলে রদবদলের বিষয়টি অনুভব করতে পারে। গোটা বিশ্বে বাইবেলে রদবদল হবার বিষয়টি স্বীকৃত। এমনকি খৃস্টান এবং ইহুদী বিশেষজ্ঞরাও তা স্বীকার করেন। এ সত্যকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বর্তমানে "বাইবেলের সমালোচনা" একটি পৃথক সাবজেক্টের রূপ লাভ করেছে। এ বিষয়ে গ্রন্থাবলী রচিত হচ্ছে।

কয়েকটি প্রমাণের কথা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করছি। কোনো গ্রন্থ বিভিন্নরূপে রদবদল হয়ে থাকে। যেমন ঃ

ক. মূল গ্রন্থটিকে পরিবর্ধন করা।

খ. বিষয়সূচী ও বিষয়বস্তুর রদবদল করা ।

গ. যে ভাষায় মূল গ্রন্থ বর্তমান ছিলো, সে ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া কিংবা,

ঘ. গ্রন্থটিকে মূলভাষা থেকে অপর ভাষায়, আবার সে ভাষা থেকে আরেক ভাষায় ভাষান্তর করতে করতে মূলগ্রন্থের অস্তিত্ব না থাকা, প্রভৃতি।

আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করুন, বাইবেল নামে বর্তমান বিশ্বে বনী ইসরাইল নবীগণের গ্রন্থাবলীর যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তার একটিও কি সেই মূলভাষায় বিশ্বের কোথাও বর্তমান আছে, যে ভাষায় তা সূচনাতে নাযিল হয়েছিল? যে ভাষায় সে নবী এবং নবীর জাতি কথা বলতেন? যেমন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষা ছিলো আরামীয় (ARAMAIC)। ঐ ভাষায় বিশ্বের কোথাও ইঞ্জিল (নিউ টেস্টামেন্ট) বর্তমান আছে কি?

তা ছাড়া, কেউ যদি মনোযোগের সাথে ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট পড়ে দেখেন, তবে তিনি দেখবেন, তাতে কেবল আল্লাহর বাণীই (WORD OF GOD) নেই, বরঞ্চ তাতে নবীগণের কথাও (যাকে আমরা হাদীস বলি) সংকলিত হয়েছে। তাছাড়া নবী নয় এমন লোকদের পক্ষ থেকে খোদা এবং নবীদের বাণীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও সংকলিত হয়েছে। তাতে ইহুদী এবং খৃস্টানদের জাতীয় এবং ধর্মীয় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাদের ধর্মীয় আইনের সেইসব খুঁটিনাটি অংশও তাতে রয়েছে, যা নবীগণের পরে ধর্মীয় আলেমগণ সম্পাদন করেছেন (এ জিনিসকে আমরা ফিকাহ বলে থাকি)। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে হযরত মূসার (আঃ) ওফাত এবং নিউ টেস্টামেন্টে হযরত ঈসার ক্রুশবিদ্ধ হয়ে জীবন দেয়ার ঘটনা উল্লেখ আছে। নবীরা কি মৃত্যুর আগেই নিজের মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করতে পারতেন? তাদের জীবদ্দশায়ই কি আল্লাহ তায়ালা তাদের মৃত্যুর

ঘটনা এভাবে বলে দিয়েছেন, যেভাবে কেবল অতীত ঘটনাই বর্ণনা করা হয়ে থাকে? বাইবেলের চারটি গ্রন্থেই গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ আছে। এরপরও কি কেউ একথা বলতে পারে যে, এ গ্রন্থ মানুষের রচিত নয়?

এরপর আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করুন, এই গ্রন্থগুলোতে নবী এবং সালেহ লোকদের যে নোংরা চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোও কি (নাউযুবিল্লাহ) খোদার অবতীর্ণ বাণী? যেমন, হযরত লূত আলাইহিস সালামের প্রতি স্বীয় কন্যাদের সাথে ব্যভিচারের অপবাদ, হযরত ইয়াকুবের (আঃ) পুত্র এবং কন্যার প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ, হযরত দাউদ (আঃ) এবং তার পুত্রের প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ, হযরত সুলাইমানের (আঃ) প্রতি শিরক করা এবং মূর্তিপুজার অভিযোগ প্রভৃতি চরম লজ্জাকর অপবাদসমূহ বর্তমান থাকা অবস্থায়ও কি করে কোনো ব্যক্তি ধারণা করতে পারে যে, এসব গ্রন্থ রদবদল থেকে পবিত্র?

মৃতসাগরে প্রাপ্ত লিপিসমূহ থেকে বাইবেলের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, আপনার বন্ধুটির একথাও একেবারেই ভুল। বরঞ্চ ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। এসব লিপি প্রাপ্তির পর গোটা খৃষ্টজগত প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। কারণ সেই লিপির আলোচ্য বিষয় প্রচলিত বাইবেল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

আপনার সহপাঠী হয় এই বিষয়ে অজ্ঞ, আর না হয় আপনাকে প্রতারিত করার জন্যে এসব কথাবার্তা বলেছেন। আপনার বন্ধুর একথাটিও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, মূসা (আঃ) বলেছেন, হযরত ঈসা (আঃ) আখেরী নবী। একথা যদি সত্য হতো, তাহলে হযরত ঈসা (আঃ) কেন বললেন ঃ আমার পরেও একজন নবী আসবেন এবং আমি চলে না গেলে তিনি আসছেননা? [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ঃ ১৯৬৮ইং]

সাহাবীদের অবমাননার ভিত্তিহীন ও অর্থহীন অভিযোগ

প্রশ্ন ঃ এ পরিস্থিতি বড়ই দুঃখজনক যে মাওলানা মওদূদীর কিছু লেখাকে ভিত্তি করে তাঁর এবং জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কতিপয় লোক কিছুদিন ধরে এক অভিযান চালাচ্ছেন। তারা এদেরকে সাহাবীদের অবমাননা করার দায়ে দায়ী করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বই-পুস্তক লিখিত হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী প্রথমে 'তাজদীদ ও ইহয়ায়ে দীন' পুস্তকে লিখেছিলেন যে, হযরত উসমান (রাঃ) ঐসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেননা, যা তার মহান পূর্বসূরীদ্বয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

খিলাফত ও মুলুকিয়্যাত পুস্তকে একথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, হযরত উসমান (রাঃ) শায়খাইনের (আবু বকর ও উমর) নীতি থেকে সরে গিয়ে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল অনুপোযুক্ত পদ্ধতি এবং কার্যত মারাত্মক ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন এবং তাদেরকে উপহার উপঢৌকনে ধন্য করেছিলেন যার কারণে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। এ

ব্যাপারে মারওয়ানেরও সমালোচনা করা হয়েছে।

এভাবে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) সম্বন্ধে মাওলানা মওদূদী লিখেছেন যে, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে আইন অমান্যকারী ও বিদ্রোহী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান (রাঃ) এর সম্পর্কেও 'খিলাফত ও মুলূকিয়্যাত' এ কিছু অনুচিত মন্তব্য করা হয়েছে। এসব কথা বলে সাহাবায়ে কিরামের সাথে বেআদবী ও গোস্তাখি করা হয়েছে বলে মনে করা হয়।

খিলাফত ও মুলুকিয়্যাতে যে সব ঘটনা স্থান পেয়েছে, সেগুলোর তো বরাত দেয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ পুস্তকে যেভাবে সিদ্দিকী ও ফারুকী যুগের সাথে পরবর্তী যুগসমূহের তুলনা করা হয়েছে, সেভাবে তুলনা করে অন্য কোনো লেখক বা ঐতিহাসিক বক্তব্য ও মন্তব্য রেখেছেন অথবা এ ধরনের সমালোচনা করেছেন বলে কোনো নজীর আছে কি? যদি কোনো নজীর থাকে, তবে তা দয়া করে উপস্থাপন করা হোক। এতে আশা করা যায় যে, ঐসব লোক আশ্বস্ত হবেন, যারা জিদ ও হঠকারিতায় লিপ্ত নয়; বরং অপপ্রচার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

উত্তর ঃ মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর কিতাব খিলাফত ও মুলুকিয়্যাতের (নতুন সংস্করণ) পরিশিষ্টে এমন কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা একজন সত্যসন্ধানী ব্যক্তির তৃপ্তি ও সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট; তা সত্ত্বেও আমি কতিপয় ব্যাখ্যা নিজের পক্ষ থেকে এখানে উপস্থাপন করছি ঃ

হযরত উসমান (রাঃ) কিংবা অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর কলম হতে এমন কোনো কথা বের হয়নি, যাকে (আল্লাহ মাফ করুন) বিদ্রুপ ও গালি অথবা তিরস্কার ও ভর্ৎসনা পর্যায়ে গণ্য করা যায়। মাওলানা মরহুম যা কিছু লিখেছেন আহলে সুন্নতের ইমামবৃন্দ ইতিহাস ও জীবনীলেখকবৃন্দ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের সকলেই কমবেশী এরূপই বক্তব্য রেখে আসছেন। বরং এখেকেও কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

এধরনের একটি দুটি নয়, বরং অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি চাচ্ছি আপাততঃ সর্বপ্রথম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্-এর কিতাব 'মিনহাজুস সুন্নাহ' থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করি। তাঁকে এবং তাঁর এ গ্রন্থটিকে আমি দু' কারণে বেছে নিলাম। প্রথম কারণ এই যে, মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে বলতে ও লিখতে গিয়ে যাদের কলম ও মুখে লাগাম থাকেনা, তাদের হামলা ও বাড়াবাড়ি থেকে ইবনে জারীর, ইবনে আব্দুল বার্‌র এবং ইবনে কাসীরের ন্যায় উঁচুদরের বিদগ্ধজন এবং শাস্ত্র বিশারদ ইমামগণও রেহাই পাননি।

এটি আল্লাহ্‌র মেহেরবানী যে, ঐ ব্যক্তিবর্গের নিকট এখনো ইবনে তাইমিয়াহ এবং বিশেষতঃ তাঁর কিতাব 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ' এর গুরুত্ব বহাল রয়েছে। তারা তাঁকে জায়গায় জায়গায় 'শায়খুল ইসলাম' উপাধি দ্বারা স্মরণ করে তাঁর কিতাবের উদ্ধৃতি

আওড়িয়ে থাকেন।

এ গ্রন্থটিকে বাছাই করার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, হাজার পৃষ্ঠার উর্ধের গ্রন্থটি এক শীয়া পুস্তক প্রণেতার প্রতিবাদে লিখিত। এতে খোলাফায়ে রাশিদীন এবং আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর পক্ষ সমর্থন করতে এক বিন্দুও ত্রুটি করা হয়নি। এমন কি, মারওয়ান এবং ইয়াযীদের সাফাই দিতেও সামান্যতম কসুর করা হয়নি। পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যারাই কিছু লিখেছেন তারা সকলেই ইমাম ইবনে তাইমিয়ার উচ্ছিষ্টভোজী।

'মিনহাজুস্ সুন্নাহ' কিতাবের চতুর্থ এবং শেষ খন্ডের এক পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সত্য ও মিথ্যা হওয়া নির্ভর করে তার সনদ সূত্রের ওপর। ঐ পরিচ্ছেদের সূচনা করা হয়েছে এই ভাষায় ঃ

وهنا طريق يمكن سلوكها لمن لم تكن له معرفة بالاخبار .....

সেখানে ইবনে তাইমিয়াহ প্রথমে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে হযরত আবু বকর (রাঃ) খিলাফতের প্রশাসন এমনভাবে চালিয়েছিলেন যে, কারো প্রতি অগ্রাধিকারের নীতিও প্রদর্শন করেননি। আত্মীয় স্বজনদেরকেও কোনো পদ দান করেননি।

অতঃপর তিনি হযরত উমরের (রাঃ) কর্মনীতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

لم يتلوث لهم بمال ولا ولى احد من اقاربه ولاية فهذا امر يعرفه كل احد واما عثمان فانه بنى على امر قد استقر قبله بسكينة وحلم وهدى ورحمة وكرم ولم يكن فيه قوة عمر ولا سياسته ولا فيه كمال عدله وزهده فطمع فيه بعض الطمع وتوسعوا فى الدنيا وضعف خوفهم من الله ومنه ومن ضعفه هو وما حصل من اقاربه فى الولاية والمال ما اوجب الفتنة حتى قتل مظلوما شهيدا - (ص ١٢١ منهاج السنة، الجزء الرابع بالمطبعة الاميرية ببولاق، مصر ١٣٢٢)

"হযরত উমর (রাঃ) জনগণকে অর্থানুকূল্যে কলংকিত করেননি এবং নিজের কোনো আত্মীয়কে সরকারী কোনো পদও দান করেননি। এ এমন একটি ব্যাপার যা সকলেই জানেন। কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ)-এর কথা একটু স্বতন্ত্র। তিনি আগের মতই নিশ্চিন্ত মনে সহিষ্ণুতা, সত্যচারিতা, সহৃদয়তা ও মহানুভবতা সহকারে প্রশাসন ব্যবস্থাকে চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় দৃঢ়তা ছিলনা, আর ছিলনা তাঁর মত রাজনৈতিক প্রজ্ঞা। হযরত উমরের ভেতর যে পরিমাণ ন্যায়-বিচার ত্যাগ এবং সংযমের পরাকাষ্ঠা ছিল, সে পরিমাণ পরিদৃষ্ট হয়নি হযরত উসমান (রাঃ)-এর ভেতর। এ কারণে কিছু লোক তাঁর থেকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকে এবং তারা পার্থিব ভোগ-বিলাসে মেতে ওঠে। তাদের অন্তরে খোদা অথবা খলীফার ভয় কমে এসেছিল।
হযরত উসমান (রাঃ)-এর দুর্বলতা এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের পদমর্যাদা ও অর্থানুকূল্য লাভকে মূলধন বানিয়ে কিছু গোলযোগপ্রিয় লোক বিশৃংখলা সৃষ্টিতে মেতে উঠলো। এরই পরিণতিতে তিনি মজলুম অবস্থায় নির্মমভাবে শহীদ হয়ে গেলেন।" (মিনহাজুস্ সুন্নাহ ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১২১)

পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ের ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ

"হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ) স্বীয় স্বভাব-প্রকৃতিতে হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) হতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ছিলেন। এ জন্যেই হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাঃ) কোনো নিন্দা কুড়াননি, বরং শুধু প্রশংসাই পেয়েছিলেন। এরই কারণে এ দুজনের খিলাফতকালে কোনো বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়নি।"

'মিনহাজুস্ সুন্নাহ' এর ঐ ৪র্থ খন্ডে একটি পরিচ্ছেদ নিম্নরূপ ভাষায় আরম্ভ করা হয়েছে ঃ

قال الرافضى الخامس اخيارة بالغائب........

এরই ভেতর ১৭৯ পৃষ্ঠায় এই বক্তব্য রয়েছে ঃ

"সাহাবী ও তাবিয়ীদের মধ্যে কেউ মুয়াবিয়া (রাঃ)কে মুনাফিক বলার মত অভিযোগ আনেননি। কিন্তু তাঁর পিতা সম্পর্কে তাঁদের ভেতর মতভেদ দেখা যায়।"

নিজের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আমি ঐ মতভেদের বিশদ বিবরণ সম্পর্কে জানি না। তবে এ উক্তিটি দুর্ণাম রটনাকারী ফত্ওয়াবাজ আলেমগণের খিদমতে পেশ করছি। আরো দেখতে চাচ্ছি যে, তারা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার বিরুদ্ধে কি ফত্ওয়া ঘোষণা করেন?

আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন তবারী শাফিয়ী স্বীয় কিতাব-
"الرياض النضرة فى مناقب العشرة" তে হযরত

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব থেকে হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কে যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা 'খিলাফত ও মূলুকিয়্যাতের' পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে। তা থেকে অবহিত হওয়া যায় সাহাবায়ে কিরাম হযরত উসমান (রাঃ)-এর ঐ কর্মপদ্ধতি পছন্দ করতেন না যে তিনি উমাইয়্যা বংশীয় সাহাবীদেরকে উল্লেখযোগ্য সরকারী পদসমূহে অভিষিক্ত করেছিলেন। ঐ উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ থেকে অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছিল। এমনকি সংশোধনের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরও সেসব অভিযোগ নিরসন করা সম্ভব হয়নি।

الرياض النضرة কিতাবখানি সম্বন্ধে একটি অতিরিক্ত কথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে রাখতে চাই যে, এ কিতাবের বিষয়বস্তু নিছক ইতিহাস বর্ণনা করা নয়, বরং বিশেষভাবে খারিজী এবং শিয়া আকীদা খণ্ডন ও সুন্নী আকীদা প্রতিষ্ঠা এবং তার যথার্থতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এটি লিখিত হয়েছিল। এর মধ্যে সেই দশজন সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে, যাদেরকে রসূলুল্লাহ (সঃ) জান্নাতী বলে সুনির্দিষ্টভাবে সুসংবাদ দিয়েছিলেন। 'আহলে সুন্নাত' তথা সুন্নী মুসলিম সমাজ তাঁদেরকে "আশারায়ে মুবাশ্শারা" (সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী) উপাধি দিয়ে স্মরণ করে থাকেন।

হাফিজ মুহিব্বুদীন তাবারীর (রহঃ) এ কথাকে ভিত্তি করে মুল্লা আলীকারী (রহঃ) 'মিশকাত'এর ভাষ্য 'মিরকাতের' হযরত আবু বকর এবং হযরত উসমান (রাঃ)-এর চরিত্রের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন নিম্নের ভাষায় ঃ

وان اتفق خلاف ذالك فى بادى النظر رجعوا اليه فى ثانية مستوصبين رأيه معترفين بان الحق كان معه كما فى قتال اهل الردة او نحو ذالك وهذا المعنى فقد فى عثمان فانهم خالفوا رايه فى كثير من وقايعه ولم يرجعوا اليه بل اصرّوا على انكارهم عليه حتى قُتِلَ وكان مع ذالك على الحق ما شهدت به الاحاديث وكان رجلا صالحًا على مادل هذا الحديث فالنقص انما كان عما ثبت للشيخين قبله ـ كذا حقّقه الطبرى فى الرياض النضرة ـ

"হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সাথে স্থূল দৃষ্টিতে কখনো যদিওবা সাহাবায়ে কিরামের মতভেদ হয়ে থাকে কিন্তু পরক্ষণে গভীর চিন্তা-ভাবনা করার পর হযরত আবু বকরের রায়কে শুদ্ধ মনে করে তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন এবং তা প্রকাশ্যভাবে স্বীকারও করেছেন। রিদ্দার যুদ্ধের ন্যায় অন্যান্য কয়েকটি ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ।"

কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ)-এর বেলায় সেটি ঘটেনি। বহু ঘটনা এমন আছে যে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সাথে মতভেদ করেছেন এবং কখনো তারা একমত হতে পারেননি। বরং তাঁরা তাঁর রায়ের প্রতিবাদ ও অস্বীকৃতিতে অবিচল ও আপোষহীন থেকেছেন, এমন কি এ অবস্থায় তিনি শহীদও হয়ে গিয়েছেন। তবে এতদসত্ত্বেও তিনি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিভিন্ন হাদীস সূত্রে তার প্রমাণও আছে। এসব হাদীসের বিচারেও তিনি একজন নেক লোক ছিলেন। তাঁর মধ্যে কমতি বা দুর্বলতা শুধু ঐ মানদন্ডের বিচারে ধরা পড়ে, যা তাঁর পূর্ববর্তী শায়খাইনের (আবু বকর-উমর রাঃ) মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাবারী তাঁর গ্রন্থে এই পর্যালোচনাই পেশ করেছেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ)-এর কিতাব 'ইযালাতুল খিফাই 'আন খিলাকতিল খুলাফা'ই' এর আলোচ্য বিষয়ও তাই। তার মধ্যে খারিজী ও শীয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার প্রতিবাদ, খিলাফতে রাশিদার সত্যানুগতা, খোলাফায়ে রাশিদীনের নীতি ও কার্যকলাপের আলোচনা বিধৃত হয়েছে।

এখন ইযালাতুল খিফার (১ম পরিচ্ছেদ) এর ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত বক্তব্য নিম্নে দ্রষ্টব্য ঃ

سیرت حضرت ذی النورین رض بہ نسبت سیرت شیخین رض مغایر
تے داشت زیراکہ گاہے از عزیمت بر خصت تنزل می نمود وامراء
حضرت ذی النورین رض نہ بر صفت امراء شیخین رض بودند"

"হযরত উসমান যুন্নূরাইনের সীরাত (জীবনচরিত) আবু বকর ও উমর (শায়খাইন রাঃ) এর সীরাত থেকে ব্যতিক্রমধর্মী ও ভিন্ন ধরনের ছিল। কেননা হযরত উসমান (রাঃ) 'আযীমত' (ইসলামের সর্বোচ্চ বাঞ্ছিতমান) এর পরিবর্তে 'রুখসত' (বৈধ কিন্তু অনুমতিপ্রাপ্ত নিম্নমান)-এর পর্যায়ে নেমে আসতেন। তাঁর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের গুণ-বৈশিষ্ট্যও প্রথম খলিফাদ্বয়ের কর্মচারীবৃন্দের গুণ-বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ ছিলনা।"

শাহ ওলীউল্লাহ সাহেবের সুযোগ্য উত্তরসূরী শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবীও শীয়াদের প্রতিবাদে এক স্বতন্ত্র কিতাব 'তোহ্ফায়ে ইস্না আশারিয়া' নামে প্রণয়ন করেছেন। তাতে সুস্পষ্টভাবে আমীর মুয়াবিয়াকে বাগী (বিদ্রোহী) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এইরূপে তিনি স্বীয় ফতওয়া ও অন্যান্য লেখাসমূহে বহুস্থানে মন্তব্য করেছেন যে আমীর মুয়াবিয়া প্রবৃত্তির লালসা থেকে মুক্ত ছিলেননা।

আমি নিম্নে বিশিষ্ট আহ্‌লে হাদীস (সলফী) আলিম নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের একটি বক্তব্য তুলে ধরছি, যাতে জনাব শাহ সাহেবের উদ্ধৃতিও দেয়া আছে। এজন্য এতে আহ্‌লে হাদীস এবং হানাফী সকলের নিমিত্ত খোরাক রয়েছে।

মরহুম নওয়াব সাহেব স্বীয় কিতাব "هداية السائل الى ادلة المسائل" এর ৫১০ পৃষ্ঠায় প্রথমেই লিখেছেন যে, মারওয়ান হযরত তাল্‌হা (রাঃ) এবং হযরত নু'মান ইবনে বশীরের হত্যাকারী ছিলেন।

এ উপলক্ষে তিনি মারওয়ান সম্বন্ধে ইমাম যাহাবী, ইবনে হায্‌ম্ এবং ইবনে হাব্বানের অত্যন্ত চরমপন্থী মতামত উদ্ধৃত করেছেন। অতঃপর বলেন ঃ

این اعتزار کہ قتل طلحہؓ بتاویل کرد عذری ہست کہ با وجودش ہیچ معصیت برائے ہیچ عاصی باقی نمی ماند بلکہ برائے وی دعوی تاویل میرسد واین ہمچو تاویل کسی ست کہ از طرف معاویہؓ در فواقر وی تاویل کردہ وگفتہ کہ وی در بغی خود مجتہد بود و در عواصم نوشتہ" وقد اعترف اہل الحدیث باجمعہم ان المحاربین بعلیّ رضی اللہ عنہ معاویۃؓ وجمیع من تبعہ بغاۃ علیہ وانہ صاحب الحق انتہی گویم مختار شاہ عبد العزیزؒ دہلوی در بعض افادات خودش نیز ہمیں ست کہ حرب معاویہؓ باعلی کرم اللہ وجہہ خالی از شائبہ نفسانیت نبود و قول بخطاے اجتہادی ضعیف است۔

"মারওয়ানের পক্ষ থেকে এ ওজর পেশ করা হয় যে, তিনি হযরত তাল্‌হা (রাঃ)কে কোনো এক বৈধ কারণে খুন করেছিলেন- এটি এমন একটি বাহানা, যার ভিত্তিতে যে কোনো অপরাধীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায় এবং তাকে এ ধরনের সুক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিয়ে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে। এ ধরনের অলীক ব্যাখ্যা ঠিক ঐ ব্যক্তির ব্যাখ্যার মত, যে ব্যক্তি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর ভুল কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন এবং বলেন যে, হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল ইজতিহাদের ভিত্তিতে।

মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-ওয়াযীর 'আওয়াসীমে' লিখেছেনঃ সমস্ত আহ্‌লে হাদীস মত প্রকাশ করেছেন যে, মুয়াবিয়া এবং তাঁর সকল সাথী-সঙ্গী যারা হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তারা সবাই হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিলেন। আমি (নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান) বল্‌ছি যে, শাহ্ আব্দুল আযীয (রহঃ)-এর উক্তি সমূহের মধ্যে এটিই গ্রহণযোগ্য মত যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর যুদ্ধ প্রবৃত্তির কুপ্রভাব থেকে মুক্ত ছিলনা। এ কথা দাবী করা দুর্বল যে, আমীর মুয়াবিয়া থেকে 'ইজতিহাদী ভুল অর্থাৎ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ভুল সংঘটিত হয়েছিল।

প্রশ্ন হলো, আহলে সুন্নতের ইমামগণ আর শীয়াপন্থীদের মুকাবিলায় সুন্নী মতাদর্শের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর্থক ও মুখপাত্র যাদেরকে গণ্য করা হয় তারা যখন উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের শুধু বর্ণনাকারীই নন, বরং প্রবক্তাও, আর এসব বক্তব্য এমন কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ, যা শীয়াদের প্রতিবাদে লিখিত, তখন যদি মাওলানা মওদূদী (রহঃ) 'খিলাফত ও মুলূকিয়্যাত' পুস্তকে ঐতিহাসিক আলোচনা প্রসঙ্গে এ ধরনেরই কিছু কথা লিখে থাকেন, তবে কোন্ অপরাধটা করে ফেল্লেন?

সাহাবায়ে কিরাম (রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম) সকলেই অবশ্যি সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র; কিন্তু তাঁরা নিষ্পাপ (মাসূম) নন। তাদের কিছু ত্রুটি খোদ কুরআনে উল্লেখ আছে, যা কোনো মুসলমানের অস্বীকার করার উপায় নেই।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সম্বন্ধে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) যা কিছু লিখেছেন, তা পূর্ণ সতর্কতার সাথেই লিখেছেন। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই লিখেছেন। এসবকে কোনো বিবেকবান এবং ইনসাফ প্রিয় ও ন্যায়বান ব্যক্তি সাহাবীদের জন্য অবমাননাকর বলে সাব্যস্ত করতে পারেনা।

হযরত উসমান (রাঃ) স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের সাথে যে উদার ব্যবহার চালু রেখেছিলেন, হযরত আবুবক্কর ও হযরত উমরের (রাঃ) কর্মনীতির সাথে তা তুলনা করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী (রাঃ) একে শুধু অসতর্কতামূলক এবং এমনটি না হলে ভাল হতো বলে মন্তব্য করেছেন। এ নীতিকে তিনি শরীয়তের খিলাফ এবং হারাম বলে মন্তব্য করেননি।

তাঁর নিজেরই ভাষা নিচে লক্ষ্য করুন ঃ

'সিলায়ে রেহেমী' বা আত্মীয় স্বজনের সাথে সদাচরণের শরয়ী বিধানের দাবী মনে করে হযরত উসমান (রাঃ) খলীফা হিসাবে নিজের আত্মীয় স্বজনদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন, তার কোনো অংশকেই শরীয়তের মানদন্ডে না-জায়েয বলা যেতে পারেনা। এটি অত্যন্ত পরিষ্কার কথা যে, শরীয়তে এমন কোনো হুকুম নেই যে খলীফা এমন কোন ব্যক্তিকে সরকারী পদ দান করতে পারবেননা, যে ব্যক্তি তার গোত্র বা আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। 'খুমুস' (এক পঞ্চাংশ) বন্টন অথবা বায়তুলমাল (সরকারী তহবিল) থেকে

সাহায্য দেয়ার বেলায়ও এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম-নীতি ছিলনা, যা তিনি লংঘন করেছিলেন।

এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করা কখনোই যেতে পারেনা যে, তিনি এ ব্যাপারে কোনো বৈধতার সীমা অতিক্রম করেছেন। কিন্তু তবুও একথা কি অস্বীকার করা যায় যে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বিচারে শুদ্ধতম কর্মনীতি ওটাই ছিল, যা হযরত আবুবকর এবং উমর (রাঃ) নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারে গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি হযরত উমর (রাঃ) তাঁর সকল সম্ভাব্য উত্তরসূরীকেও এ ব্যাপারে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন।" (খিলাফত ও মুলূকিয়্যাত)

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর নিকট হযরত উসমান (রাঃ)-এর জীবন চরিতের শুধু এই একটিমাত্র দিকই তাঁর পূর্বসূরীদের হতে ভিন্ন ছিল। অন্যথায় যে কোনো দিক থেকে বিচার করলে তিনি একজন আদর্শ প্রশাসক তথা খলীফায়ে রাশিদ ছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে মুহতারাম মাওলানা (রহঃ) লিখেছেন ঃ

"সত্য কথা এই যে, এই চরম সংকটকালে হযরত উসমান (রাঃ) এমন এক কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, যা একজন খলীফা এবং একজন বাদশাহ্র পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরে। তাঁর স্থানে কোনো বাদশাহ হলে তিনি তার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যে কোনো হীন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে কসুর করতেননা। তার পক্ষ থেকে যদি মদীনায় লংকাকান্ডও হয়ে যেত, আনসার-মুহাজিরদের পাইকারী হত্যাকান্ডও ঘটে যেত, রসূল (সঃ)-এর মহিয়ষী স্ত্রীগণের অবমাননা হতো এবং মসজিদে নববী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতো, তাহলেও তিনি পরোয়া করতেননা। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন খলীফায়ে রাশিদ।

তিনি কঠিন থেকে কঠিনতম মুহূর্তে এ কথার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন যে একজন খোদাভীরু অনুগত বান্দা স্বীয় ক্ষমতা রক্ষার ব্যাপারে কতটুকু অগ্রসর হতে পারেন, আর কোথায় গিয়ে তার থেমে যাওয়া উচিত। তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করাও এর চেয়ে সহজ ব্যাপার মনে করতেন যে তাঁর কারণে সেই সব নিষিদ্ধ সীমা লংঘিত ও পদদলিত হোক যা একজন মুমিনের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় হওয়া উচিত।" (খিলাফত ও মুলুকিয়্যাত)

লেখার এ ধরন ঐ ব্যক্তির কলম থেকে বের হতে পারে কি, যার অন্তরে হযরত উসমান (রাঃ) এর প্রতি অপমান ও অবমাননার সামান্যতম গন্ধ বিদ্যমান থাকে? সম্মান ও ঘৃণার অনুভূতি একই সাথে কারো অন্তরে কিভাবে একত্রিত থাকতে পারে। তা আমি বুঝতে অক্ষম।

আসল কথা এই যে, কাউকে অবমাননা করা কাজটির সম্পর্ক মানুষের কথা ও ভাষার সাথে যতটুকু, তার থেকে বেশী তার নিয়্যত ও হৃদয়ানুভূতির সাথে। তবে এটা হতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি বিশেষ কোনো ঘটনা বা বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে এমন

প্রকাশ ভঙ্গিমা গ্রহণ করেন, যা তার নিকট শালীনতা ও শিষ্টাচারের আওতাভুক্ত কিন্তু অপর কেউ এর মধ্যে সীমা লংঘন হয়েছে বলে মনে করতে পারে।

এক্ষেত্রে একজন খোদাভীরু মুসলমানের পক্ষে এটা সঙ্গত নয় যে, তার অপর দ্বীনী ভাই সম্পর্কে এরূপ কুধারণা পোষণ করবে যে, উনি জেনে শুনে ঐসব সম্মানিত ব্যক্তিত্বের অবমাননা করেছেন। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মান ও মর্যাদা দানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের সদা সচেতন থাকা কর্তব্য।

কোনো ব্যক্তিকে ঐ মহাপুরুষদের অসম্মান করার দোষে দোষী সাব্যস্ত করার অর্থ হচ্ছে উনি জ্ঞাতসারে তাঁদের অমর্যাদা করেছেন এবং তার দিল তাঁদের প্রতি মর্যাদাবোধ থেকে সম্পূর্ণ শূন্য। তার বিরুদ্ধে এত বড় একটি অভিযোগ তার একটি বাক্য অথবা কয়েকটি শব্দের ভিত্তিতে উত্থাপন করা কি শুদ্ধ ও সঙ্গত হবে? অথচ তাঁর সারা জীবনে তিনি তাঁর লেখনী, বক্তৃতাবলী এবং কর্মতৎপরতা ঐসব মহান ব্যক্তিদের (সাহাবায়ে কিরাম) প্রশংসা ও গুণ বর্ণনায় নিয়োজিত রেখেছেন, তাঁদের জীবন চরিত ও আদর্শ অনুসরণ করার জন্য সমস্ত দুনিয়াকে দাওয়াত দেয়ার কাজে তাঁর গোটা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

কিন্তু আজ এটা আমাদের জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আমাদের ধর্মীয় মহলে একে অপরের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র অবমাননা, নবীদের অবমাননা এবং সাহাবীদের অবমাননার অভিযোগ এত সহজে ও এত বেশী আরোপিত হচ্ছে যে, এটি একটি শিশুসুলভ খেল্ তামাশায় পরিণত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দ্বীনী মহল অন্য একটি দ্বীনী মহলের কিছু কথা কেটে ছেটে অথবা পূর্বাপর বিচ্ছিন্ন কিছু উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে তাদের প্রতি কুফুরী ও গোমরাহির ফতোয়া দিয়ে চলেছেন।

ব্রেলবী দেওবন্দী কিংবা আহলে হাদীস সকল মহলের আলেমরাই এ ব্যাপারে খুবই দক্ষতা দেখিয়ে চলেছেন। প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী দল এই রূপে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ির পরিণাম নিজেরাই উপভোগ করেছেন এবং দিবারাত্র তারা একথা স্বীকারও করেছেন। কিন্তু তাদের চিরাচরিত অভ্যাসানুযায়ী এ থেকে বিরত থাকছেননা।

শাহ ইসমাঈল শহীদ এবং অন্যান্য কিছু সম্মানিত ব্যক্তির কিছু কথা সম্বন্ধে দু'পক্ষের তর্কবিতর্কের যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে আছে, তা কারো অজানা নেই।

যে ধরনের যুক্তিজাল বিস্তার করে মাওলানা মওদূদীকে সাহাবীদের অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে, ঠিক এমনি যুক্তিজাল বিস্তার করে দেওবন্দী আলেমদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবমাননাই শুধু নয়, বরং আল্লাহরই অবমাননার দোষ চাপানো হয়েছে।

এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, দেওবন্দীদের মতে নাআউযুবিল্লাহ আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারেন এবং শয়তানের জ্ঞান নবীর জ্ঞানের চেয়ে বেশী।

আল্লাহতায়ালার পক্ষে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা, গায়েবের জ্ঞান এবং ইত্যাকার বিষয়াবলী সম্পর্কে ভুরি ভুরি কিতাব পত্র লিখে বাজিমাত করা হয়েছে।

একদিকে দ্বীন ইসলামের পক্ষ অবলম্বনকারীগণ পরস্পরে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে এবং সামান্যতম বৈধ কারণ ছাড়াই মুসলমানগণকে কাফির ও ফাসিক বলে ফতোয়া দিতে ভারী ব্যস্ত, অন্যদিকে ইসলাম বিমুখ, ধর্মদ্রোহী এবং দ্বীনের শত্রুরা ফাঁকামাঠ পেয়ে গিয়েছে। তাই তারা আল্লাহ, তাঁর রসূল, রসূলের সাহাবীদের সাথে সম্পৃক্ত এবং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় এমন প্রতিটি বিষয়ের প্রতি প্রকাশ্যে অবমাননা ও হাসিঠাট্টা করছে এবং নিশ্চিহ্ন করতে আদা-পানি খেয়ে লেগেছে।

আফসোস! অনুভূতি সম্পন্ন, সত্যসন্ধানী ও আত্মমর্যাদার অধিকারী মুসলমানগণ এখনো যদি সাবধান হতো এবং এহেন পরিস্থিতি সংশোধন করতো! (তরজমানুল কুরআন এপ্রিল ১৯৬৮ ইং)

খিলাফত ও রাজতন্ত্র

প্রশ্ন ঃ মাওলানা মওদূদী (রহঃ) তদীয় কিতাব 'খিলাফত ও মুলুকিয়্যাত'-এর ১৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয ঐসব সম্পদ ও সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করেছিলেন, যা তিনি অবৈধভাবে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রত্যার্পণকালে তিনি এ কথাও বলে পাঠান যে, কর্তাব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন যখন অন্যায় ও অবিচার করে, আর তিনি তার প্রতিকার না করেন; তখন তিনি কোন মুখ নিয়ে অন্য সকলকে অন্যায় ও অবিচার হতে রুখতে পারেন?

এ ঘটনাবলীর প্রমাণ হিসাবে মাওলানা সাহেব 'আল-বিদায়াহ' এবং 'কামিল ইবনে আসীর'-এর ইতিহাসসমূহের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন। কোনো কোনো সম্মানিত ও শিক্ষিত লোক বলেছেন যে, এসব ইতিহাসের কিতাবের ওপর নির্ভর করা যায়না। আব্বাসীয়গণ এবং অন্য কিছু লোক মারওয়ান এবং তার বংশধরদের বদনাম করার জন্য এসব কল্প কাহিনীর জন্ম দিয়েছেন। আর সে থেকে এগুলো ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়ে আসছে। নতুবা, আসলে উমাইয়্যাদের শাসনকাল একটি আদর্শ শাসনকাল ছিল। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) ঐ কিতাবের ১৭৪ পৃষ্ঠায় এও লিখেছেন যে, মুয়াবিয়া (রাঃ) স্বয়ং এবং তাঁর নির্দেশে তার গভর্নররা খুৎবাদানকালে হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি গালিগালাজের ঝড় বইয়ে দিতেন। এর জন্যও 'তাবারী' 'কামিল ইবনে আসীর' এবং 'আল-বিদায়াহ' এর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

এখানেও একই প্রশ্ন থেকে যায় যে এসব ঐতিহাসিক কিতাবের ওপর ভিত্তি করে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তোলা কতটুকু সঠিক?

হযরত মুযাবিয়া (রাঃ)-এর স্থলাভিষিক্তদের সম্পর্কে যদি এমন কথা বলা হয় তাহলে তা এত মারাত্মক হতোনা, কিন্তু খোদ মুয়াবিয়া সম্পর্কে এমনটি ভাবা সম্পূর্ণতঃ অসম্ভব যে তিনি নিজে এমন কাজটি করতেন এবং অপরকেও এমন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকবেন।

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নাবলীর উত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, ঐতিহাসিক আলোচনা এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জন্য ইতিহাসের এই সব পুস্তকের উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা। যে ঘটনাবলী কুরআন নাযিলের এবং নবী (সাঃ)-এর যুগের পরে সংঘটিত হয়েছে, ঐগুলির ব্যাপারে এ প্রশ্নই ওঠেনা যে, ওসবের বিস্তারিত বিবরণ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যাবে। হাঁ, ঐগুলি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত আল্লাহ এবং রসূলের কথা-বার্তার মধ্যে পাওয়া যেতে পারে এবং পাওয়াও যায়। কিন্তু সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাস ব্যতীত আর কোথাও পাওয়া যেতে পারেনা। আর এগুলির জ্ঞান অর্জন করতে হলে আমাদেরকে ইতিহাসের পুস্তকাদির দিকে অবশ্যি প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এটি একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন। এদিকে দৃষ্টি রেখেই তো আমাদের ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের সম্ভার রচনা করেছেন। ঐ ঐতিহাসিকদের মধ্যে বেশীর ভাগই মুফাসসির এবং মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন। তাদের সম্বন্ধে এটা বিশ্বাস করে নেয়া অসম্ভব যে তারা অমূলক ও ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা কিচ্ছাকাহিনী সংগ্রহ ও সংকলন করে যাবেন। আর এও কি সম্ভব যে, পুরা উম্মতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা চোখ বন্ধ করে এসব কিছু এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম পর্যন্ত বহন করে নিয়ে আসতে থাকবেন।

আপনি যেসব ঘটনা প্রশ্নের ভেতর উল্লেখ করেছেন, যদিও মাওলানা মওদূদী ওগুলিকে ইতিহাসের উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন; কিন্তু তবুও এর থেকে আপনি এটা মনে করবেননা যে হাদীসের কিতাবসমূহ এসব বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ খালি রয়েছে।

আপনি যেসব ঘটনা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, ওসব হাদীসের কিতাবসমূহের এমন কি 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'তেও বর্ণিত হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নে দেয়া গেলঃ

সুনানে আবূ দাউদ কিতাবুল খেরাক-এর একটি রিওয়ায়াত লক্ষ্য করুন ঃ

حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن المغيرة قال جمع عمر بن عبد العزيز بنى مروان حين استخلف فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها على صغير بنى هاشم ويزوج منها ايمهم وان فاطمة سألته ان يجعلها لها فابى فكانت كذلك فى حيوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله فلمّا ان ولى ابو بكر عمل فيها بما عمل

النبى صلى الله عليه وسلم فى حيوته حتى مضى لسبيله فلما ولى عمر فيها بمثل ما عمل حتى مضى لسبيله ثم اقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال عمر يعنى ابن عبد العزيز فرأيت امرًا منعه النبى صلى الله عليه وسلم فاطمة ليس لى بحق وانى اشهدكم انى قد رددتها على ما كانت يعنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔

"আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রহঃ) আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন। জরীর (রহঃ) মুগীরা (রহঃ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে অবহিত করেছিলেন যে, উমর ইবনে আবদুল আযীয যখন খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি মারওয়ানের বংশধরদেরকে ডেকে একত্রিত করলেন। তিনি তাদেকে বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মালিকানায় 'ফিদাক' এর বাগ-বাগিচা ছিল। তিনি তা থেকে হাশিম বংশীয় নাবালক ছেলেমেয়ের স্বার্থে খরচ করতেন এবং বিধবা ও অবিবাহিত মেয়েদের বিবাহ খাতে ব্যয় করতেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) তাঁর কাছে আবদার করলেন যে,ওটা তাঁকে দেয়া হোক। কিন্তু হুযূর (সঃ) তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

নবী (সঃ)-এর জীবদ্দশায় এই অবস্থা বর্তমান ছিল, আর এ অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। পুনরায় হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন খলীফা হলেন, তখন তিনিও অনুরূপভাবে নবী (সঃ)-এর ধারা বজায় রাখলেন। তিনিও ইন্তিকাল করেন। এরপর হযরত উমর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন, তিনি পূর্ববর্তী দুজন মুরব্বীর অনুকরণে কাজ চালিয়ে গেলেন। অবশেষে তিনিও মারা গেলেন। আসলেন মারওয়ান, তিনি 'ফিদাক'কে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে নিলেন। উমার ইবনে আবদুল আযীয এটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। এ ব্যাপারে তিনি ভাষণে উল্লেখ করেনঃ যা রসূলুল্লাহ (সঃ) ফাতিমাকে দান করা থেকে বিরত ছিলেন, তা আমার জন্য ভোগ দখল করা জায়েয বলে মনে করিনা। তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি ওটাকে ঐ অবস্থায় বহাল করছি, যে অবস্থায় ওটা রসূলুল্লাহ (সঃ) বহাল রেখেছিলেন।"

বযলুল মজহুদের গ্রন্থকার এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

ثم اقطعها اى جعلها قطيعة لنفسه.

"মারওয়ান তাকে নিজের সম্পত্তি বানিয়ে নিলেন এবং তার পৌত্র আবদুল আযীয মালিক হয়ে গেলেন।" 'আহলে সুন্নাত'-এর নিকট একথা সর্বসম্মত যে, এ সম্পত্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি অথবা ব্যক্তিগত মালিকানা ছিলনা। বরং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর পদ এবং কর্তব্য পালনের আর্থিক ভরণ-পোষণ এ থেকে মিটানো হতো। এজন্যেই তাঁর অন্তর্ধানের পর যে-ই স্থলাভিষিক্ত হবেন, তিনিই এর ফল ভোগ করবেন। 'আবূ দাউদ' শরীফের এ পরিচ্ছেদের অপরাপর হাদীসসমূহ এবং 'সিহাহ সিত্তাহ'-এর অনেকগুলি হাদীস দ্বারা এ কথাটি অকাট্যভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে নবী(সঃ)-এর পবিত্র যুগে যেসব সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি বলে সাব্যস্ত হয়েছিল এবং 'খুমুস' (গনীমতের নির্দিষ্ট এক পঞ্চমাংশ) অথবা গণীমতের আরো যে সকল মাল হুযূরের হস্তগত হতো, ঐসব কিছুই উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টনযোগ্য ছিলনা। এগুলি ইসলামী রাষ্ট্রের এবং সমকালীন রাষ্ট্রীয় তহবিল বলে গণ্য হতো। এথেকে নবী (সঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ-এর খরচাদি নির্বাহ করা হতো। পরবর্তীকালে যিনিই উম্মতের কর্ণধার হয়েছেন, তাঁর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের ব্যয় নির্বাহ তাথেকে করা হতো।

কিন্তু মারওয়ান ঐ সব নিয়ম-নীতি লংঘন করে বসলেন এবং 'ফিদাক'কে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে নিলেন। অথচ হযরত আলী (রাঃ)ও এ ব্যাপারে ঐ একই নিয়ম বহাল রেখেছিলেন, যা সিদ্দীকী ও ফারুকী যুগে চালু হয়েছিল। তবে এটা ঠিক যে, হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর প্রতিনিধি অথবা উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত আলীও ঐ ফিদাকের সম্পত্তির দাবীদার ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নিজেই খলীফা হয়ে গেলেন, তখন তিনি ঐ সম্পত্তির সাবেক যে অবস্থান তাই বহাল রাখলেন।

এরপর আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটি অর্থাৎ হযরত আলীর (রাঃ) প্রতি আমীর মুয়াবিয়ার (রাঃ) গালি-ভর্ৎসনার কথা লক্ষ্য করুন। ইতিহাসের পুস্তক পুস্তিকায় এ নিন্দনীয় প্রথার বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত হয়ে আছে যে, আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এটাকে চালু করেছিলেন এবং পরিশেষে উমার ইবনে আব্দুল আযীয তা বাতিল করে দিয়েছিলেন। 'সিহাহ সিত্তাহ' এর কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে উল্লেখ রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিরমিযী শরীফ 'কিতাবুল মানাকিব' এর 'মানাকিবে আলী' পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত রিওয়ায়াত সংকলিত আছে ঃ

"কুতাইবা বলেছেন যে, তিনি হাতেম ইব্‌নে ইসমাঈল ইব্‌নে মেছমার থেকে, তিনি আমের ইব্‌নে সা'দ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস থেকে এবং তিনি তার পিতা সা'দ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস থেকে শুনেছেন যে, তাঁকে মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান আমীর নিযুক্ত করেন এবং তার পর বলেন, আবূ তুরাব (হযরত আলী রাঃ) কে গালি-গালাজ করতে কিসে তোমাকে বাধা দেয়? সা'দ উত্তর দিলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর

তিনটি বক্তব্য যখন আমি স্মরণ করি তখন আমার জন্য কখনো সম্ভব হয়না যে, আমি আলী (রাঃ) কে গালি দেই। এ উক্তিতে আলী (রাঃ) এর তিনটি সদগুণের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তার মধ্য হতে একটিও আমার ব্যাপারে করা হতো, তবে তা হতো আমার নিকট লাল বর্ণের উটগুলির চেয়েও বেশী প্রিয়।"

এরপর হযরত সা'দ (রাঃ) ঐ তিনটি বক্তব্য তুলে ধরেন। যার মধ্য থেকে একটি হলো যে, হযরত আলী (রাঃ) কে বলা হয়েছিল ঃ

"তোমার কি এটি পছন্দ নয় যে, তুমি আমার জন্য এমন হও, যেমন হারুন (আঃ) ছিলেন মূসা (আঃ) এর জন্য, তবে আমার পর কোনো নবুওয়াত থাকবেনা।"

দ্বিতীয় বক্তব্যে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন ঃ

"আলী (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে মহব্বত রাখেন। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলও আলী (রাঃ)-এর সাথে মহব্বত রাখেন।"

তৃতীয় বক্তব্যে হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতিমা এবং হুসাইন (রাঃ)কে উপলক্ষ করে হুযূর (সঃ) বলেন ঃ

"হে আল্লাহ! এরা আমার পরিবার-পরিজন।"

এ রিওয়ায়েতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করছে যে, আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে গালাগাল করার এক সাধারণ নিয়ম চালু করে রেখেছিলেন। এমনকি, যখন সা'দ ইবনে আবীওয়াক্কাস (রাঃ) ঐ নিয়ম অনুসরণ করতে অস্বীকার করলেন, তখন আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করলেন এবং এর কারণ দর্শানোর জন্য কৈফিয়ত তলব করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

কৈফিয়তের জবাব দিতে গিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর সম্মান ও মর্যাদা জ্ঞাপক ঐ হাদীস উদ্ধৃত করতে সা'দ বাধ্য হলেন, যা তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে শুনেছিলেন। এসব হাদীস বর্তমান থাকতে হযরত আলী (রাঃ)কে ভর্ৎসনা ও গালাগাল করা কোনোক্রমেই বৈধ ছিলনা। [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী, ১৯৬৯ ইং]

মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের খিলাফত

প্রশ্ন ঃ মাওলানা মওদূদী (রহঃ) রচিত কিতাব 'খিলাফত ও মুলূকিয়্যাত' নিয়ে বেশ হৈ চৈ শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনি এরই মধ্যে দিয়েও ফেলেছেন। কিন্তু এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত যে সকল বই মাহমুদ আহমদ আব্বাসী এবং তার ভাতিজা আলী আহমদ আব্বাসী লিখেছেন, তাজ্জবের ব্যাপার যে, সেগুলোর ভেতর আহলে সুন্নাতের চিন্তাধারা ও ধ্যান-ধারণা বিকৃত করা হয়েছে।

তার মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর তুলনায় আমীর মুয়াবিয়া এবং 'ইয়াযীদের ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে চাড়িয়ে বড় করে দেখান হয়েছে। কিন্তু কেউই এর প্রতিবাদ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি।

প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, বরঞ্চ ওগুলোর তথ্যসমূহ সংগ্রহ করে যে কোনো

ভাবেই হোক অন্যান্য লেখকগণ নিজেদের গ্রন্থাদিতে ও প্রবন্ধাদিতে স্থান দিয়ে তার মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এমনকি "সাইয়িদুনা মুয়াবিয়া ঃ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কীর্তি" বইটি সম্পর্কে তো আব্বাসী সাহেবকে এ অভিযোগ করতে হয়েছে যে, লেখক আমার ভাতিজার বই 'হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর রাজনৈতিক জীবন'কে সামনে রেখেই নিজের বই লিখেছেন। সামান্য রদবদল ছাড়া তার বিষয়বস্তুও একই এবং শিরোনামগুলোও একই দেখা যায়।

'হযরত মুয়াবিয়ার রাজনৈতিক জীবন' এবং 'মুয়াবিয়া ও ইয়াযিদের খিলাফত' বই দু'খানা সম্ভবতঃ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কিন্তু এগুলোরই কাছাকাছি আব্বাসী সাহেবের অন্য একটি গ্রন্থ 'অধিক বিশ্লেষণ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। যদি এ বইখানি আপনার দৃষ্টিতে না পড়ে থাকে, তাহলে আপনি এটিকেও দেখে নিবেন। এর মধ্যে দুশো' বাহাত্তর (২৭২) জন 'সাহাবী' এবং রসূল (সাঃ)-এর পাঁচজন স্ত্রী সম্পর্কে দাবী করা হয়েছে যে, তাঁদের মধ্যে কেউই ইয়াযীদের বিরোধী ছিলেন বলে প্রমাণ নেই। হয়তো বা এঁরা সবাই ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে নিয়োগের পুরা সমর্থক, সহযোগী ছিলেন। শুধুমাত্র ইমাম হুসাইন এবং হযরত ইবনে যুবাইর বিদ্রোহ করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হলো এই কি ঘটনার সঠিক চিত্র? আর এ দু'জনকে বাদ দিয়ে বাকী সকলেই ইয়াযীদের বাইয়াতে (আনুগত্যের শপথ) স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে যোগদান করেছিলেন?

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা জিজ্ঞাস্য থেকে যায়। 'খিলাফত ও মুলূকিয়্যাত' গ্রন্থে এবং অন্য সব ইতিহাসে সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর দলের লোক হিসেবে সিফফীন যুদ্ধে শরীক ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সৈন্যদের হাতে তিনি নিহত (শহীদ) হয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)কে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

'একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে'। বাস্তবে যখন দেখা গেল যে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর দল তাকে হত্যা করে, তখন এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর দল বিদ্রোহী দল ছিল। কিন্তু মাহমুদ আব্বাসী সিফফীন যুদ্ধে হযরত আম্মার (রাঃ)-এর অংশ গ্রহণ করার কথা অস্বীকার করেছেন। তিনি স্বীয় 'খিলাফত ও রাজতন্ত্রের হাকীকত' গ্রন্থের ১৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ সত্য কথা ওটাই যা তাবারী (রহঃ)-এর বর্ণনা হতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাবারী (রহঃ) বলেন যে, বিদ্রোহী উচ্ছৃংখল জনতা মদীনায় পৌঁছার পূর্বে আম্মার (রাঃ)কে মিশরেই হত্যা করেছিল। প্রকৃত ঘটনা কি ছিল, তার অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

উত্তর ঃ খারিজী সম্প্রদায় ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের কিয়দংশ ব্যতিরেকে সমগ্র মুসলিম জাতি এবং আহলে সুন্নাতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত ওলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে সর্বদা একমত রয়েছেন যে হযরত আলী (রাঃ) মুসলমানদের চতুর্থ এবং

সর্বশেষ 'খলীফায়ে রাশিদ' ছিলেন। নবী (সঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর মাধ্যমে খিলাফতে রাশিদা খতম হয়ে গিয়েছে। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)কে কতিপয় গবেষক সুস্পষ্টরূপে 'সুলতানে জাইর'। স্বৈরাচারী (বাদশাহ) এবং হযরত আলী (রাঃ) এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাঁকে বিদ্রোহী (বাগী) ও অপরাধী (খাতী) সাব্যস্ত করেছেন। এমন কি তার ওপর ফাসিক শব্দটিও প্রয়োগ করেছেন। অপর কিছু লোক হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর বিবাদ এবং যুদ্ধকে ইজতিহাদী ভুল (সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ভুল) বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতের উপস্থিতিতে আমীর মুয়াবিয়ার (রাঃ) খিলাফত তো প্রতিষ্ঠিত হতেই পারেনা। হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের পরও মুয়াবিয়ার খিলাফত কেবল ঐ সময় থেকে মেনে নেয়া হয়েছে, যখন হযরত হাসান (রাঃ) তার সাথে সন্ধি করেছিলেন এবং খিলাফত পরিচালনা থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, তখন থেকে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হলো বটে। কিন্তু তবুও তা খিলাফতে রাশিদার মর্যাদা লাভ করতে পারলোনা। যাহোক কোনো কারণ অবশ্যি ছিল বলেই তো সাহাবী হওয়ার গৌরবসহ একজন ফকীহ ও মুজতাহিদ হিসেবে তাঁকে স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে কিরাম তাঁকে কখনো খোলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে গণ্য করেননি বরং তাঁকে একজন বাদশাহ বলে অভিহিত করেছেন।

তাছাড়া স্বীয় খিলাফতকালে হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) নিজের ছেলে ইয়াযীদকে যুবরাজ মনোনীত করেছিলেন। এটি কেবলমাত্র স্থলাভিষিক্ত করার এক প্রস্তাব কিংবা পরামর্শ ছিলনা। বরঞ্চ এটি রীতিমত খিলাফতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে আগামী দিনের খলীফা করার পক্ষে পুরা ইসলামী রাষ্ট্রের সমগ্র ভূখন্ডের অধিবাসীবৃন্দের নিকট হতে গণস্বীকৃতি আদায় করার জোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আর এজন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রভাব এবং যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে উদ্দেশ্য হাসিল করা হয়েছিল।

এ উদ্যোগকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য বড় জোর এ কথা বলা হয়েছে যে, এটি নিছক পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ-ভালবাসার প্রতিফলন ছিলনা। বরঞ্চ মুসলমানদের কল্যাণ কামনার প্রেরণাই মুয়াবিয়া (রাঃ)কে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

কিন্তু 'রসূলুল্লাহ' (সঃ) অথবা 'খোলাফায়ে রাশিদীন' এর সুন্নাত তথা তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যে এ ধরনের কোনো নজীর কিংবা এর পক্ষে কোনো দলিলও নেই যে, মুসলমানদের আমীর বা খলীফা নিজের জীবদ্দশায় নিজের কোনো আত্মীয়-স্বজনকে গদ্দীনশীন নির্ধারিত করে গিয়েছেন এবং নিজের বাইয়াতের সাথে আরেকজনের বাইয়াতের বাধ্যবাধকতাও মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।

এভাবে তিনি গোটা উম্মাতকে আনুগত্যের আগাম শপথ গ্রহণের যে বাধ্যবাধকতায় ফেলে দেয়ার চেষ্টা করেছেন তা তখন পর্যন্ত নজীরবিহীন ব্যাপার ছিল।

অধিকন্তু একটি অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য কথা যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর

এ কাজের পর থেকে এমন এক চলন্ত ধারা (সুন্নাতে জারিয়া) এবং এক স্থায়ী রীতির রূপ পরিগ্রহ করে যে, খলীফা মাত্রই স্বীয় জীবদ্দশায় নিজের বংশের লোককে যুবরাজ নিযুক্ত করতে থাকেন এবং বাইয়াত নিতে থাকেন।

এ প্রথা চালু হওয়ার কারণে মুসলমানদের মধ্যে নির্বাচনী খিলাফত স্থায়ীভাবে খতম হয়ে গেল এবং রাজতন্ত্র অথবা স্বৈরতন্ত্র তার স্থান দখল করে নিল।

ইয়াযীদ সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আহলে সুন্নাতের আলেমগণ তার সপক্ষে কথা বলতে গিয়ে বড়জোর এতটুকু বলেছেন যে, "তাকে কাফির বলা এবং তাকে অভিশাপ দেয়া যাবেনা। তিনি একজন মুসলিম শাসনকর্তা ছিলেন। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় তার ফিস্‌ক ও ফুজুর (দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি) কারো জানা ছিলনা এবং তার ইঙ্গিতে ইমাম হুসাইন (রাঃ)কে কতল করা হয়নি। তবে এটাও ঠিক যে, হুসাইন (রাঃ) এর হত্যাকারীদের থেকে কৈফিয়ত চাওয়ারও তিনি প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি।" 'উলামায়ে আহলে সুন্নাত' ইয়াযীদের পক্ষে এর চেয়ে বেশী কিছু বলেননি।

'আহলে সুন্নাত' এর সর্বসম্মত ধ্যান-ধারণা এবং সর্বস্বীকৃত বর্ণনাবলীর সম্পূর্ণ বিপরীত ও একেবারেই উল্টো একটি নতুন অভিমত মাহমুদ আব্বাসী সাহেব ব্যক্ত করেছেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতে অধিষ্ঠানকে গোড়া থেকেই সংশয়পূর্ণ সাব্যস্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন। এটা তিনি এজন্যেই করেছেন যাতে তাঁর "খলীফায়ে রাশিদ" (ন্যায়পরায়ন রাষ্ট্রপ্রধান) হওয়া এবং তাঁর বিরোধীদের তুলনায় তাঁর সত্যপন্থী হওয়া অন্ততঃ সত্যের কাছাকাছি হওয়া সংশয়মুক্ত হয়ে পড়ে।

এরপর তার আলোচনা যখন ইয়াযীদ পর্যন্ত এসে গেল তখন তার এক চোখা নীতি ও ধৃষ্টতা একেবারে চরমে পৌঁছলো। তার মতে আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদের খিলাফতের ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বা ঐক্য হয়েছে, তেমন ঐক্য হযরত আবু বকর এবং উমরেরও ভাগ্যে জোটেনি।

তার নিজের কথায় শুনুন ঃ "সাহাবী ও তাবিয়ীগণ এবং হাশিমী ও উমাইয়া বংশীয় বড় বড় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ জনপ্রিয় যুবরাজ (ইয়াযীদ)-এর বাইয়াতে খিলাফত সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্যি, তার সিংহাসনে আরোহণের খবর শোনার সাথে সাথে খিলাফতের দাবীদার দু'জন- হযরত হুসাইন (রাঃ) এবং ইবনে যুবাইর কোনো এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী মদীনার গভর্ণরের চোখে ধূলি দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তাঁদের এ ধরনের কর্মধারা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, শুধুমাত্র মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা হচ্ছিল।" ('তাহকীকে মাযীদ' পৃষ্ঠা ২৩১)

হঠকারিতার চরম পরাকাষ্ঠা এই যে, ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর আত্মদান ও বীরত্বব্যঞ্জক অভিযানকে আব্বাসী সাহেব 'যুবরাজ ইয়াযীদ' এর খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক অভিযান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইবনে খালদুন ইয়াযীদ এবং তার যুবরাজ হিসেবে মনোনয়ন সম্পর্কে যদ্দুর সম্ভব সাফাই পেশ করা সত্ত্বেও যেহেতু তার দুষ্কর্মের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং

ইবনুল আরবীর এ কথাকে ভুল প্রমাণ করেছেন যে ইমাম হুসাইন (রাঃ)কে হত্যা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ছিল, কেননা তিনি ইয়াযীদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও খিলাফতের দাবীদার ছিলেন। এজন্য আব্বাসী সাহেব বলছেনঃ "ইবনে খালদুন হযরত হুসাইন (রাঃ) এর বিদ্রোহী অভিযান সম্বন্ধে যেখানে আলোচনা করেছেন, সেখানে তিনি তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট করার চেষ্টায় সফল হতে পারেননি। তিনি তার যুবরাজ হওয়ার বাইয়াতের ব্যাপারে যে আলোচনা করেছেন, তা খুবই ভাল হয়েছে।

ঐ আলোচনা 'মুয়াবিয়া ও ইয়াযীদের খিলাফত' কিতাবে হুবহু তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রশংসাও করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্রোহাত্মক অভিযানের সত্য ও বাস্তবভিত্তিক পর্যালোচনা করার সময় হুসাইন (রাঃ) এর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা তাকে পেয়ে বসেছিল এবং প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল।

ভক্তি ও ভালবাসা এক জিনিস এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর নিরপেক্ষ গবেষণা অন্য জিনিস।" ('তাহকীকে মাযীদ' পৃঃ ২৩২)

এই যে, 'গবেষণা অন্য জিনিস' এর বিরল নজীর আব্বাসী সাহেবের সাহিত্য ভাণ্ডারের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। খিলাফতের কেবলমাত্র দু'জন দাবীদার ব্যতীত সমগ্র মুসলিম উম্মত জনপ্রিয় যুবরাজের বাইয়াত যে কিরূপ আগ্রহের সাথে করেছিল তার প্রমাণ সংগ্রহ করার নিমিত্ত আব্বাসী সাহেব 'তাহকীকে মাযীদ' নামক পুস্তকে একটি পরিচ্ছেদ দাঁড় করেছেন যার শিরোনাম "রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীবৃন্দ,ইয়াযীদের অভিষেকের বাইয়াত ও খিলাফত"।

যুবরাজ হিসেবে ইয়াযীদের অভিষেকের সময় যে সমস্ত সাহাবী ও রসূল (সঃ)-এর যে সকল সহধর্মিনী জীবিত ছিলেন এবং লেখক যাদের অবস্থা অবহিত হতে পেরেছেন তাদের সকলের নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনী তিনি এই পরিচ্ছেদে শতাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে বর্ণনা করেছেন।

ভাবখানা এই যে, ঐসব সাহাবীর (রাঃ) জীবনে বেঁচে থাকাই এবং ইয়াযীদের বাইয়াতের আগে তাঁদের দুনিয়া থেকে বিদায় না নেয়াটাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ যে, তাঁরা পুরোপুরি সন্তুষ্টচিত্তে ও সাগ্রহে ছুটে গিয়ে ইয়াযীদের সত্যনিষ্ঠ হস্তে বাইয়াত করে নিয়েছিলেন!

আব্বাসী সাহেব শুধুমাত্র এঁদের নাম বর্ণনা করে ক্ষান্ত হননি বরঞ্চ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সহীহ হাদীসগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য এবং সংঘটিত ঘটনাবলীর বিবরণ বিকৃত করতেও কসূর করেননি। এ অপচেষ্টার একটি মাত্র নমুনা উপস্থিত করে দিচ্ছি, যা থেকে অনুমান করা যাবে যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনা করতে আব্বাসী সাহেব কিরূপ সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন? উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর জীবন ইতিহাস লিখতে গিয়ে তিনি বলেনঃ- "এ মুহতারমা মহিলা যুবরাজ হিসেবে ইয়াযীদের অভিষেক কালে জীবিত ছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)কে উপদেশ দেন যে, তিনি যেন ঐ বৈঠকে অবশ্যি যোগদান

করেন, যেখানে তাকে ডাকা হচ্ছে। এমনটি যেন না হয় যে, তাঁর যোগদান না করার কারণে মতবিরোধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়.....। এ ব্যাপারটি কোনো বিচার বৈঠক (সালিসী) ছিলনা। বরঞ্চ এটি ছিল যুবরাজ ইয়াযীদের অভিষেক বিষয়ক।

হযরত ইবনে উমর, যুবরাজ ইয়াযীদের অভিষেক এবং খিলাফত উভয়টিরই বাইয়াত নির্দ্বিধায় করেছিলেন। তাঁর এ কাজের মাধ্যমে তাঁর শ্রদ্ধেয় ভগিনীর অবস্থানই বা কি ছিল, তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।"

এরূপে বুখারী শরীফের বরাত দিয়ে বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে, বোন ও ভাই উভয়ই 'আমীরুল মুমিনীন' এর বাইয়াতের জন্য ভারি ব্যস্ত ও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। অপরাপর সব স্থানে সাধারণভাবে আব্বাসী সাহেব বই-পুস্তকের পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে থাকেন কিন্তু এখানে তিনি বুখারী শরীফের অধ্যায়, পরিচ্ছেদ অথবা পৃষ্ঠার বরাত দেননি।

সে যাই হোক এ হাদীসটি বুখারী শরীফের 'কিতাবুল মাগযী' 'বাবে গয্ওয়ায়ে খন্দক' থেকে গৃহীত হয়েছে। তার মতন (বচন) ও অনুবাদ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

عن ابن عمر قال دخلت على حفصة
ونسواتها تنطف، قلت قد كان من امر
الناس ما ترين فلم يجعل لى من الامر
شيئ فقالت الحق فانهم ينتظرونك
واخشى ان يكون فى احتباسك عنهم فرقة
فلم تفرق الناس خطب معاوية قال من
كان يريد ان يتكلم فى هذا الامر فليطلع
لنا قرنه ولنحن احق به منه ومن
ابيه قال حبيب بن مسلمة فهلا اجبته
قال عبد الله فحللت حبوتى وهممت ان
اقول احق بهذا الامر منك من قاتلك
واباك على الاسلام فخشيت ان اقول كلمة
تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل
عنى غير ذالك. فذكرت ما اعد الله فى

الـجـنـان- قـال حـبـيـب حُـفـظـتَ وعُـصـمـتَ -

হযরত ইবনে উমর (আব্দুল্লাহ) বলেছেনঃ আমি হযরত হাফসার (রাঃ) নিকট গেলাম। তিনি গোসল সেরেছেন। তাঁর মাথার চুল হতে তখনো পানি ঝরছিল। আমি তাঁকে বললাম, লোকদের কর্মকান্ড তো আপনি পর্যবেক্ষণ করছেনই। কিন্তু নেতৃত্বের ব্যাপারে আমার জন্য কিছু রাখা হয়নি এবং আমার কিছু করারও নেই। হযরত হাফ্সা (রাঃ) বললেন, তুমি ওখানে যাও। লোকেরা তোমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আমার আশংকা হচ্ছে, তুমি সেখানে না গেলে কলহ ও মতভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

মোটকথা হযরত হাফসা (রাঃ) যতক্ষণ না তার ভাই ঐ সমাবেশে গেলেন, ততক্ষণ তাকে পিড়াপিড়ি করে যাচ্ছিলেন। লোকেরা যখন চলে গেল, তখন আমীর মুয়াবিয়া বক্তৃতায় বললেন,এই নেতৃত্ব ও বাইয়াত সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে চাইলে সে যেন তার (মাথার) শিং একটু উঁচু করে। আমরা তার ও তার বাপের চেয়ে নেতৃত্বের বেশী হকদার।

হাবীব ইবনে মুসলিমা (ইবনে উমারকে) বললেন, আপনি তার কোনো উত্তর দিলেন না? ইবনে উমার বললেন ঃ আমি আমার চাদর নামিয়ে ফেলেছিলাম এবং আমীর মুয়াবিয়াকে বলতে চেয়েছিলাম ঃ হাঁ আপনাদের চেয়ে নেতৃত্বের বেশী হকদার ওঁরা, যারা আপনার ও আপনার আব্বার সাথে ইসলামের স্বার্থে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু আমার ভয় হলো যে, আমার কথা দ্বারা গন্ডগোল বেঁধে যাবে, রক্তপাতের পরিস্থিতির জন্ম নেবে এবং আমার কথা থেকে অন্য একটি অর্থ বের করা হবে। তাই আমি ঐ সব নিয়ামত স্মরণ করলাম যা আল্লাহ জান্নাতে তৈরী করে রেখেছেন (এবং নিরব রইলাম)। হাবীব ইবনে মুসলিমা বললেন, আপনি রক্ষা পেয়েছেন ও বেঁচে গিয়েছেন।

এখন এ রিওয়ায়াতের দৃষ্টিভঙ্গী ও বর্ণনাভঙ্গী লক্ষ্য করুন এবং আব্বাসী সাহেব এ থেকে যে তাৎপর্য বের করতে চেয়েছেন, তাও লক্ষ্য করুন।

যদিও এ কথা মেনেও নেয়া হয় যে, এখানে সালিসীর পরিবর্তে ইয়াযীদেরই যুবরাজ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তবুও এ কথোপকথনের ভাষা সুস্পষ্টরূপে বলে দেয় যে, যুবরাজ হওয়ার ব্যাপারকেই যেভাবে মীমাংসা করা হচ্ছিল তাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার সন্তুষ্ট হতে পারছিলেননা বরং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি স্বভাবতঃ বিবাদ-বিসংবাদ হতে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পছন্দ করছিলেন এবং তাঁর মহান পিতা হযরত ওমর (রাঃ) তাকে খিলাফতের প্রার্থী হতে বারণ করেছিলেন, সেহেতু তিনি ঐ সমাবেশে হাজির হতে পছন্দ করছিলেন না, যেখানে আমীর মুয়াবিয়ার ভাষণ দেয়ার প্রোগ্রাম ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত হাফসা (রাঃ) তাঁকে সেখানে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, কেননা সেখানে তাঁর অনুপস্থিতি অনুভূত

হচ্ছিল এবং হযরত হাফসা (রাঃ)-এর ধারণা ছিল যে, তিনি ওখানে গেলে কিছু না কিছু উপকার অবশ্যি হবে। গন্ডগোলটা থেমে যাবে। সে যাই হোক, আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ঐ সমাবেশে গেলেন।

এরপর আমীর মুয়াবিয়া ভাষণ দিলেন এবং ধমকের ভাষায় বললেন, 'যে ব্যক্তি আমার অথবা আমার ছেলের বিরুদ্ধে মুখ খোলার দুঃসাহস করবে, সে এখানে একটু মাথা উঁচু করে কিছু বলুক তো দেখি। আমি তার চেয়ে ও তার বাপের চেয়ে খিলাফতের বেশী অধিকারী।' মুহাদ্দিসীনের বর্ণনা অনুযায়ী এখানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, হযরত হুসাইন ইবনে আলী এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে কটুক্তি ও কটাক্ষ হচ্ছিল এবং তাদের ওপর স্বীয় প্রাধান্য ফলানোই উদ্দেশ্য ছিল, যা ইবনে উমারের ন্যায় ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু এবং আপোষকামী মহান ব্যক্তিও বড় কষ্টের সাথে বরদাশত করতে পারছিলেন। এ জন্যেই তো তাঁর মনে চাচ্ছিল যে, তিনি মুখের উপর বলে দিবেন যে, 'জনাব! আপনার চেয়ে খিলাফতের অধিক উপযুক্ত তো তাঁরাই যারা আপনার এবং আপনার পিতা আবু সুফিয়ান-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, যখন আপনারা দু'জনই কুফরী পরিবেশে আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ঐ কথাগুলি বলবেন বলে ভেবেছিলেন কিন্তু তাঁর তা আর বলা হলোনা, কেননা তিনি মারাত্মক ভুল বুঝাবুঝির আশংকা করলেন যে, আমার একথাটিকে আমার খিলাফত লাভের অভিলাষ বলে চিহ্নিত করা হবে এবং যারা অস্ত্রবলে এ সমস্যার সমাধান চায়, তারা উত্তেজিত হয়ে আরো রক্তারক্তি সৃষ্টি করে বসবে।

এতো গেল হযরত ইবনে উমারের (রাঃ) ঘটনা। এরই কাছাকাছি আরেকটি ঘটনা বুখারী শরীফের তাফসীরুল আহকাফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) মারওয়ানকে মদীনার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি এক বক্তৃতায় ইয়াযীদের যুবরাজ মনোনয়নের কথা আরম্ভ করলে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) তার প্রতিবাদ করেন।

মারওয়ান তৎক্ষণাৎ বলতে লাগলেন, 'ধর একে'। আবদুর রহমান (রাঃ) পালিয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে আশ্রয় নিলেন।মারওয়ান সেখানেও তাকে ধাওয়া করে নিয়ে গেলেন এবং হযরত আশেয়া (রাঃ)-এর সাথেও কটুভাষা প্রয়োগ করেন।

একথা অবশ্যি সঠিক যে, হযরত আলী (রাঃ) থেকে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগ পর্যন্ত যতগুলি যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে তা থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) দূরে অবস্থান করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) পর থেকে যিনিই খিলাফতের মসনদ দখল করেছেন, তার শাসন ব্যবস্থাকে যেরূপ অন্যান্য মুসলমানেরা স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক মেনে নিয়েছেন; তিনিও তা মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু একথা বলা প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সত্যের অপলাপ হবে যে, হযরত ইবনে উমার অথবা অপরাপর বড় বড় সাহাবী এবং তাবেয়ী সন্তুষ্টচিত্তে এ সমস্ত ক্ষমতা জবর দখলকারীদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

হাফিজ ইবনে হাজর 'ফতহুলবারী' গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, হযরত ইবনে উমারের রায় ছিল এই ঃ

উত্তম ব্যক্তি থাকতে অপেক্ষাকৃত মন্দ ব্যক্তির বাইয়াত করা জায়েয নয়, তবে ফিতনার আশংকা দেখা দিলে সে আলাদা কথা। এজন্যই ইবনে উমার (রাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) পর হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর এবং অতঃপর তার ছেলে ইয়াযীদের বাইয়াত করেছিলেন। নিজের সন্তানদেরকে তার বাইয়াত ছিন্ন করতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর তিনি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানেরও বাইয়াত করেছিলেন।

মাহমূদ আব্বাসীর ন্যায় লোকেরা, যারা প্রত্যেক 'আমীরুল মুমিনীন'-এর সম্মুখে মাটিতে নাক ও কপাল বিছিয়ে দিতে সদা প্রস্তুত ও সদা তৎপর থাকেন, তারা ঐসব পূর্ববর্তী পূণ্যবান লোকদেরকে (যারা সলফে সালিহীন বলে খ্যাত) নিজেদের মতই মনে করেন।

আব্বাসী সাহেবের মানসিক অবস্থার প্রতিফলন তার নিচের লেখার মধ্যে লক্ষ্য করা যেতে পারে ঃ

"উম্মাতে মুসলিমা যদি হযরত উসমানের আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য রক্তপাত না ঘটানো হতে শিক্ষা গ্রহণ করতো, তাহলে খিলাফত লাভের জন্য পরিচালিত রক্তপাতে ইসলামী রাষ্ট্রের চেহারা এত বিকৃত হতোনা, যার কিছু নমুনা ক্রমাগত বিদ্রোহী অভিযানের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়।

ইসলামের ইতিহাসে সম্ভবতঃ এটি একটি অনুকরণীয় উদাহরণ যে, বিনা রক্তপাতে উম্মাতের কল্যাণের স্বার্থে রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়া। আর সেটি (পাকিস্তানের) ফিল্ড মার্শাল আইউব খান ও তার সাথীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।

আল্লাহ তায়ালা ঐসব মহান ব্যক্তিদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, যাদের মাধ্যমে যে কোনোভাবেই হোক হযরত উসমানের আদর্শ কার্যকর হতে পেরেছে।" (তাহ্‌কীকে মাযীদ পৃষ্ঠা ২৩৮)

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, যে গবেষক (মুহাক্কিক)-এর দৃষ্টিতে সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে কেবলমাত্র একটি অনুকরণীয় উদাহরণই ধরা পড়ে। তার কাছে যদি ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর মহান মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান প্রচ্ছন্নই থেকে যায় এবং ইয়াযীদ 'সর্বজনপ্রিয় আমীরুল মুমিনীন বলে প্রতীয়মান হয়- তাতে অবাক হবার কিছু থাকা উচিত নয়-

'বাদুড় যদি দিনের বেলায় সূর্যের আলো দেখতে না পায় তাতে কি সূর্যের উপর দোষ বর্তায়?'

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীরের (রাঃ) সিফ্‌ফীন যুদ্ধে হযরত আলীর (রাঃ) সাথী হিসাবে যুদ্ধে গমন করা এবং আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সৈন্যদের হাতে শহীদ হওয়া এমন একটি নিশ্চিত প্রামাণ্য ঘটনা, যা শুধু ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং

হাদীস গ্রন্থসমূহেও স্থান পেয়েছে।

সমস্ত ঐতিহাসিক এবং হাদীসবিদ একে সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। এমন কি, মুসনাদে আহমদ ও অন্যান্য কিতাবসমূহে নির্ভরযোগ্য সনদসমূহ ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)কে হযরত আম্মার (রাঃ)-এর শাহাদতের সংবাদ দেয়ার সময় 'একদল বিদ্রোহী তোমাকে হত্যা করবে' সম্বলিত হাদীসটি শুনান হলো। কোনো কোনো রিওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) এ ধরনের অভিনব জবাবও উল্লিখিত হয়েছে যে, আমরা তো তাঁকে হত্যা করিনি, বরং আলীই তাঁর হত্যার মূল কারণ, যে তাঁকে সাথে নিয়ে এসেছিল।"

মাহমূদ আব্বাসী সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি এ ঘটনা অস্বীকার করেছেন এবং এ কথা লিখিতভাবে পেশও করেছেন যে, আম্মার (রাঃ)কে দু'বছর পূর্বে মিশরে খুন করা হয়েছিল।

আল্লামা ইবনে জরীর তাবারীর (রহঃ) একটি কথা থেকে এই মিথ্যা রটনা সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, হযরত উসমান (রাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)কে মিশরবাসীদের অভিযোগমূহ তদন্ত করার জন্য মিশরে পাঠিয়েছিলেন। মিশরবাসীরা তাঁকে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন যে, তাঁকে প্রতারিত করে খুন করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছিল।

এমনিতেই আব্বাসী সাহেব তাবারী (রহঃ)কে রাফিজী বলে আখ্যায়িত করে থাকে, কিন্তু উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তার নিকট শিয়া, খৃষ্টান, ইহুদী অথবা নাস্তিক-সকলেই নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হয়ে যায়।

যখন কারো কথার দ্বারা আব্বাসী সাহেবের উদ্দেশ্য হাসিল না হয়, তখন তিনি ঐ কথাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেটে ছেটে স্বীয় অভিনব গবেষণার সমর্থনে তুলে ধরতে খুবই সিদ্ধ হস্ত।

তাবারীর (রাঃ) মূল বচন দেখুন ঃ

واستبطأ الناس عمارًا حتى ظنوا انه اغتيل

আর যায় কোথায়, লোকদের এ ধারণাকে পুঁজি বানিয়ে মিথ্যার পাহাড় গড়ে তোলা হলো যে, আম্মার (রাঃ)কে মিশরেই হত্যা করা হয়েছিল।

আব্বাসী সাহেব 'সাইয়িদুনা মুয়াবিয়াঃ ব্যক্তিত্ব ও কর্ম, পুস্তকের প্রণেতা সম্পর্কে এ অভিযোগ করেছেন যে, তিনি তার (আব্বাসী) ভাতিজার কিতাবের সমস্ত সত্য নিজের পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছেন অথচ তিনি এসবের কোনো উৎসের নাম অথবা কারো অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আমার নিকট এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তার বর্ণনা মুতাবিক হাকীম মুহাম্মদ আহমদ জাফর করাচীতে তার সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। তিনি (হাকীম সাহেব) তার কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকেন।

তিনি আব্বাসী সাহেব ও তার ভাতিজার কিতাব থেকে তথ্যাবলী **নেয়ার অনুমতি** প্রার্থনা করেন এবং এ অনুমতি উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে দেয়া **হয়েছিল, কেননা,** আব্বাসী সাহেবের কথামতে তার উদ্দেশ্যে হলো 'আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেয়া'।

অতঃপর মূল কিতাব বাজেয়াপ্ত হওয়ার কারণে হাকীম মাহমুদ **আহমদ ঐ** কিতাবগুলির বিষয়সমূহ নাম ও পরিচয় বাদ দিয়ে নিজেরই নামে ছাপিয়ে দেন। **কেননা** তিনি ভেবেছিলেন যে, এই লেখা চুরির কথা কেউ জানতে পারবে না। **যাই হোক,** হাকীম সাহেবের উদ্দেশ্য তো আব্বাসী সাহেবের পরিচালিত আন্দোলনকেই **এগিয়ে** নেয়া। [তরজমানুল কুরআন মে-১৯৬৯ ইং]

খিলাফত ও রাজতন্ত্র এবং ব্রেলবী চিন্তাধারা

প্রশ্ন ঃ আমি 'খিলাফত ও মুলূকিয়্যাত' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছি এবং এ পর্যায়ে আপনি যেসব বিষয় 'তরজমানুল কুরআনে' লিখেছেন, তাও পড়েছি। ঐ সমস্ত ব্যাপারে আমার কোনো বিশেষ মতভেদ নেই। কিন্তু তার মধ্যে আমি একটি জিনিসের অভাব অনুভব করছি। তা হলো, আপনি দেওবন্দী আলিমদের অনেক উদ্ধৃতি আপনার প্রবন্ধের ভেতর স্থান দিয়েছেন, কিন্তু কোনো ব্রেলবী আলিমের একটি কথাও কোনো স্থানে আনেননি, অন্ততঃ আমার নজরে পড়েনি। অথচ দেশের অধিকাংশ লোকই এ মতের অনুসারী। তাহলে আমার এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি সঠিক হবে যে, ব্রেলবী আলিমদের চিন্তাধারার প্রতি আপনার দৃষ্টি পড়েনি কিংবা তাঁদের লেখায় আপনি আপনার সমর্থনে কিছুই দেখতে পাননি?

এতে সন্দেহ নেই যে, মাহমূদ আহমদ আব্বাসীর মত লোকদের সুরে সুরমিলিয়ে এখন আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কিরাম পর্যন্ত হযরত আলীর (রাঃ) তুলনায় আমীর মুয়াবিয়া এবং ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর তুলনায় ইয়াযীদের অবস্থান এমনভাবে উপস্থাপন করছেন, যাতে হযরত আলীর (রাঃ) এবং ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ও সত্যাশ্রয়ী হওয়ার পরিবর্তে সন্দেহ ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চলেছে।

যদি আপনার দৃষ্টিতে কোনো রচনা বা বক্তব্য এমন থাকে, যা এ বিষয়ে ব্রেলবী চিন্তাধারার আলিমদের অবস্থান বিশ্লেষণে সাহায্য করে, তা হলে তাও জনসাধারণের সামনে পেশ করা দরকার আছে।

প্রকৃত কথা হচ্ছে এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলছে। মানুষের মন-মগজে এমন একটা জট পাকিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, খলীফায়ে রাশিদও সত্যনিষ্ঠ এবং তার বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধকারীও সত্যনিষ্ঠ। এমন কি ধীরে ধীরে এ পর্যন্ত বলা শুরু হয়েছে যে, খোলাফায়ে রাশিদীন এবং রাজতন্ত্রের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। 'খোলাফায়ে রাশিদীন'-এর নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা অথবা 'খিলাফতে রাশিদা'-এর নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ নেই।

উত্তর ঃ একথা সত্য যে, 'খিলাফত ও রাজতন্ত্র এবং হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)

সম্পর্কে যে আলোচনা আমি তরজমানুল কুরআনের পৃষ্ঠাসমূহে করেছি, তার ভেতর আমি ব্রেলবী উলামায়ে কেরামের লেখা হতে কোনো উদ্ধৃতি দেইনি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে আমার কোনো পক্ষপাতিত্ব বা বিদ্বেষ আছে এবং বিশেষ কোন গোষ্ঠী বা দলের পুস্তক-পুস্তিকা পড়াশুনা করতে আমার কোনো অনীহা আছে।

এর অর্থ এও নয় যে, আধুনিক যুগের আলিমদের মধ্যে শুধু দেওবন্দী অথবা আহলে হাদীস উলামায়ে কিরামের প্রবন্ধাদিতে আমার বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়, আর ব্রেলবী চিন্তাধারার উলামায়ে কেরামের গবেষণালব্ধ ভান্ডারে আমি এমন কোনো জিনিস পাইনা।

আসল কথা হলো, আমি বিষয় বিন্যাসে যে আলোচনা ও দলিল উপস্থাপনার পন্থা অবলম্বন করেছি, তা হলো, আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে সর্বাগ্রে কুরআন ও হাদীসের মূল বচনের আলোকে ঐসব অভিযোগ ও সমালোচনার পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি, যেগুলি মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর সাহিত্যকর্ম থেকে বের করা হয়েছে।

এরপর আমি পূর্ববর্তী ইমামগণ, যাদের মধ্যে মুহাদ্দিসীন (হাদীসবিদগণ), মুফাসসিরীন (তাফসীরকারগণ), ইতিহাস বেত্তাগণ এবং গবেষণাকারী ফকীহগণও অন্তর্ভুক্ত, তাদের এমন সকল কথা ও বক্তব্য তুলে ধরেছি, যেগুলো সংশ্লিষ্ট বিষয় ও ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত।

তারপর সর্বশেষে আমি কতিপয় আধুনিক আলিমের অভিমত উদ্ধৃত করেছি, যাতে কোনো ব্যক্তি এটা বলতে না পারে যে, যে কথা প্রাচীনকালে জায়েয ও হালাল ছিল সে কথার পুনরাবৃত্তি করা এ যুগে হারাম ও নিষিদ্ধ এবং এমন কাজ শুধু একজনই করেছেন।

কেবলমাত্র এ চিন্তা-ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বর্তমান কালের উলামায়ে কিরামের কিছু কথা তুলে দিয়েছি, অন্যথায় তাদেরকে বাদ দিলেও আমার বক্তব্যের প্রমাণ উপস্থাপনে কোনো শূন্যতা অথবা ত্রুটি দেখা দিতনা।

তবে হাঁ, এ প্রশ্ন থেকে যায় যে, দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের লেখার ভেতরই আমার দৃষ্টি কেন সীমাবদ্ধ রয়ে গেল?

তার একমাত্র কারণ এই যে, ঐ সময় পর্যন্ত 'খিলাফত ও মুলূকিয়্যাত' এর বিরুদ্ধে সবচে' বেশী সোচ্চার ছিলেন এ গ্রুপের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তারাই ইয়াযীদের পক্ষাবলম্বনের নতুন নিশান-বরদারদেরকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পূর্ণ উৎসাহ যুগিয়েছেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমার বক্তব্যের লক্ষ্য যেহেতু ঐসব সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি নিবদ্ধ ছিল, সেহেতু তাদের গ্রুপের কিছু উঁচুদরের ব্যক্তির উদ্ধৃতি দেয়া আমি সমীচীন ও যথেষ্ট মনে করেছি।

কিন্তু হযরত আলীর (রাঃ) তুলনায় আমীর মুয়াবিয়া (রা)-এর অবস্থান, যা 'খিলাফত ও মুলূকিয়্যাতে' বর্ণনা হয়েছে এবং যার অধিকতর বিশ্লেষণ আমার প্রবন্ধাদিতে প্রকাশিত হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি দিলে ব্রেলবী উলামায়ের কিরামের চিন্তা-ধারা ও মতামতের মধ্যে কোনো পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় না।

উদাহরণস্বরূপ আমি মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী রিজভী সাহেবের কিতাব 'বাহারে শরীয়াত'-এর প্রথম খন্ডের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি। মাওলানা আমজাদ আলী সাহেব মাওলানা আহমদ রিজাখান সাহেব মরহূমের সুযোগ্য শাগরেদ। 'বাহারে শরীয়াত' তাঁর বৃহত্তম একটি সংকলন, যা সতের জিলদে বিভক্ত। সংকলকের উস্তাদের অভিমতও প্রশংসাপত্রসহ তা প্রকাশিত হয়েছে। এ কিতাবের প্রথম খন্ডে ৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন ঃ

"আকীদা ঃ আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি যে মুজতাহিদ ছিলেন, তা সাইয়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফে বর্ণনা করেছেন। মুজতাহিদ থেকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ দুই-ই প্রকাশ পেতে পারে। অশুদ্ধ বা ভুল দু'প্রকার। এক, খাতায়ে ইনাদী অর্থাৎ প্রবৃত্তিতাড়িত ভুল। এটি মুজতাহিদের জন্য অশোভনীয়। দুই, খাতায়ে ইজতিহাদী অর্থাৎ সদিচ্ছা প্রণোদিত ভুল। এই যে 'খাতায়ে ইজতিহাদী, মুজতাহিদের পক্ষ হতে এটি প্রকাশ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ ধরনের ভুলের জন্য আল্লাহ তাকে আদৌও পাকড়াও করবেননা। কিন্তু আমাদের বিচারে পার্থিব বিধান রচনায় এটিকে দুভাগে ভাগ করতে পারি। একটি "খাতায়ে মুকাররর' যাতে ভুল সিদ্ধান্তকারীর বিরুদ্ধে বেশী কিছু বলার থাকেনা।

এটি ঐ খাতায়ে ইজতিহাদী যদ্দরুন দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়না। যেমন, আমাদের দৃষ্টিতে ইমামের পেছনে মুকতাদীর সুরা ফাতিহা পাঠ করা।

দ্বিতীয়টি 'খাতায়ে মুনকার' এটি ঐ 'খাতায়ে ইজতিহাদী' যাতে খাতাকারীকে বলতেই হয় যে, এ ভুলটি ফিৎনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হযরত সাইয়িদুনা আমীরুল মুমিনীন আলী মুর্তজা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর কর্মতৎপরতা এই প্রকার ভুল ছিল। এর মীমাংসা রাসূল্লাহ (সঃ) খোদ করে গিয়েছেন। হযরত (সাঃ) বলেছেন, আলী (রাঃ)-এর পদক্ষেপ সঠিক এবং আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর জন্য মাগফিরাত।" -(বাহারে শরীয়াত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৫ঃ প্রকাশক-শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স, লাহোর)।

এখন দেখুন, ইনি সাফ বলে দিলেন যে, আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) মুজতাহিদ ছিলেন এবং মুজতাহিদ নির্ভুলও হতে পারেন আবার ভুলও করতে পারেন-উভয়ই তার পক্ষে সম্ভব। এটাও ঠিক যে, পার্থিব বিধি-বিধানের নিরিখে ইজতিহাদী ভুলের দু'রকমই 'মুকাররর' ও 'মুনকার'-তার থেকে প্রকাশিত হতে পারে। অথচ এ ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ধরপাকড়ের প্রশ্ন নেই; কিন্তু দুনিয়ার আইন ও পরিণামের বিচারে 'খাতায়ে মুনকার' এমন যে, তাতে ফিতনার জন্ম দেয় এবং এ কারণে তার প্রতি অসম্মতি, আপত্তি এবং অসন্তোষের প্রকাশও ঘটতে বাধ্য। হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) যা কিছু করেছেন, তা সবই 'খাতায়ে মুনকার'এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। দু'পক্ষের দ্বন্দ্বের মীমাংসা এই যে, রায় হযরত আলী (রাঃ) এর পক্ষেই যাবে এবং আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষে শুধু মাগফিরাতের দুয়াই করা হবে।

ইয়াযীদের ফযীলত ও মর্যাদা যেহেতু বর্তমানে প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হচ্ছে এবং এ কথাও বলা শুরু হয়ে গেছে যে, তার দুর্নীতি ও দুষ্কৃতি শুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হচ্ছে না। এজন্য আমার নিকট ভাল মনে হচ্ছে যে, ঐ কিতাবের অন্য একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করে দিই যার মধ্যে ইয়াযীদ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠা ৭৬-এ মাওলানা মরহুম আমজাদ আলী সাহেব লিখছেন ঃ

"আকীদা ঃ ইয়াযীদ ছিল নোংরা চরিত্রের লোক, সে ছিল ফাসিক, ফাজির ও কবীরা গোণাহে লিপ্ত ব্যক্তি। তার সাথে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্নেহাস্পদ দৌহিত্র সাইয়িদুনা ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর কি তুলনা? আজকাল কিছু গোমরাহ ব্যক্তি বলে বেড়াচ্ছেন তাঁদের সম্পর্কে কীই-বা বলতে পারি! আমাদের নিকট তিনিও শাহজাদা এবং উনিও শাহজাদা। এমন অদ্ভুত ও বাজে কথা যে বলে, সে ধিকৃত খারিজী ও নাসিবী (গোমরাহ ফিরকা) সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হবে এবং সে জাহান্নামের উপযুক্ত। তবে ইয়াযীদকে কাফির বলা এবং তাকে অভিশাপ দেয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কিরামের তিনটি মত দেখা যায়। আমাদের ইমামে আযম (রঃ) এর মত হচ্ছে 'নীরবতা' অর্থাৎ আমরা তাকে ফাসিক-ফাজির ব্যতীত, না কাফির' বলবো, না 'মুমিন' বলবো।"

উপরোক্ত লেখার ভাষায় যদিও অস্বাভাবিক কঠোরতা পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু অপরদিকে আজকাল যেহেতু ইয়াযীদকে বড়ই যোগ্য প্রতিনিধি, বড়ই নেককার এবং সৎ সমাজ সেবী প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে, এ জন্য ব্রেলবী চিন্তাধারার এক জবরদস্ত আলিমের উপরোক্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিল। উদ্দেশ্য এই যে, অন্ততঃ এ দলটি যেন নব্য নাসিবিয়্যাত তথা ইয়াযীদবাদের ফিতনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

শেষ কথা, যেদিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী মনে করছি, তা হলো ব্রেলবী, দেওবন্দী, আহলে হাদীস-যারাই হোন না কেন, সকলেই ঐসব মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং আকীদা শাস্ত্রবিদগণকে নেতৃস্থানীয় সুন্নী উলামায়ে কিরাম বলে মান্য করেন, যাদের কথাবার্তা 'খিলাফত ও মুলুকিয়্যাতে' এবং আমার রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। আমাদের বুঝে আসছেনা যে, ইবনে হাজর আস্কালানী, ইবনে হাজর মাক্কী, ইমাম নববী, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, শাহওয়ালী উল্লাহ এবং শাহ আবদুল আযীয রাহিমাহুমুল্লাহ এসব মহান ব্যক্তিদের কথা দেওবন্দী, ব্রেলবী অথবা আহলে হাদীস উলামায়ে কিরামের নিকট কেন সমভাবে গুরুত্ববহ হবেনা? যদি ধরে নিই যে, কোনো একটি কথায় তাদের মতভেদ রয়েছে তবুও মতভেদকারীগণের জন্য এটি কিরূপে সঙ্গত হতে পারে যে, তারা ঐ কথার বক্তাকে আহলে সুন্নাতের দল থেকে খারিজ করার চেষ্টা করবেন? [তরজমানুল কুরআন-অক্টোবর-১৯৭০ ইং]

আদম (আঃ) এবং ইবলীসের কাহিনী সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ জাল্লাশানুহু কুরআনে করীমে ঘটনাবলী

বর্ণনাকালে সংক্ষিপ্তকরণের নীতি অবলম্বন করে থাকেন। অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে তিনি বিরত থাকেন।

তাই বিনা কারণে কুরআন হতে বিস্তারিত বিবরণ লাভ করা এবং চুলচেরা বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু অধ্যয়ন ও তিলাওয়াতকালে আকস্মিক ও তাৎক্ষণিকভাবে যদি কোনো খট্‌কা মন-মগজে সৃষ্টি হয়, তবে যতক্ষণ না সেই খটকা দূর হয়, ততক্ষণ অস্বস্তি অনুভূত হতেই থাকে।

এ ধরনের একটি খটকা মহান আল্লাহ এবং ইবলীসের কথোপকথনের মধ্যে দেখা দিয়েছে, যা সূরা আ'রাফ-আয়াত-১২ থেকে ১৭, সূরা হুজুরাত-আয়াত-৩৩ থেকে ৪৩ এবং সূরা সাদ আয়াত ৭৫ থেকে ৮৫তে পাওয়া যায়।

এর বিষয়বস্তু এক,কিন্তু শব্দ ভাষা ভিন্ন। সারকথা এই যে, ইবলীসের নাফরমানির কারণে মহান আল্লাহ তাকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং বিচার দিবস পর্যন্ত তার ওপর অভিশাপ দিলেন। ইবলীস হাশরের দিন পর্যন্ত অবকাশ চাইলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর ইবলীস আল্লাহকে রব বলে ডাকলো এবং আল্লাহ তায়ালার সম্মানের কসম খেয়ে বললো আমি হাশরের দিন পর্যন্ত এ সকল (মানুষ)কে (অধিকাংশকে) পথভ্রষ্ট করবো। এ কথোপকথন হতে যেসব প্রশ্ন জন্মে তা নিম্নরূপ ঃ

এক, আদম (আঃ) কে সিজদা না করার পর শয়তান অবকাশ পেয়ে গেল। তাকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করা হলোনা। পরবর্তী ঘটনা থেকে তা-ই প্রমাণিত হয় যে, সে হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতে থাকা অবস্থায় ধোঁকা দেয়ায় সফল হয়েছিল। কিন্তু সূরা আ'রাফে আছে যে, শয়তানকে অবকাশ দেয়ার পর আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয়বার নির্দেশ দিলেন ঃ "অপদস্থ ও ধিকৃত অবস্থায় এখান থেকে বের হয়ে যা।" প্রশ্ন হলো, সময়-সুযোগ দেয়া এবং বের হবার আদেশ দেয়া পরস্পর বিরোধী নয় কি?

দুই, এ কথোপকথনের সময় তো শুধু হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। অথচ ইবলীস বলছে ঃ 'আমি তাদেরকে গোমরাহ করে ছাড়ব।'

তাহলে কি ঐ সময়ে আরো মানুষও পয়দা হয়েছিল? অথবা খোদায়ী ইচ্ছার পূর্বেই ইবলীসের জ্ঞান ছিল যে, উভয় স্বামী-স্ত্রী প্রতারিত হওয়ার পর জান্নাত থেকে বহিষ্কার হবে এবং পৃথিবীতে পুনরায় তাদের অনেক সন্তান-সন্তুতি জন্মাবে যাদেরকে গোমরাহ করে দেয়া হবে।

তিন, ইবলীস ব্যক্তিগতভাবে আজকের বহু মানুষ থেকে উত্তম নয় কি? কেননা সে প্রথমতঃ একত্ববাদী এবং সবচে' বড় গোনাহ শিরক হতে দূরে অবস্থানকারী। দ্বিতীয়তঃ সে অবিশ্বাসী নাস্তিক নয়। সে তো আল্লাহ তায়ালাকে রব বলে ডাকতো এবং তাঁর সম্মানের শপথ করেছিল। তৃতীয়তঃ সে হাশরের দিন এবং বিচার দিবসের প্রতিও দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো। চতুর্থতঃ সে কেবল মাত্র মানুষেরই দুশমন এবং আল্লাহ তায়ালার দুশমন নয়।

চার, প্রশ্ন হলো মানুষ যত ভুল ও মিথ্যা ধ্যান-ধারণা পোষণ করে এবং যত

গোনাহের কাজ করতে থাকে, তা কি শুধু শয়তানের প্ররোচণায়ই করে থাকে? নাকি নিজের ইচ্ছায়? যদি সে নিজের ইচ্ছায়ই করে থাকে, তবে শয়তান নির্দোষ। আর যদি শয়তানের প্ররোচণায়ই করে থাকে, তবে তো মানুষ নির্দোষ।

উত্তরঃ আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর নিম্নে দেয়া হলো ঃ

এক, আপনার এ ধারণা ঠিক নয় যে, আদম (আঃ)কে সিজদা না করার পর শয়তানকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করা হয়নি। জান্নাত থেকে তার বহিষ্কার যেমন আপনি লিখেছেন সূরা আ'রাফে উল্লেখ আছে।

সম্ভবতঃ আপনার মনে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এ কারণে যে, যখন তাকে জান্নাত হতে বহিষ্কার করা হলো এবং আদম (আঃ) জান্নাতেই রয়ে গেলেন, তখন তাঁকে প্রতারিত করার সুযোগ সে কি রূপে পেয়ে গেল? এর উত্তর এই যে, প্ররোচণা ও প্রতারণার জন্য ইবলীসের জান্নাতের ভেতর যাওয়া জরুরী নয়। আল্লাহ তায়ালা তাকে উদ্বুদ্ধ ও প্রলুব্ধ করার যে ক্ষমতা ও সুযোগ দিয়েছেন, তা দ্বারা সে যেখানেই থাকুক না কেন, মানুষের অন্তরে অসওয়াসা, কুমন্ত্রণা দান এবং নাফরমানির কাজে উস্কে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এ জন্য সে জান্নাতের বাইরে থেকেও হযরত আদম (আঃ)-এর মনমগজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অবকাশ দান এবং বহিষ্কার করণের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মূল কথা হলো সে জান্নাতে অবস্থান করার সুযোগ হারাল কিন্তু মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা তার হাতে থেকে গেল।

দুই, আদম (আঃ) এর সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এর সুস্পষ্ট অর্থ ছিল আদম (আঃ) এবং তার বংশধরকে এই মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হচ্ছিল। এজন্যে ফেরেশতাগণ উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল যে, মানব জাতি গোলযোগ ও রক্তপাত ঘটাবে। শয়তানের এ জ্ঞান থাকা জরুরী নয় যে, আদম (আঃ) তার ধোঁকায় পড়বে এবং জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবে। কিন্তু এ কথা তো সে জানতো যে, স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে বংশপরম্পরা ও সন্তান-সন্ততির ধারা চালু হয়ে যাবে।

তিন, কোনো মানুষের মুখ বা কলম দ্বারা ইবলীসকে একত্ববাদী এবং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী বলা বড় সাংঘাতিক কথা। আপনি চিন্তা করে দেখুন, ইবলীস আল্লাহর আদেশ পালন করাকে সাফ অস্বীকার করেছিল। সে আল্লাহর সামনেই নিজের বড়ত্ব জাহির করলো। আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন নাফরমানি করলে? তখন সে উত্তর দিল, আমি তার থেকে উত্তম, যাকে সিজদা করতে তুমি হুকুম দিয়েছ। আচ্ছা, এর নাম কি তাওহীদ?

এতো আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করা, আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া তথা খোদায়ী দাবী করার সমার্থক।

এক ব্যক্তি আল্লাহর ইজ্জতের শপথ নিয়ে যদি বলে আমি তাঁর কথা মানবনা, আর কাউকে মানতে দেবনা, তবে শুধু তার এ শপথ করার কারণে তার অপরাধ হালকা হতে পারে কি? বরঞ্চ এতে তার স্পর্ধা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার প্রমাণ পাকাপোক্ত হবে।

ইবলীসকে আল্লাহর দুশমন না বলে শুধু মানুষের দুশমন বলা এক আজব কথা। জানি না, আপনার কাছে দুশমনের অর্থ কি? আল্লাহ তো সব নাফরমানকে তার শত্রু বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদেরকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যে ইবলীস সমগ্র মানব জাতির দুশমন, আর তার মধ্যে নবীরাও রয়েছেন এবং যে ইবলীস আল্লাহ পাকের আদেশ প্রত্যক্ষভাবে লংঘন করেছে, যদি সে-ই আল্লাহর শত্রু না হয়, তবে, আমার জানা নেই, আল্লাহর শত্রু আর কে হবে?

চার, মানুষের গোনাহ হওয়ার ব্যাপারে শয়তানের প্ররোচণারও দখল আছে এবং মানুষের ইচ্ছা শক্তির প্রভাবও সেখানে বিদ্যমান। তবে এটা পরিষ্কার কথা যে, শয়তানকে জোর-জবরদস্তি করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সে কেবলমাত্র মন্দকে সুন্দর করে মানুষের সামনে পেশ করে থাকে। কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণতঃ তার সামনে অসহায় ও শক্তিহীন নয়। একজন মানুষ তার প্ররোচণা ও প্রতারণায় পড়ে যায়। কিন্তু অন্য আরেকজন তা প্রত্যাখ্যানও করে থাকে। [তরজমানুল কুরআন নভেম্বর-১৯৭৬ ইং]

হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মাছের পেটে অবস্থান

প্রশ্ন ঃ আপনার খিদমতে একটি প্রশ্নপত্র নিবেদন করেছিলাম, এই লেখা পর্যন্ত উত্তর থেকে বঞ্চিত রয়েছি। অদ্যাবধি উত্তর পাওয়ার আশায় পথ চেয়ে আছি। তাফহীমুল কুরআন সূরা 'আস্‌সাফফাত'-এর ১৭ টীকায় বলা হয়েছে, "এর অর্থ এ নয় যে, ঐ মাছ কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকতো এবং হযরত ইউনুস (আঃ) কিয়ামত পর্যন্ত তার পেটে জীবিত থাকতেন। বরঞ্চ এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত ঐ মাছের পেটেই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কবর হয়ে থাকতো।" এ সম্পর্কে আমার অভিযোগ ও আপত্তিগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

এক, জ্যান্ত মাছের পেটে জ্যান্ত ইউনুস (আঃ)-এর অবস্থান করার মধ্যে আপত্তি কেন?

দুই, মৃত ইউনুস (আঃ) এর জন্য মাছের পেট কবর হয়ে থাকা, আমার নিকট, আল্লাহর কালামের উদ্দেশ্য নয়।

তিন, আল্লাহর কুদরতে এটা কি হতে পারেনা যে, জীবিত ইউনুস (আঃ) জীবিত মাছের পেটে থাকবেন?

চার, এরূপ হওয়া যদি আল্লাহর কুদরতে অসম্ভব হয়, তবে এটি কিরূপে সম্ভব যে, মৃত ইউনুস (আঃ) ও মৃত মাছ পচা-গলা থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং অন্যান্য সামুদ্রিক জন্তু-জানোয়ার তাদেরকে খেয়ে ফেলবেনা?

পাঁচ, যখন ঘটনা ঘটলোইনা, তখন সে সম্পর্কে আন্দাজ-অনুমান করার প্রয়োজনই বা কি? ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা পরিষ্কার এবং সাদাসিধাভাবে কেন করা যাবেনা যে, যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর তওবার পরিপ্রেক্ষিতে মাছের পেট হতে বের না করতেন, তাহলে তিনি স্থায়ীভাবে পেটের ভেতর থেকেই যেতেন।

উত্তর ঃ সূরা 'আস্‌সাফাত' ১৪৪ আয়াতের যে ব্যাখ্যা তাফহীমুল কুরআনে করা হয়েছে, বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনি তার মধ্যে আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন; কিন্তু আপনার নিকট যে তাফসীর পরিষ্কার এবং সাদাসিধা বলে মনে হয়েছে, তন্মধ্যে আন্দাজ-অনুমান নেই ভেবেছেন? অথচ উভয়েরই মধ্যে কিছু না কিছু ধারণা-কল্পনা ও আন্দাজ-অনুমানের দখল বিদ্যমান রয়েছে। মাওলানা মওদুদী (রহঃ) যে অর্থ করেছেন, তা এমন নয় যে, তিনিই প্রথম এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং আর কেউ এর পূর্বে এ ধরনের ব্যাখ্যা দেননি। মাওলানা নিজেই ইবনে জারীরের বরাত দিয়ে এটি লিখে দিয়েছেন যে, প্রসিদ্ধ মুফাসসির কাতাদাহ এ আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত ঐ মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কবর হয়ে থাকতো।

কুরআন মজীদে যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যদি ইউনুস (আঃ) তাসবীহ পাঠকারীদের মধ্যে না হতেন, তাহলে তিনি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটের ভেতর থেকেই যেতেন। এটি 'জুমলায়ে শর্তীয়া (শর্তযুক্ত বাক্য), তবে শর্তটি পূর্ণ হয়নি। তাই তার ফলও দেখা দেয়নি।

একে অন্যভাবে বললে বলা যায়, যদি হযরত ইউনুস (আঃ) আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা না করতেন, তাহলে অবস্থা তা-ই দাঁড়াত যা পরে বলা হয়েছে। কিন্তু সূরা আম্বিয়ায় ব্যাপারটি সুস্পষ্টরূপে এবং এখানে (সূরা আসসাফফাতে) ইশারায় বলা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট এবং সমুদ্রের অন্ধকারসমূহের মধ্যে থেকে আল্লাহকে কাতর কণ্ঠে ডাকলেনঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ۔

"তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আসলে আমিই অপরাধী আমাকে মাফ করে দাও।"

এজন্যে এই তাসবীহ পাঠ এবং আত্মসমর্পণ করার পর আল্লাহ তায়ালা হযরত ইউনুস (আঃ) কে এ বিপদ হতে মুক্তি দান করেন। তাই মাছ তাঁকে জীবিতই উদগীরণ করে ফেলে। এরপর আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আর আলোচনার তেমন প্রয়োজন থাকে না যে, যদি এই শর্ত পূরণ না হতো এবং হযরত ইউনুস মাছের পেট থেকে জীবিতাবস্থায় নিরাপদে বের না হতেন, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত কি অবস্থা ঘটতো। কুরআন-হাদীসে এ সংক্রান্ত কোনো কথা বলা হয়নি। এতদসত্ত্বেও উলামা ও মুফাসরিরগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেননি। বরং এ সম্পর্কে তারা আপন ধারণা পেশ করেছেন যে, মাছের পেটে ইউনুস (আঃ)-এর অবস্থানের পরিণতি কি হতে পারে? এ ব্যাপারে সাধারণত তিনটি মত বর্ণিত আছে ঃ

এক, মাছ এবং ইউনুস (আঃ) উভয়েরই মৃত্যু ঘটতো এবং রোজ হাশরে ইউনুসকে

(আঃ) পুনর্বার মাছের পেট থেকে উঠানো হতো।

দুই, মাছ তো মরে যেত, কিন্তু ইউনুস (আঃ) পেটে জ্যান্ত অবস্থান করতেন।

তিন, হযরত ইউনুস (আঃ) এবং মাছ উভয়ই জীবিত থাকতো এবং ইউনুস (আঃ) জ্যান্ত মাছের পেটে থেকেই যেতেন। প্রথম কথা কাতাদা (রহঃ) -এর যা তাফসীরে ইবনে জারীর, কাশ্‌শাফ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে এবং মাওলানা মওদূদী (রহঃ) একে বেশী সমর্থনযোগ্য মনে করেছেন। এ ধরনের ব্যাখ্যা আরো কিছু মুফাসসির তাদের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। তাদের কিছু মন্তব্য নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ইমাম ইবনে জাওযী (রহঃ) (মৃত্যু ৫৯৬ হিঃ) 'যাদুল মাসীর' নামক তাফসীরে বলেন ঃ

لصار بطن الحوت قبرًا الى يوم القيامة.

"মাছের পেটে কিয়ামত পর্যন্ত তার কবর হয়ে থাকতো।"

২. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হিঃ) স্বীয় তাফসীর 'মাফাতীহুল গায়েব'-এ বলেন ঃ

للبث فى بطن ذالك الحوت و كان بطنه
قبرًا له الى يوم البعث -

"যদি হযরত ইউনুস (আঃ) তাসবীহ পাঠ না করতেন, তাহলে তিনি ঐ মাছের পেটের মধ্যে রয়ে যেতেন এবং তার পেট হাশরের দিন পর্যন্ত তার কবর হয়ে থাকতো।"

৩. আল্লামা আলাউদ্দীন আল খাযিন (মৃতুঃ ৭২৫ হিঃ) স্বীয় তাফসীর 'লুবাবুত্ তা'বীর ফি মা'আলিমিত তান্‌যীল-এ এবং ইমাম আবু মুহাম্মদ আল-বাগাবী (মৃত্যু ৫১৬হিঃ) স্বীয় তাফসীর 'মা আলিমুত তানযীল' এ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

لصار بطن الحوت قبرًا له الى يوم القيامة

"মাছের পেট কিয়ামত পর্যন্ত হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কবর হয়ে থাকতো।"

৪. কাজী সানাউল্লাহ পানিপতী (মৃত্যু ১২২৫ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন ঃ

يعنى لمات فى بطنه و صارله قبرًا-

অর্থাৎ যদি হযরত ইউনুস (আঃ) তাসবীহ না করতেন, তাহলে মাছের পেটে মরে যেতেন এবং সেটি তার জন্য কবর হয়ে থাকতো।

৫. মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী স্বীয় তাফসীরের টীকায় লিখেছেন ঃ

"......ورنہ قیامت تک اس کے پیٹ سے نکلنا ممکن نہ ہوتا اور مچھلی کی غذا بن جاتے۔"

"........নতুবা কিয়ামত পর্যন্ত তার পেট থেকে বের হওয়া সম্ভব হতোনা এবং মাছের খাদ্য হয়ে যেতেন।"

৬. মাওলানা আশরাফ আলী থানবী তদীয় তাফসীর 'বয়ানুল কুরআনে বলেন ঃ

"مطلب یہ ہے کہ پیٹ سے نکلنا میسر نہ ہوتا، بلکہ اس کی غذا بنا دیئے جاتے پس اس مطلب پر اُس کا اور اس کے بطن کا قیامت تک باقی رہنا لازم نہیں آتا۔"

"অর্থাৎ পেট হতে বের হওয়া সম্ভব হতোনা, বরঞ্চ তার খাদ্য বানিয়ে দেয়া হতো। সুতরাং এ অর্থ গ্রহণ করাতে তার এবং তার পেটের কিয়ামত পর্যন্ত জিন্দা থাকা জরুরী হয় না।"

৭. মাওলানা আব্দুল মজীদ দরয়াবাদী 'তাফসীরে মাজিদীতে' বলেন ঃ

"মাছের পেট হতে বের হওয়া তাঁর কপালে জুটতোনা এবং তাকে মাছের খাদ্য বানিয়ে দেয়া হতো। এর অর্থ এ নয় যে, মাছের পেট কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত ও অক্ষত থাকতো।"

আমার এ কথা বুঝে আসেনা, যে ব্যাখ্যা এসব উদ্ধৃতিতে রয়েছে এবং যা প্রায় মাওলানা মওদূদীর (রহঃ) বক্তব্যেরই সমার্থক, তা যদি পরিষ্কার না হয়, তাহলে আপনার গৃহীত ব্যাখ্যা কিরূপে পরিষ্কার এবং অনুমান থেকে মুক্ত হতে পারে? আপনি বলছেন, জীবিত মাছের পেটে জীবিত ইউনুস (আঃ) এর অবস্থান করাতে কি আপত্তি?

আপত্তির জন্যই যদি আপত্তি করতে কেউ চায় তাকে কে ঠেকায়? আপত্তি উত্থাপন করার চেষ্টা করা কোনো মুশকিল কাজ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হযরত ইউনুস (আঃ)-এর তাসবীহ না পাঠ করা (অথবা নিজের জাতিকে ছেড়ে চলে যাওয়া) এত বড় ভুল তো হতে না পারতো, যদ্দরুন তাঁকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্ধকার খাঁচার মধ্যে বন্দী ও আবদ্ধ করে দেয়া যেত এবং মাছটির কি অপরাধ ছিল যে, একটি জীবিত মানুষকে তার পেটে রেখে কিয়ামত পর্যন্ত তাকে জীবিত রাখা হতো? আরো প্রশ্ন থেকে যায় যে, যদি উভয়কেই পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত জীবিত রাখা হতো তাহলে তাদের উপর মৃত্যু আপতিত হতো অথবা হতোনা। যদি হতো, তবে কবে? কিয়ামত সংঘটিত হবার কত পূর্বে? আপনি যদি চান, এসব প্রশ্নের উত্তর কোনো না কোনোভাবে অবশ্যি দিতে পারেন। কিন্তু আপনাকে এটা মানতেই হবে যে, আপনার পছন্দসই ব্যাখ্যা প্রশ্নাতীত নয় এবং আন্দাজ-অনুমান ও যুক্তির লড়াই থেকে মুক্ত এমন দাবী করতে পারেননা।

আপনি আরো বলছেনঃ আল্লাহর কুদরত কি এমন হতে পারেনা যে, জীবিত ইউনুস (আঃ) জীবিত মাছের পেটে বেঁচে থাকবেন? তার উত্তর এই যে, আল্লাহর কুদরত তো

প্রত্যেক জিনিসে এবং প্রত্যেক অবস্থায় পরিব্যাপ্ত আছে; কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আপনি নিজে আল্লাহর কুদরতের নামে এমন কিছু অনুমান করতে থাকবেন, যে ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস নীরব রয়েছে। অথচ অন্য ব্যক্তি যদি অনুরূপভাবে আল্লাহর কুদরতের আওতাধীন থেকে ওর খেলাফ কিছু বলে, তবে আপনি অমনি তাকে আন্দাজ ও অনুমানের ফলশ্রুতি এবং এমনটি হবার নয় বলে আখ্যায়িত করবেন।

অনুরূপভাবে আপনার এ অভিযোগও বেশী কোনো গুরুত্ব রাখেনা যে, মৃত ইউনুসের (আঃ) এবং মৃত মাছের পচাগলা হতে এবং অন্যান্য সামুদ্রিক জন্তু হতে সুরক্ষিত থাকা কিরূপে সম্ভব?

প্রথমতঃ মাওলানা মওদূদী (রহঃ) সে বিশ্লেষণ হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) হতে উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকে হযরত ইউনুস (আঃ) এবং মাছের ভৌতিক অস্তিত্ব হুবহু সুরক্ষিত থাকা জরুরী হয়ে দেখা দেয়না, বরঞ্চ তার অর্থ শুধু এতটুকু দাঁড়াতে পারে যে, হযরত ইউনুস (আঃ) এর মৃত্যু মাছের পেটে হয়ে থাকবে এবং কিয়ামতের দিন মাছের ছিন্নভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একত্রিত করে তার মধ্য থেকে হযরত ইউনুস (আঃ)কে জীবিত উত্থিত করা হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা এও হতে পারে যে, আল্লাহ্ তায়ালা সমুদ্র তলদেশে কোনো তুষার শীতল পরিমন্ডলে হযরত ইউনুস (আঃ) এবং মাছের শরীরকে সুরক্ষিত করে রেখে দিতে পারেন। তিনি তাদেরকে যে কোনো পরিবর্তন ও হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। যদি তাদেরকে জীবিত রেখেই সকল ক্ষতি ও আঘাত হতে নিরাপদে রাখা যায়, তাহলে মৃত্যু ঘটাবার পর কেন তদ্রূপ করা যাবেনা? আমি এ পর্যন্ত যা কিছু লিখলাম তা এজন্য যে, আপনি উত্তর পাবার জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছেন। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরও বিষয়টি আপনার মস্তিষ্কে যেমন ছিল, তেমনি প্রভাব বিস্তার করে রয়ে গেছে। অন্যথায় এর পেছনে সময় ব্যয় না করে, অন্য কোনো স্থানে আপনার ও আমার সময় ব্যয় করা যেতে পারতো।

আমার এ উত্তরদানের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার ন্যায় প্রশ্নকারী ও অভিযোগকারীগণের মাথায় এ বিষয়টি ঢুকিয়ে দেয়া যে, মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর নীতি ও আদর্শ এই যে, তিনি কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী এবং আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত ও সর্বসমর্থিত নীতি থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুৎ হননা। তবে সুস্পষ্ট নয় এমন সব বিষয়ে যেহেতু বিতর্কের অবকাশ থাকে, তাই তিনি সেখানে একলা চলো নীতি গ্রহণ করার পরিবর্তে সাধারণভাবে পূর্বতন উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মতের মধ্যে কোনো একটাকে গ্রহণ করে থাকেন। এসব বিষয়ে একক নীতি অবলম্বন করা এবং অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা মত প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বা হারাম নয়, তা সত্ত্বেও এসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত মজবুত এবং শক্ত দলিল প্রমাণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মাওলানা মরহুমের অভ্যাস এই যে, তিনি ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন এবং অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সংক্ষিপ্তভাবে স্বীয় গবেষণা পেশ করে থাকেন।

এখানে তো হযরত কাতাদাহ (রহঃ)-এর বরাত দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থানে তিনি এরূপ উল্লেখ করেননা যে, পূর্ববর্তী বুজুর্গগণের কোনো কোনো ব্যক্তি এ কথা বলেছেন। উল্লেখ না করার কারণ এই যে জ্ঞান তাপসগণ মূল উৎস ও মূল ভান্ডারের খোঁজ রেখে থাকবেন। তারা এসব মাসয়ালা নিজেরাই খুঁজে বের করে ছাড়বেন। কিন্তু তার এ আশা সফল হয়নি। তাঁর সহজভাবে নেয়া এ কাজটি সহযোগীদের সামনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। কতেক লোক অযথা তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে নিজের ও অপরের সময় অপ্রয়োজনীয় বাদানুবাদে ব্যয় করে থাকেন। [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর, ১৯৭৬ইং]

ইবরাহীম (আঃ) এর আদর্শ এবং তাঁর সমালোচক

প্রশ্ন ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একটি বিখ্যাত ঘটনা হলো, তিনি স্বীয় বেগম সাহেবা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে আল্লাহর হুকুমে তৃণলতাপাতাহীন বিরান ভূমিতে ফেলে এসেছিলেন। যখন তিনি সেখান থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন তাঁর বেগম তাঁর পিছে পিছে দৌড়াচ্ছিলেন এবং জিজ্ঞাস করছিলেন-'আপনি কেন আমাদেরকে এখানে ফেলে যাচ্ছেন?'

হযরত ইবরাহীম (আঃ) নীরব রইলেন। এরপর বিবি সাহেবা নিজেই বলে উঠলেন, 'আপনি কি আল্লাহর হুকুমে এরূপ করছেন?' তখন তিনি জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ'। পরম ধৈর্যশীলা এবং আল্লাহর ওপর ভরসাকারী মহীয়সী মহিলা এ কথা শুনে কোনোরূপ পেরেশানি ও অস্থিরতা প্রকাশ করেননি এবং বিরান মরুভূমিতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করলেন।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'তুলুয়ে ইসলাম' পত্রিকার ১৯৭৬ইং সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ঃ "এ ঘটনা কুরআন শরীফে নেই। তাওরাতে আছে। সেখান থেকে আমাদের কিতাবসমূহে এসে পড়েছে এবং একে মওদূদী সাহেবের মত মুফাসসির সাধারণ্যে প্রচার করে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বুঝেশুনে যারা চলেন, তারা যেন ইসলাম থেকে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন।" তাই অনুগ্রহপূর্বক বলুন, তুলুয়ে ইসলাম-এর এ কথার সার্থকতা কতটুকু?

আরো একটি বিষয় আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, সে সম্পর্কেও আপনার নিকট থেকে ব্যাখ্যা লাভ করতে চাই। হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজের বিবি হযরত হাজিরা (আঃ)কে ছেড়ে অন্য বিবি সারার নিকট সিরিয়ায় চলে গেলেন। কিছুদিন পর তিনি চাইলেন বিবি হাজিরা (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে আসি। নিজের বিবি 'সারা'র কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি অনুমতি দিলেন, তবে শর্ত এই যে, বাহন থেকে নামবেননা। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এ শর্ত কবুল করে নিলেন এবং যাত্রা শুরু করলেন। তিনি মক্কায় এসে যখন পৌছলেন তার আগে বিবি হাজিরা (আঃ)-এর ইন্তিকাল হয়ে গিয়েছিল।

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর স্ত্রী ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) শিকারে গিয়েছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ)-এর বিবির কাছে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। বিবি খোলা মনে সন্তোষজনক উত্তর দিলেননা। ইবরাহীম (আঃ) ফিরে আসার সময় বলে এলেন 'ইসমাঈলকে বলবে তার দরজার চৌকাঠ ভাল না। সে যেন তা বদলে নেয়। এ কথা বললেন এবং তখনি প্রস্থান করলেন।

ইসমাঈল (আঃ) বাড়ীতে ফিরে এলে তার বিবি তাঁকে সব ঘটনা খুলে বললো। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ) বিবিকে তালাক দিলেন এবং অন্য একটি বিয়ে করে নিলেন। এরপর কিছুদিন চলে গেল, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্রের সাথে সাক্ষাত করতে চাইলেন। নিজের স্ত্রী সারার নিকট ইজাযত প্রার্থনা করলেন। তিনি পূর্বের ন্যায় শর্তযুক্ত ইজাযত দিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কায় আগমন করলেন। ঘটনাক্রমে ইসমাঈল (আঃ) এবারও বাড়ীতে ছিলেননা। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর বিবির নিকট সংসারের খবরাদি নিলেন। বিবি সাহেবা অত্যন্ত সন্তোষজনক আলাপ করলেন। এমনকি তাঁর মাথা পর্যন্ত ধুয়ে দিলেন। ফিরে যাবার সময় তিনি বলে গেলেন, ইসমাঈলকে বলে দিও তার দরজার চৌকাঠ ভাল, একে যেন বজায় রাখা হয়। হযরত ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী ফিরে আসলে বিবি সাহেবা সব ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) বিবিকে বললেন, তিনি আমার পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তুমি আমার ঘরের চৌকাঠ। এ বিবরণ থেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো আমার চিন্তাকে আলোড়িত করছে ঃ

১. এ ঘটনা কি সত্য?

২. যদি সত্য হয়, তাহলে এতটুকু কারণে তালাক দেয়া কি সঙ্গত?

৩. কুরআন শরীফে ইসমাঈল (আঃ) সম্পর্কে কুরবানীর ঘটনা উল্লেখ আছে। উপরোল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে জানা গেল যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ) এর মধ্যে সাক্ষাতই হয়নি, তাহলে কুরবানীর ঘটনা ঘটলো কবে?

আশা করছি কষ্ট করে হলেও আপনি দয়া করে জবাব দেবেন।

উত্তর ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর একথা কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে যে, কা'বা শরীফ নির্মাণকালে তিনি নিম্নের দু'আটি করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ-

'হে আমাদের প্রভু! আমি আমার পরিবারের কিছু অংশকে তৃণহীন শুষ্ক মরুভূমিতে বসবাস করার জন্য রেখে গেলাম।'

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ কথা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, তিনি তাঁর ছেলেকে এখানে বসবাসের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে তাদের

সাথে জীবনযাপন করেননি।

যদি এমন হতো, তাহলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এরূপ বলতেন, 'আমি এখানে নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে বাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।'

এখন ঘটনাটির দু'টি রূপ হওয়া সম্ভব ঃ

এক, হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজের ইচ্ছায় তাদেরকে এ বিজন মরুভূমিতে রেখে থাকবেন।

দুই, তিনি আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক এরূপ করেছিলেন। তাওরাতী, তাফসীরী অথবা ঐতিহাসিক বর্ণনা নয়, বরং সহীহ হাদীস হতে আমরা জানতে পারি যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর হুকুমেই এতখানি অস্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বুখারী শরীফ কিতাবুল আম্বিয়ায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কতিপয় হাদীস নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, যদ্বারা একথারই সমর্থন পাওয়া যায়।

এ হাদীসগুলোকে যদি 'মুরসাল' (সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে) মনে করা হয়, তবুও সাহাবীদের মুরসালসমূহ বিশেষত সহীহাইনে (বুখারীও মুসলিমে) সংকলিত মুরসাল হাদীস নির্ভরযোগ্য এবং দলিল হিসেবে পেশযোগ্য। এসব হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁর আম্মা সাহেবাকে নিয়ে যখন উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন সেখানে কোনো পানি ও জনবসতি ছিলনা।

আর এখানেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) মা ও ছেলেকে ছেড়ে এলেন। একটি ব্যাগে কিছু খেজুর এবং ছোট একটি মশকে পানি তাদের নিকট রেখেই ওখান থেকে ফিরে চললেন। হযরত হাজেরা (আঃ) পেছনে পেছনে ডেকে বলতে থাকলেন ঃ

> "হে প্রিয়তম স্বামী! আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে এরূপ করতে আদেশ দিয়েছেন? হযরত ইবরাহীম (আঃ) জবাব দিলেন, হ্যাঁ। বিবি হাজেরা বললেন, তবে তো আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস হতে দিবেননা। একথা বলে তিনি ফিরে আসলেন"।

ঐ হাদীসে আরো উল্লেখ আছে যে, যখন পানি এবং খেজুর ফুরিয়ে গেল, তখন বিবি হাজেরা পানির সন্ধানে ছাফা ও মারওয়া (পর্বতদ্বয়ের) মাঝে ছুটাছুটি করতে থাকেন। যখন তিনি সাতবার দৌড়াদৌড়ি করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি 'যমযমের' নিকট একজন ফেরেশতা দেখলেন। তিনি (ফেরেশতা) ভূমিতে নিজের ডানা দ্বারা আঘাত করলেন, অমনি সেখান থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। ফেরেশতা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনি কখনো ক্ষতির আশংকা করবেননা। এখানে আল্লাহর ঘর অবস্থিত আছে। ঐ ঘরকে এ ছেলে এবং তাঁর পিতা একত্রিত হয়ে পুনর্নির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাআলা তাদের পরিবার তথা সন্তান সন্তুতিকে ধ্বংস করবেন না।' কুরআন হাদীসে এসব সুস্পষ্ট বাণী থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যে, এগুলো তাওরাত থেকে এসেছে এবং মওদূদী (রহঃ) এর মতো মুফাসসির এগুলোকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে যাচ্ছেন, এতো অবিকল ঐ ধরনের কথা যেমন ইয়াহুদী, গোল্ডযিহার, অন্যান্য

বিধর্মী ও প্রাচ্যবিদরা বলে থাকে যে, কুরআন-হাদীসের প্রত্যেকটি কথা তাওরাত, তালমূদ এবং অপরাপর ইসরাঈলী বর্ণনা এবং আহলে কিতাবের জনশ্রুতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের নওমুসলিম বোন মরিয়াম জামিলা বর্ণনা করেছেন যে, তার এক ইহুদী শিক্ষক অত্যন্ত পরিশ্রম করে ও টেনেহিঁচড়ে কুরআন মজীদের অধিকাংশ আয়াত ও কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বচনগুলো নিজেদের কিতাব থেকে একত্রিত করে রেখেছিলেন।

আরবের মুশরিকরাও এরূপই বলতো যে, কুরআন তো পুরানো কিচ্ছা-কাহিনী যা লিখে নেয়া হয়েছে এবং সকাল-সন্ধ্যায় যেগুলো মুহাম্মদ (সাঃ)কে পড়ে শুনানো হয়। কিন্তু এরূপ বাজে কথা দিয়ে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থতাকে কেমন করে সন্দেহযুক্ত করা যেতে পারে?

হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসমাঈল এবং বিবি হাজেরা (আলাইহিমুসসালাম)-এর ঈমানদীপ্ত ঘটনাবলী মুহাদ্দিসগণ এবং মুফাসসিরগণ চৌদ্দ শো'-এর অধিক বছর ধরে বর্ণনা করে আসছেন। আজ পর্যন্ত কোনো মুসলমান ওসব পড়ে বা শুনে ইসলাম থেকে বিতৃষ্ণ হয়নি। বরঞ্চ এখন যে নতুন ইসলাম 'তুলু' (উদয়) হচ্ছে এবং জেনে বুঝে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজ করা যাদের অভ্যাস, ঐসব তথাকথিত জ্ঞানসন্ধানী এ ধরনের নতুন ইসলামে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ছে এবং তারা মূল ইসলাম থেকে অবশ্যি বিপথগামী হতে বাধ্য হচ্ছে, যা শতাব্দী থেকে শতাব্দীকাল পর্যন্ত (পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ) এর নিকট সুপরিচিত এবং সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহ্যমন্ডিত দীনে পরিণত হয়ে আছে।

বুখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীসসমূহে একথা নেই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) বিবি 'সারা' এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন এবং বিবি সারা শর্তযুক্ত অনুমতি প্রদান করেছিলেন। তবে এতটুকু উল্লেখ আছে ঃ 'আমি আমার পরিবার পরিজনের কুশলাদি জানার জন্য যাচ্ছি।' বুখারীতে এও নেই যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈল (আঃ)-এর গৃহে পৌছলেন তখন ইসমাঈল (আঃ)-এর বিবি কোনো সন্তোষজনক উত্তর দেননি।

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর স্ত্রীর যে জবাবের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা হলোঃ

'আমরা বিপদ ও অভাবের মধ্যে জীবনযাপন করছি।' এর থেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) অনুমান করে থাকবেন যে, সে মহিলা অভাব-অভিযোগ তুলে ধরতে অভ্যস্ত, তার ভেতর নবুওয়াতী মিশনের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পাদন করার যোগ্যতা থাকতে পারেনা।

এজন্য উত্তম হবে ইসমাঈল (আঃ) তাকে ত্যাগ করে অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করে নিক যিনি কঠিন অবস্থায় সবর ও শোকরের সাথে স্বামীর সহযোগিতা করবেন এবং কখনো অনুযোগ ও অভিযোগ করবেননা।

সুতরাং দ্বিতীয় বিবির উত্তর, যা ঐ হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন পুনরায় ইসমাঈল (আঃ)-এর বাড়ীতে এসে এই বিবির নিকট কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন, তখন পরবর্তী বিবি উত্তর দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমরা বেশ ভাল

আছি এবং স্বচ্ছল জীবনযাপন করছি। এমনিভাবে তিনি আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করলেন। জানা কথা যে, সেই মরুচারী জীবনে ততদিনে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী ধৈর্যশীলা ও অল্পে তুষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী প্রমাণিত হলেন। এ কারণেই তিনি উপযুক্ত পরিবারে উপযুক্ত গৃহিণী সাব্যস্ত হলেন। ঐ একই কারণে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁকে মহান গৃহের উত্তম চৌকাঠ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং তাঁকে স্থায়ীভাবে রেখে দেয়ার নির্দেশও দিয়েছিলেন। আপনার শেষ প্রশ্নের জবাব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবার-পরিজন দুই স্থানে অবস্থিত ছিল। এক, মক্কায়। দুই, সিরিয়ায়। সেজন্য তিনি স্বতন্ত্রভাবে এক স্থানে বসবাস করতেননা। অবশ্যি উভয় বাড়ীতে তিনি আসা-যাওয়া করতেন। উভয় বাড়ীর খবরাখবর নেয়ার জন্য তাঁর সময় সময় গমনাগমনের অভ্যাস ছিল।

কুরবানীর ঘটনা ইসমাঈল (আঃ)-এর বিয়ের আগেই ঘটেছিল। তখন তিনি দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে পৌছেছিলেন। গলায় ছুরি চালানোর ন্যায় মহান পরীক্ষায় যখন বাপ-বেটা সফলতার গৌরবে গৌরবান্বিত হলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা উভয়কেই বায়তুল্লাহর নির্মাণ কার্যের আদেশ দিলেন।

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বাড়ীতে উপস্থিত না থাকা এ কথা প্রমাণ করেনা যে, এ ঘটনার আগে বা পরে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কুশলাদি জানার জন্য কখনো সেখানে আসেননি অথবা এসেছিলেন কিন্তু পিতা-পুত্রের মধ্যে সাক্ষাতই হতে পারেনি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তার পরিবারকে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হবার তাওফিক দিয়েছিলেন। যার মনে চায়, গোটা ঘটনার ধারাবাহিকতা থেকে সে শিক্ষা, উপদেশ এবং আধ্যাত্মিক শক্তি গ্রহণ করতে পারে এবং যার ইচ্ছা হয়, তার বিকৃত মনে খামোখা সন্দেহ সংশয় পোষণ করতে পারে।

তার মনে এ খটকাও জাগতে পারে, এ আবার কেমন খোদা যে তার নবীকে এমন আদেশ দিলঃ এক দুগ্ধপোষ্য শিশুকে তার মা'র সাথে এক তৃণলতাহীন বিজন প্রান্তরে ফেলে এসো। তারপর শিশুটি যখন নবযৌবনে পদার্পণ করতে লাগলো, তখন তার গলায় ছুরি চালাতে হুকুম হলো। এ আবার কেমন নবী! তার পরিবারই বা কেমন যে বিনা চিন্তা-ভাবনায় এ ধরনের আদেশ মেনেই চলেছেন! কবি বলেন ঃ

'প্রত্যেক লোকের চিন্তা, তার সাহস-হিম্মত অনুযায়ীই গড়ে ওঠে।' [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬]

ইসলামে গণতন্ত্র

প্রশ্ন ঃ আমি আমেরিকার ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি। দীর্ঘদিন থেকে এখানে এমন কিছু আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছে যেগুলোর জবাব দেবার জন্যে আমার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। তাই বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দানের জন্যে আপনার নিকট নিবেদন করছি।

প্রথমত, এখানকার বেশ কিছু মুসলমানের মতে ইসলামে আদৌ কোনো গণতন্ত্র ছিল না। একথাও যদি স্বীকার করে নেয়া হয় যে, হযরত আলীও (রাঃ) জনগণের রায় অনুযায়ী সংখ্যাধিক্যের ফায়সালা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের ফায়সালা সকলের জন্যে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তবে কেন লোকেরা মিঃ ভুট্টোকে শাসক হিসেবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও তার ফায়সালাসমূহ গ্রহণ করে নিচ্ছেনা। যদিও ঐ ভদ্রলোকেরা একথা স্বীকার করেন যে, সমকালীন শাসকের ফায়সালা ভুলও হতে পারে।

আরেকটি ঘটনা হলো, জনৈক ভদ্রলোক এ কথাটা খুব ফলাও করে বলে বেড়াচ্ছেন যে, আবু সুফিয়ান যখন মুসলমান হন তখন নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, এ খুব ভাল মুসলমান। অথচ নবী করীমের (সাঃ) মৃত্যুর পর এই আবু সুফিয়ানই বলেছিল, এখনতো খেলাফতও হাশেমী খানদানে বন্টিত হচ্ছে। লোকটির এই বক্তব্য কি ঠিক?

জবাব ঃ আপনার পত্র পেয়েছি এবং একথা জেনে খুশী হয়েছি, যদিও আপনার দ্বীনি জ্ঞানের কিছুটা কমতি আছে তবুও আপনার মধ্যে দ্বীনের প্রতি আস্থা ও আবেগের কমতি নেই। এর চাইতেও খুশির বিষয় হলো, যে বিষয়ে নিজের জানার অভাব আছে সে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা আপনি করেছেন। নিম্নে আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া গেল ঃ

১. ইসলামে আদৌ গণতন্ত্র নেই- একথাটি নিতান্তই ভুল। কুরআন মজীদের সূরা শূরায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন, -ওয়া আমরুহুম শূরা বাইনাহুম। অর্থাৎ তাদের কার্যক্রম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়। মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খলীফা ও আমীরের নির্বাচনও এই মূলনীতির ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ মুসলমানদের সাধারণ রায়ের ভিত্তিতেই খলীফা নির্বাচিত হবেন এবং তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন পরামর্শের ভিত্তিতে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত গণতন্ত্র আর ইসলামী গণতন্ত্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র তো কেবলমাত্র নাগরিকদের সংখ্যাধিক্যের মতই প্রতিটি জিনিসকে বৈধ কিংবা অবৈধ এবং করণীয় কিংবা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা দিতে পারে। কিন্তু ইসলামে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য আল্লাহ এবং রাসূল (সাঃ) কর্তৃক হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার এবং হালালকৃত জিনিসকে হারাম করার অধিকার রাখেনা। যেমন সংখ্যাধিক্য মুসলমান কোনো ফাসিক-ফাজিরকে নিজেদের নেতা বানাতে চাইলেও তা করার অধিকার ইসলাম তাদের দেয়নি। কোথাও যদি মুসলমানরা এমনটি করে ফেলে তবে সেই নেতৃত্ব অবৈধ।

২. হযরত আবু সুফিয়ান সম্পর্কে ওরা যেকথা বলে বেড়াচ্ছে তা সত্য নয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হলে আবু সুফিয়ান হযরত আলীকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেন। তিনি হযরত আলীকে একথাও বলেন, আপনি এগিয়ে এলে আমি আপনার সাহায্য করবো। কিন্তু হযরত আলী আবু সুফিয়ানকে কঠোর ভাষায় জবাব দিয়েছেন 'তুমি পূর্বেও ইসলাম এবং মুসলমানদের

বিরোধিতা করেছো কিন্তু কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারোনি। আল্লাহর কসম, আমি আবু বকরকে খিলাফতের যোগ্য মনে করি।' অতঃপর হযরত আলী হযরত আবু বকরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এ থেকে পরিষ্কার হচ্ছে আবু সুফিয়ান হাশেমী খানদানের খিলাফতের বিরোধিতা নয়, বরং খিলাফত তাদের নিজেদের হাতে আসুক সেই চেষ্টাই করতে চেয়েছিলেন। [তরজমানুল কুরআন, মার্চ-১৯৭৭ইং]

আকাশ থেকে খাদ্যপূর্ণ পাত্র নেমেছিল, নাকি নামেনি?

প্রশ্ন ঃ আমি তাফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' নিয়মিত পড়ে থাকি এবং মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এর রচনাবলীর খুবই ভক্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত তাঁর সাথে মুখোমুখি সাক্ষাত থেকে আমি বঞ্চিত।

সূরা মায়িদা (আয়াত-১১২) এর তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে যা করা হয়েছে, সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা আমার বুঝে আসেনি। এ ব্যাপারে কিছু সাথী সঙ্গীর সাথে আলাপ করেছি, কিন্তু কেউই আমার তৃষ্ণা নিবারিত করতে পারেনি।

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ -

"ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গী-সাথীরা (হাওয়ারীগণ) ঈসা (আঃ)কে বললো ঃ আপনার প্রভু আমাদের জন্য আকাশ হতে খাদ্যপূর্ণ পাত্র নামিয়ে দিতে পারেন কি?"

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী (রহঃ) বলেন ঃ 'খাঞ্চা অবতরণ করেছিল, কিংবা করেনি- এ ব্যাপারে কুরআন এবং গ্রহণযোগ্য হাদীস নীরব রয়েছে। এমনও হতে পারে যে, পরবর্তী শাস্তির হুমকির দরুন তারা এ দাবী প্রত্যাহার করে থাকবেন।" এ তফসীরের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু গতকাল কুরআন মজীদের জনৈক অনুবাদকের টীকায় সংশ্লিষ্ট আয়াত সম্পর্কে নিম্নলিখিত রিওয়ায়াত আমার নজরে পড়ল ঃ

আম্মার ইবনে ইয়াসির বর্ণনা করেছেন যে, খাঞ্চা অবতরণ করেছিল। তাতে গোশত এবং খাবার ছিল। অবতরণের পর যে সমস্ত লোক অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিল, তারা শুয়োর ও বান্দরের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অধিকন্তু এ রিওয়ায়াতটি ইবনে কাসীর এবং পশতু তাফসীরেও উদ্ধৃত হয়েছে।

আপনার নিকট আকুল আবেদন এই যে, ঐ হাদীসের আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ জবাব দানে আমাকে বাধিত করবেন।

উত্তর ঃ আপনি তাফহীমুল কুরআন সূরা মায়িদা-এর ১২৯ টীকা শুদ্ধ ও পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করেননি। ঐ টীকাটি হুবহু নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"কুরআন এ ব্যাপারে নীরব যে, এই খাঞ্চা বাস্তবে অবতারিত হয়েছিল অথবা অবতারিত হয়নি। অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়না। এও হতে পারে যে, অবতরণ করেছিল, আবার এও হতে পারে যে, হাওয়ারীগণ পরবর্তী ভীতিপ্রদ হুমকি শুনে নিজেদের খাঞ্চা চাওয়ার দরখাস্ত প্রত্যাহার করে থাকবেন।"

আপনি এর ভিত্তিতে নিজের অভিযোগ উথাপন করেছেন যে, তিরমিযী শরীফে একটি রিওয়ায়াত বর্তমান আছে যা থেকে বুঝা যায় যে, খাঞ্চা অবতরণ করেছিল, যার মধ্যে গোশত এবং খাদ্য ছিল। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সুনানে তিরমিযিতে কিতাবুত তাফসীরে এরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার মূল বচন এরূপ ঃ

عن عمار بن ياسير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلت المائدة من السماء خبزًا ولحمًا وامروا ان لا يخونوا ولا يدخروا الغد فخانوا وادخروا ورفعوا الغد فمسخوا قردة وخنازير-

"হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, আকাশ হতে গোশত রুটি ভর্তি একখানা খাঞ্চা অবতারিত হয়েছিল এবং আহলে কিতাবদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছিল, তারা যেন এতে খিয়ানত না করে তথা আগামী দিনের জন্য জমা না করে রাখে, কিন্তু তারা বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং পরদিনের জন্য সঞ্চয় করে রাখলো। ফলে তাদেরকে বিকৃত করে বানর ও শুয়োর বানিয়ে দেয়া হয়েছিল।"

এ রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করে খোদ ইমাম তিরমিযি (রহঃ) বলেছেন যে, একাধিক বর্ণনাকারী এটিকে আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হাদীসটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহর (সাঃ) পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত, তা বুঝা যায়না। তাই হাদীসটি মওকুফ, মরফু' নয়। শুধুমাত্র হাসান ইবনে কুয'আ রাবী মরফু হিসেবে অর্থাৎ খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মুখ নিঃসৃত বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এসব রিওয়ায়াতের মধ্যে মাত্র একটির সনদ ইমাম তিরমিযি সাঈদ ইবনে আবু আরূবা পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেনঃ

عن سعيد ابن ابى عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا اصح من حديث الحسن بن قزعة ولا نعلم للحديث المرفوع اصلاً-

"সাঈদ ইবনে আবু আরূবা হতে এ বিষয়টির পক্ষে বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে তিনি বর্ণনাটিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মুখ নিঃসৃত বলে দাবী করেননি। এটি হাসান ইবনে কুয'আর হাদীস থেকে বেশী বিশুদ্ধ। এ ধরনের হাদীসে মরফূ' (সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে বর্ণিত) হবার কোনো ভিত্তি আমাদের জানা নেই।"

ইমাম তিরমিযি (রহঃ)-এর স্বীয় সমালোচনা হতে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আকাশ থেকে খাঞ্চা অবতরণের রিওয়ায়াতের সনদ যে পরিমাণ শুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির পর্যন্ত পৌঁছে, সে পরিমাণ শুদ্ধ প্রমাণিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেনা।

هذا حديث غريب

তিরমিযি হাদীস গ্রন্থের কতিপয় সংস্করণে 'এটি হাদীসে 'গরীব' অপরিচিত হাদীস' এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী লিখিত তিরমিযি শরীফের ব্যাখ্যা তুহফাতুল আহ্ওয়াযী বশরহে তিরমিযিতে একথা মুদ্রিত হয়েছে ঃ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে ঐ হাদীসটির ব্যাখ্যা সুস্পষ্টভাবে ও সুনিশ্চিতরূপে পাওয়া যেত, তাহলে এ ব্যাপারটি বিতর্কমূলক থাকতোনা যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়েছিল অথবা অবতীর্ণ হয়নি। কিন্তু ঘটনাটি আদৌ তদ্রূপ নয়। প্রায় সকল তাফসীরকার এ আয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। ঐসব উদ্ধৃতিতে খাঞ্চা অবতরণের পক্ষে এবং বিপক্ষে উক্তি পাওয়া যায়।

তাই তাফসীরে তবারীতে

بيان الخلاف فى المائدة نزلت ام لا وما هى

'খাঞ্চা অবতরণ হয়েছিল কিংবা হয়নি সম্পর্কিত মতভেদের আলোচনা এবং তা কি?' এ শিরোনামে উভয় পক্ষের অনেক মতামত উদ্ধৃত হয়েছে। খাঞ্চা অবতরণের সপক্ষে এমন রিওয়ায়াত উদ্ধৃত আছে এবং তা ঐ সনদের সাথে বর্ণিত হয়েছে, যা জামে তিরমিযি হাদীস গ্রন্থে খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে সরাসরি বর্ণিত। সেখানে এমন অনেক রিওয়ায়াতও বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো হযরত আম্মার (রাঃ) পর্যন্ত গিয়ে থেমে আছে।

পক্ষান্তরে হযরত হাসান বসরী (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রাঃ) হতে ঐসব রিওয়ায়াতও উদ্ধৃত হয়েছে, যেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, খাঞ্চা অবতারিত হয়নি। আল্লাহর নেয়ামত লাভ করার পর, তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করার মারাত্মক পরিণতির কথা যখন তাদেরকে শুনানো হয়েছিল, তখন হযরত ঈসা (আঃ) এর সঙ্গী-সাথী হাওয়ারীগণ খাঞ্চা প্রার্থনা করার দাবী প্রত্যাহার করেছিল। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা খাঞ্চা আর নাযিল করেননি। ইবনে কাসীর দ্বিতীয় দলের সম্পর্কে লিখেছেন ঃ ঐ দলের বক্তব্যের সমর্থন

পাওয়া যায় এ কারণে যে, খৃষ্ট সমাজে খাঞ্চা অবতরণের কথা সুপরিচিত নয় এবং একথা তাদের কিতাবেও উল্লিখিত নেই। যদি খাঞ্চা অবতারিত হয়ে থাকতো, তবে এটি এমন একটি ঘটনা যার চর্চা আলোচনা বহুল পরিমাণে হওয়ার কারণ ও চাহিদা বিদ্যমান ছিল এবং তাদের কিতাবেও অসংখ্য সূত্রে তার বর্ণনা পাওয়া যেতো। অন্তত সীমাবদ্ধ সূত্রে তো পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা নেই (আল্লাহই ভাল জানেন- বেশী জানেন)।

কতিপয় তাফসীর গ্রন্থ উদাহারণস্বরূপ 'যাদুল মাসীর ইবনে জাওযী'তে আছে যে, হযরত মুজাহিদ (রহঃ) তাবিঈ বলেছেন ঃ হাওয়ারীদেরকে খাঞ্চার ঝলক দেখানো হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল ঃ এরপর আল্লাহর নাফরমানি করলে নিশ্চিতরূপে আযাবের শিকার হতে হবে। ফলে এতবড় ঝুঁকি নিতে তারা রাজি হলোনা। সুতরাং খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়নি।

এ কথার অর্থ এই দাঁড়ালো যে, খাঞ্চা অবতীর্ণ হয়নি এবং আযাব নাযিল হওয়ারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি।

যাহোক উভয় প্রকার কথাই বর্ণিত হয়েছে। যদিও অধিকাংশ মুফাসসির খাঞ্চা অবতরণের কথাকে অগ্রারাধিকার দিয়েছেন।

এতদসত্ত্বেও নিজেদের পক্ষে দলিল উথাপন করতে গিয়ে হাদীসে মরফু (সরাসরি রাসূলের হাদীস) উল্লেখ করার পরিবর্তে তারা কুরআন মজীদ থেকে পরোক্ষভাবে গবেষণা চালিয়েছেন। আর তা হলো এই যে, যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন ঃ

إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ -

"আমি ওটিকে তোমাদের ওপর নাযিল করবো।"

তখন আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার খেলাফ হতে পারেনা। কিন্তু এখানে কুরআনের বর্ণনা ভঙ্গীতে যে শর্ত গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে মূলত এর আসল উদ্দেশ্য ভীতিপ্রদর্শন, সতর্কীকরণ এবং শাস্তিদান ও সন্ত্রস্ত করার হুমকি প্রদান বলে মনে হয়। যাতে করে এরা এমন বেমানান আবদার প্রত্যাহার করে নতুবা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে এ ওয়াদা পূরণ করা আদৌ কঠিন কিছু নয়।

খাঞ্চা অবতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর এ বাণীকে এর পূর্বাপর বর্ণনার সহিত মিলিয়ে দেখা উচিত। হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীগণ তাঁর কাছে দরখাস্ত করেছিলেন, আপনার খোদা আকাশ থেকে আমাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী পূর্ণ একখানা খাঞ্চা অবতরণ করতে পারেন কি? তাদের মনোরঞ্জন ও তৃপ্তিদানের উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন। এর উত্তরে বলা হলো আমার জন্য এ দরখাস্ত মঞ্জুর করা খুবই সহজ।

আমার অসীম ক্ষমতাবলে যখন চাইব এমন খাঞ্চা অবতরণ করে দিবো, কিন্তু তারপর যে না-শোকরী করবে, তাকে এমন শাস্তি দেয়া হবে যার নজির দুনিয়াতে নেই। এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এ দাবী উত্থাপিত হয়েছিল হাওয়ারীদের পক্ষ থেকে,

তারা হাতেগোনা কয়েকজন ব্যক্তি ছিল। তিরমিযি শরীফের রিওয়ায়াত এবং অন্যান্য রিওয়ায়াতসমূহ সম্বন্ধে খাঞ্চা অবতরণের পর তাদের কুফরী আচরণের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাতে এ কথার উল্লেখ নেই যে, কতজন ব্যক্তি কুফর করেছিল।

প্রকাশ্য শব্দ হতে এটা বুঝা যায় যে, সকলেই কিংবা অধিকাংশ লোক এরূপ করে থাকবে এবং তাদেরকে বানর ও শূকর বানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

যদি ব্যাপারটি এরূপই হতো তাহলে খাঞ্চা অবতরণের দিনকে ঈদের দিন বানানো হতে পারতোনা, যা ঈসা (আঃ)-এর দু'আর উদ্দেশ্য ছিল। বরং ওটি হতো শোকদিবস। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গী-সাথীগণ যদি এরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি করে থাকতেন এবং এরূপ শাস্তিযোগ্য হয়ে থাকতেন তাহলে তাদের ঐ ঈমান, দৃঢ়তা এবং বিজয়ের সৌভাগ্য কেমন করে নসীব হলো- যা ইতিহাস থেকে প্রমাণিত। খোদ কুরআনও এর সত্যতা স্বীকার করছে।

আল্লাহ তায়ালা তো অন্যান্য বনী ইসরাঈলের কুফরের মুকাবিলায় হাওয়ারীদের মুসলমান এবং আনছারুল্লাহ হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ - رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ - (آل عمران : ٥٣)

"হাওয়ারীরা জবাব দিলো, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। তুমি সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম, আমরা আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির অবনতকারী। হে আমাদের প্রভু! যে ফরমান তুমি নাযিল করেছো, তা আমরা মেনে নিয়েছি এবং রাসূলের অনুসরণ করতে শুরু করেছি। সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমাদের নাম তুমি লিখে রেখো।" অতপর তিনি বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا أَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيْنَ مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ -

'হে লোকসকল, যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মরয়াম হাওয়ারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলোঃ কে আছো আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা উত্তর দিলোঃ 'আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। তখন বনি ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং অন্য দল বেঈমান রয়ে গেল। অতঃপর আমি ঈমানদার দলকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় সাহায্য করেছিলাম এবং তারাই বিজয়ী হয়েছিলেন।' [তরজমানুল কুরআন, মে-১৯৭৯ ইং]

হযরত উযায়ের কি নবী ছিলেন ?

প্রশ্ন ঃ কিছু সংখ্যক আলেম আজকাল মাওলানা মাওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে নবীদের অবমাননার অভিযোগ খুবই জোরেশোরে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁরা মাওলানার তাফসীর তাফহীমুল কুরআন দ্বিতীয় খন্ডের সূরা তাওবার ২৯ নং টীকা উপস্থাপন করে থাকেন এবং বলেন, এতে হযরত উযায়েরকে জ্যোতিষী বলা হয়েছে। অথচ সকল মুফাসসির তাঁকে নবী হিসেবে গণ্য করে থাকেন। মাওলানার বক্তব্যে একদিকে যেমন তাঁর নবুওয়তকে অস্বীকার করা হয়, অপরদিকে তেমনি তার অবমাননাও করা হয়। এই টীকায় যদিও হযরত উযায়েরকে মুজাহিদ বা সংস্কারক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এ কথাও লেখা হয়েছে যে, হযরত উযায়ের বাইবেলের পূরানো অংশ সংকলন ও শরীয়তের সংস্কার সাধন করেন, তবে হযরত উযায়ের আলাইহিস সালামের নবুওয়তের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

মাওলানার বিরুদ্ধে আরো একটা অভিযোগ করা হয়। সূরা বাকারার যে জায়গায় বলা হয়েছে যে, একটা বিধ্বস্ত ও বিরান জনপদের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় একজন নবী বললেন যে, এই মৃত জনপদকে আল্লাহ কিভাবে পুনরুজ্জীবিত করবেন, আর আল্লাহ তাকে সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেললেন এবং তিনি একশ' বছর মৃত থাকার পর আবার জীবিত হলেন, সেই নবীও হযরত উযায়রই ছিলেন। অথচ মাওলানা মওদূদী এখানেও লেখেননি যে, এই নবী হযরত উযায়ের ছিলেন। অনুগ্রহপূর্বক এসব অভিযোগের সারবত্তা বিশ্লেষণ করবেন এবং হযরত উযায়েরের কথা কুরআনে বা হাদীসে কোথায় কোথায় কি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি নবী ছিলেন কি না জানাবেন।

জবাব ঃ পবিত্র কুরআনের কোনো আয়াত বা কোনো সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, হযরত উযায়ের নবী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে উযায়ের শব্দটা শুধুমাত্র সূরা তাওবার ৩০তম আয়াতে এসেছে। এর আগে সূরা বাকারার ২৫৯তম আয়াতে যে ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার সম্পর্কিত কতক মুফাসসিরের বক্তব্য এই যে,

এখানে হযরত উযায়েরকেই বুঝানো হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে ঐ স্থানে কোনো নামেরও উল্লেখ নেই, তিনি নবী ছিলেন কি না সে কথাও বলা হয়নি। কুরআনে যে কথাটা বলা হয়ছে তা হলো ঃ

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ -

'অথবা উদাহরণ স্বরূপ সেই ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য কর যে, একটি জনপদের ভেতর দিয়ে গিয়েছিল'

রসূল (সঃ) এর কোনো উক্তিও এমন নেই, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতে একজন নবীর কথাই বলা হয়েছে এবং হযরত উযায়েরই সেই নবী। এই ব্যক্তির নাম ও নবুওয়ত নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে যে মতভেদ, তার কারণ এটাই। তাফসীর গ্রন্থসমূহে তার নাম কোথাও উযায়ের, কোথাও আরমিয়া বিন হালকিয়া, কোথাও খিজির, কোথাও হিযকীল ইত্যাদি বর্ণিত আছে। আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র "বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি" বলেই ক্ষান্ত থেকেছেন। তাছাড়া যেসব মনীষী তাঁর নাম উযায়ের লিখেছেন, তাঁদেরও কেউ কেউ লিখেছেন যে, ইনি ইহুদী জাতির একজন বিদ্বান ব্যক্তি ও সংস্কারক ছিলেন-নবী ছিলেননা। যেমন আল্লামা নিযামুদ্দীন নিশাপুরী স্বীয় "গারায়িবুল কুরআন ওয়া রাগায়িবুল ফুরকান" নামক তাফসীর গ্রন্থে সূরা বাকারার এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে উপরোক্ত নামসমূহ ও উক্তিসমূহ উদ্ধৃত করার পর বলেন ঃ

روى عن ابن عباس ان بختنصر غزا بنى اسرائيل فسبى منهم الكثير و منهم عزير وكان من علمائهم -

"হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, বুখতে নাসার বনী ইসরাঈল জাতির ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের বিরাট সংখ্যক লোককে বন্দী করে। এদের ভেতরে হযরত উযায়েরও ছিলেন। ইনি বনী ইসরাঈল জাতির একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন।"

মোট কথা, পবিত্র কুরআনে যে ব্যক্তির উদাহরণ দেয়া হয়েছে তার সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যায়না যে, তিনি আল্লাহর একজন নবী ছিলেন এবং তার নাম উযায়ের ছিল। এই আয়াতের পরবর্তী অংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে একশ' বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় যে, আল্লার দীনের প্রচারকার্যে নিয়োজিত একজন নবীর ওপর এত দীর্ঘকালব্যাপী এমন অবস্থা চাপানো থাকবে যা প্রচারকার্য চালানোর অন্তরায়। এ জন্যই ইমাম ইবনে জারীর এই সমস্ত নাম উল্লেখ করার পর বলেন যে, "এই ব্যক্তির নাম জানার আমাদের দরকার নেই।" তাছাড়া পবিত্র কুরআনের বর্ণনা রীতির দাবীও এই যে,

এতে একবার যে ব্যক্তির নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, তিনি যদি নবী হন, তবে অন্য কোথাও তাঁর নাম এমন অনির্দিষ্টভাবে আসার কথা নয়; যেমন সূরা বাকারার এই আয়াতে এসেছে।

সূরা তাওবার ৩০ নং আয়াতে হযরত উযায়েরের নাম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ

"আর ইহুদীরা বললো ঃ উযায়ের আল্লাহর পুত্র"

এখানেও হযরত উযায়েরের নবী হওয়ার উল্লেখ নেই। কেবল ইহুদীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। মাওলানা মওদূদী (রহঃ) এ আয়াতের যে টীকা লিখেছেন, তাতেও তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বলেননি বরং শুধু এ কথাই বলেছেন যে, ইহুদীরা তাদেরকে নিজেদের ধর্মের সংস্কারক বলে স্বীকার করে। ইসরাঈলী-ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ব্যাবিলনে বন্দী থাকাকালে এই উযায়েরই তাওরাতকে নতুন করে সাজিয়ে লিখেছিলেন এবং শরীয়তের সংস্কার সাধন করেছিলেন। মাওলানা তাঁর এই টীকায় "কাহেন" শব্দটি (সর্বাধিক প্রচলিত অর্থ জ্যোতিষী) ব্যবহার করলেও তার দ্বারা কোনো নিন্দা বা অবমাননা বুঝায়না। খোদ্ বাইবেলেও তাকে "আযরা কাহেন" বলে অভিহিত করা হয়েছে। 'কাহেন' ইহুদী ধর্মের একটি পরিভাষা, যা Priest বা যাজক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা তাদের সমাজে একটি পবিত্র ধর্মীয় পদবী। মাওলানা যে কথাটা বলতে চেয়েছেন তা এই যে, উযায়ের তাদের কাছে একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে পরিচিত থাকলেও পরবর্তীকালে তাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে নেয়া হয়েছে। আরবী অভিধানে "কাহেন" শব্দটির সাত আটটা অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটা অর্থ এমন যে, তার সাথে নিন্দনীয় কোনো দিক মোটেই যুক্ত নেই। তাফহীমুল কুরআনের টীকার পূর্বাপর বিবরণ ও বাচনভংগী স্পষ্টতই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এখানে এ শব্দটি কোনো খারাপ অর্থে নয় বরং ভালো ও প্রশংসনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী যদিও হযরত উযায়েরের নবুওয়ত সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো কিছু লেখা থেকে সংগতভাবেই বিরত থেকেছেন, কিন্তু তিনি আলোচ্য স্থানেই শুধু নয় বরং আরো একটি স্থানে (তাফহীমুল কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ৮ নং টীকায়) হযরত উযায়েরের নিম্নরূপ প্রশংসা করেছেন ঃ

"হযরত উযায়ের হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়ত সংস্কারের বিরাট কাজ সমাধা করেন। তিনি ইহুদী জাতির সমস্ত সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদেরকে সকল জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এনে একটা সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তাওরাতসহ বাইবেলের ৫ খানা পুস্তককে সংকলন ও প্রকাশ করেন। শরীয়তের আইন চালু করে বনী ইসরাঈল জাতির অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করা বিজাতীয় নৈতিক অনাচারগুলোর উচ্ছেদ ঘটানো আরম্ভ করেন। ইহুদীরা যে সব মোশরেক মহিলাকে বিয়ে করেছিল, তাদেরকে তালাক দিতে বাধ্য করেন এবং বনী ইসরাঈল থেকে নতুন করে আল্লাহর দাসত্ব ও তার আইনের আনুগত্য করার অংগীকার আদায় করেন।"

হযরত উযায়েরের এত সব কৃতিত্বপূর্ণ সংস্কার ও সংশোধনের উল্লেখ করার পরও কেউ যদি বলে যে, তাফহীমুল কুরআনে হযরত উযায়েরের প্রতি অবমাননা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয়েছে, তবে তার কথা কোনোক্রমেই কর্ণপাত করার যোগ্য নয়। সর্বশেষে আমি আবু দাউদ শরীফের কিতাবুস সুন্নাহ্ থেকে রসূল (সঃ)-এর একটি উক্তি পেশ করছি ঃ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى أتُبَّعٌ لَعِيْنٌ هو ام لا وما ادرى أعُزَيرٌ نبى هو ام لا -

"হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত যে, রসূল (সঃ) বলেছেন, (হিময়ার গোত্রের প্রথম রাজা) তুব্বা অভিশাপযোগ্য কিনা তা আমি জানিনা এবং উযায়ের নবী ছিলেন কিনা তাও আমি জানিনা।"

রসূল (সঃ)-এর এই উক্তির মর্মার্থ এই যে, সাবা জাতির যে শাখাটি ইয়ামানে চারশ' বছর রাজত্ব করেছে, তা পরবর্তীকালে যদিও অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল (যেমন কুরআনে এ কথা খোলাখুলিভাবেই বলা হয়েছে) কিন্তু যে ব্যক্তি তুব্বা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিল, সেও অপরাধী ও অভিশপ্ত ছিল কিনা তা জানা নেই। রসূল (সা) এ কথাও বলেছেন যে, যে উযায়েরকে ইহুদীরা আল্লাহর পুত্র বলতো, তিনি নবী ছিলেন কিনা তা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনা। রসূল (সঃ)-এর এ উক্তি মূলতঃ অকাট্য ও চূড়ান্ত। সুতরাং হযরত উযায়েরের নবী হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্নে কুরআন ও হাদীস যখন নিরব, তখন তার নবুওয়ত মানতে অন্যদেরকে বাধ্য করার অধিকার কারোই নেই। (তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৭০)

হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক কিবতী হত্যা

প্রশ্ন ঃ কিছু সংখ্যক আলেম মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত কোন না কোনো অভিযোগ তোলেন এবং নিজেদের বক্তৃতায় তার ক্রমাগত প্রচারণা চালাতে থাকেন। এসব অভিযোগের মধ্যে একটি হচ্ছে রাসায়েল ও মাসায়েল প্রথম খন্ডে "নবীদের নিষ্পাপত্ব" শিরোনামে লেখা একটা বক্তব্য, সেখানে বলা হয়েছে, 'নবী হওয়ার আগে হযরত মূসাও একটা বিরাট গুনাহর কাজ করে বসেছিলেন। তিনি একজন মানুষকে হত্যা করেছিলেন। ফেরআউন যখন এ কাজটির জন্য তাকে তিরস্কার করলো, তখন তিনি প্রকাশ্য দরবারে এই বলে স্বীকারোক্তি করলেন যে, এ কাজটি যখন আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, সে সময় পর্যন্ত আমার কাছে সত্য ও ন্যায়ের পথ সুস্পষ্ট হয়নি।'

উপরোক্ত বক্তব্য নিয়ে যারা আপত্তি তোলেন তারা বলতে চান, হযরত মূসা যে

ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, সে ছিল ফিরআউনের গোত্রের একজন কাফের এবং সে মুসলিম জনগোষ্ঠির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। তাকে হত্যা করা শুধু বৈধ নয় বরং পূণ্যের কাজ ছিল। কারণ ফেরআউনের পক্ষের লোকটি ছিল বলবান এবং ইসরাঈলী লোকটি ছিল দূর্বল। তাই তাকে সাহায্য করা জরুরী ছিল। তাছাড়া তাকে হত্যা করা হযরত মূসার অভিপ্রায় ছিলনা, তাই তা গুনাহর কাজ ছিলনা। একজন নিরপরাধ মজলুমের সাহায্য করা কোন গুনাহর কাজ নয়। একজন আলেম মাওলানা মওদূদীর এ কথাকে ভ্রান্ত আখ্যায়িত করেছেন যে, হযরত মূসার এ কাজটি নবুওয়ত লাভের আগের ব্যাপার ছিল। তিনি সূরা ক্বাসাসের ২য় রুকুর বরাত দিয়েছেন। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, হযরত মূসা একজন শক্ত সমর্থ ও পরিপক্ক বয়সের মানুষ হওয়ার পরই আল্লাহ তাকে নবুওয়ত দান করেন। তারপর তিনি নগরীতে প্রবেশ করার সময় দেখলেন দুই ব্যক্তি মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে। নবুওয়তের পর নবীর কোনো কাজকে গুনাহর কাজ বলে অভিহিত করা যায়না। অনুগ্রহপূর্বক এই আপত্তির সন্তোষজনক জবাব দেবেন আর এ কাজটা নবুওয়তের পূর্বের না পরের, এটি কি ধরনের কাজ ছিল এবং এর তাৎপর্য কি বিশ্লেষণ করবেন।"

মাওলানা মওদূদীর আরো একটি উক্তি নিয়ে আলেমদের একাংশ বিশেষতঃ দেওবন্দী আলেমগণ প্রতিবাদমুখর। তিনি বলেছেন, "নবীর নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, ফেরেশতাদের মত তার কাছ থেকেও গুনাহ করার ক্ষমতাই ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, বরং নিষ্পাপ হওয়ার আসল তাৎপর্য এই যে, নবী প্রথমতঃ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে আল্লাহর নাফরমানী করেননা, আর যদি তাঁর দ্বারা কোনো ত্রুটি সংঘটিত হয়েই যায়, তবে আল্লাহ তাঁকে সেই ভুল কাজের ওপর বহাল থাকতে দেননা।" উল্লেখিত আলেমগণ মাওলানার এই উক্তির ওপর আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, নবীগণ ফেরেশতাদের তুলনায় সকল দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। তাই ফেরেশতাদের তুলনায় নবীদেরকে নিম্নমানের বা ভিন্ন ধরনের নিষ্পাপ বলাটা তাদের অবমাননারই শামিল। এই আপত্তির সঠিকতার ওপর আলোকপাত করলে ভালো হয়।"

জবাব ঃ হযরত মূসার (আঃ) হাতে যে একজন কিবতী খুন হয়েছিল, সে কথা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে। এখন যদি এই হত্যাকান্ডকে হালকা করার জন্য এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, এটা ইচ্ছাকৃত হত্যাকান্ড ছিলনা, নিহত ব্যক্তি কাফের, জালেম ও আগ্রাসী ছিল, তাই তাকে খুন করা কোনোভাবেই অবৈধ ছিলনা, আর এ কারণে এ কাজটা মোটেই গুনাহর কাজ ছিলনা, তাহলে এ যুক্তি বিভিন্ন কারণে আপত্তিকর।

পবিত্র কুরআনে এ ঘটনার যে বিশদ রিবরণ দেয়া হয়েছে এবং এজন্য যে বর্ণনাভংগী ব্যবহৃত হয়েছে, তাতে এ ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়না যে, এ কাজটা গুনাহর কাজ ছিলনা বরং নিছক একটা অশোভন কাজ ছিল। কুরআনে স্বয়ং হযরত মূসা

(আঃ)-এর পক্ষ থেকে এ কাজটিকে গুনাহ বলে স্বীকার করা হয়েছে। সুরা শোয়ারায় বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মূসাকে ফেরআউনের জাতির কাছে পাঠাতে চাইলেন, তখন তিনি আশংকা প্রকাশ করলেন যে, তারা হয়তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাই আপনি আমার সাথে হারুনকে রসূল করে পাঠান। এই সাথে হযরত মূসা এ কথাও বলেন ঃ

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ -(الشعراء : ١٤)

"আমার ওপর তাদের একটা গুনাহর অভিযোগ রয়েছে। সেজন্য আমার আশংকা হয় যে, তারা আমাকে মেরে ফেলবে।" (শোয়ারা-১৪০)

এর অর্থ এই যে, হযরত মূসাও এটিকে এমন কাজ মনে করতেন, যা তাকে প্রত্যাখ্যান বা হত্যা করার কারণ হতে পারতো। এমনকি এর কারণে তিনি নবুওয়তের দায়িত্ব গ্রহণেও দ্বিধান্বিত ছিলেন। এরপর আল্লাহ হযরত হারুন (আঃ)কে তার সহকারী ও উপদেষ্টা নিয়োগ করেন এবং উভয়কে ফিরআউনের কাছে পাঠান। ফিরআউন তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে প্রথমতঃ এই বলে খোটা দিল যে, তুমি আমাদের এখানেই লালিত পালিত হয়েছ। দ্বিতীয় আপত্তি তুললো এই বলে যে, তুমি আমাদের লোককে হত্যা করে নেমকহারামী করেছ। হযরত মূসা (আঃ) প্রথম আপত্তির জবাবে বললেন যে, তোমার উপকার কি এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ? দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে তিনি এ কথা বলেননি যে, এই লোকটির হত্যা বৈধ ও জায়েয ছিল এবং তাতে আমার কোন দায়-দায়িত্ব ছিলনা। বরঞ্চ তিনি বললেন ঃ

فَعَلْتُهَا إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ -

"আমি এ কাজটি যখন করেছিলাম তখন বিপথগামী ছিলাম।"

নিহত লোকটি আগ্রাসী কাফের ছিল ও তাকে হত্যা করা বৈধ ছিল-এই যুক্তি কোনো কোনো আলেম যদিও তুলে ধরেছেন, কিন্তু এটা একটা দূর্বল যুক্তি। কারণ প্রথমতঃ সে আমলে কোনো দারুল ইসলাম বা ইসলামী রাষ্ট্র ও দারুল হারব বা ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণরত কাফের রাষ্ট্র ছিলনা। আর হযরত মূসাও কোনো দারুল ইসলাম থেকে সাময়িকভাবে দারুল হারবে উপনীত হননি যে, যাকে ইচ্ছা হত্যা করবেন। তিনি এবং তাঁর জাতি মিসরেই বসবাসরত ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন তাফসীরের অভিমত এমনকি সহীহ ও বিশ্বস্ত হাদীস থেকেও জানা যায় যে, এ হত্যাকান্ডটি হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্য নিষিদ্ধ ছিল। হযরত মূসা (আঃ) নবুওয়তের আগেও হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তার উত্তরসূরীদের শরীয়তের অনুসারী ছিলেন এবং দেশের প্রচলিত আইনও কিছু না কিছু মানতে বাধ্য ছিলেন। তাই হত্যাকান্ড, চাই তা অনিচ্ছাকৃতই হোক না কেন, অবশ্যই অবৈধ থাকার কথা। তিনি হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিলেননা এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু উত্তেজনার তীব্রতায় এমন সাংঘাতিক ঘুষি

লাগিয়ে দিয়েছিলেন যে, সেটা প্রাণঘাতী প্রমাণ হয়। কোনো কোনো তাফসীরকার উল্লেখিত আয়াতে হযরত মূসার "বিপথগামী ছিলাম" কথার অর্থ করেছেন "ক্রোধে ও আক্রোশে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ তিনি এত বেশী রাগান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন যে, নিজেকে সামাল দিতে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি।

সূরা ক্বাসাসে এ ঘটনার আরো কিছু খুঁটিনাটি বিবরণ রয়েছে। সে বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দু'জন লোক মারামারি করছিল, তাদের একজন ইসরাঈলী এবং অপরজন কিবতী ছিল। ইসরাঈলী লোকটি হযরত মূসার (আঃ) কাছে সাহায্য চায়। তাই হযরত মূসা (আঃ) কিবতীকে এমন ঘুষি লাগিয়ে দেন যে, তাতেই সে খতম হয়ে যায়। এরপর কুরআনে বলা হয়েছেঃ

قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ـ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ـ (القصص : ١٥ – ١٦)

"মূসা বললো, এতো শয়তানের কাজ। শয়তান প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী শত্রু। সে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি। আমাকে মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলেন। তিনিই ক্ষমাকারী, দয়ালু।" (ক্বাসাস-১৫-১৬)

এখন হত্যাকান্ডটা যদি বৈধ হতো, তাহলে তাকে শয়তানের কাজ বলা, নিজের ওপর জুলুম করার শামিল বলে আখ্যায়িত করা, আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া এবং আল্লাহ কর্তৃক তা মাফ করে দেয়ার অবকাশ আসে কোত্থেকে? জুলুম ও বিপথগামীতা যেনতেন শব্দ নয় যে, কোনো মামুলী ঘটনার জন্য কুরআনে তা ব্যবহৃত হবে।

এ আয়াত কয়টির তাফসীর করতে গিয়ে ইবনে জারির হযরত সাঈ'দ ইবনে জুবায়েরের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اساء موسٰى حيث اساء وهو شديد الغضب شديد القوّة ـ

"হযরত মূসার দ্বারা যখন এই অপকর্মটি সংঘটিত হয়, তখন তিনি অতিমাত্রায় ক্রোধান্বিত ও অতিশয় শক্তিশালী ছিলেন।"

"হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি" এই বাক্যটির ব্যাখ্যা প্রসংগে ইবনে জারির বলেন, "যাকে হত্যা করতে তুমি আদেশ দাওনি, তাকে হত্যা করে আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি, কাজেই তুমি আমার গুনাহ মাফ করে দাও। গুনাহকে গোপন রাখ এবং এর জন্য আমাকে জবাবদিহীর সম্মুখীন করোনা ও শাস্তি দিও

না।"

এই ব্যাখ্যার সপক্ষে ইবনে জারির ইবনে জুরাইজের এই উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন যে, "শরীয়তের নির্দেশ ব্যতীত হত্যা জায়েয ছিলনা এবং হযরত মূসাকে এ কাজ করার আদেশ দেয়া হয়নি। তাছাড়া এটাও সত্য কথা যে, যে ইসরাঈলীর সমর্থনে হযরত মূসা (আঃ) কিবতীকে হত্যা করলেন, সেও কোনো ভালো লোক ছিলনা। বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে মুকাতিলের এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই লোকটি ইসরাঈলী বংশোদ্ভূত হলেও কাফের ছিল। আল্লামা নিশাপুরী স্বীয় তাফসীর গারায়িবুল কুরআনে সূরা ক্বাসাসের এই স্থানে লিখেছেন ঃ

"মুকাতেল থেকে বর্ণিত আছে যে, সংঘর্ষে লিপ্ত উভয় ব্যক্তি কাফের ছিল, তবে একজন কিবতী ও অপরজন বনী ইসরাঈল বংশোদ্ভূত ছিল।"

ইবনে জুযীও স্বীয় তাফসীর যাদুল মাছীরে এই আয়াত কয়টির ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কাউকে হত্যা করা হযরত মূসার (আঃ) জন্য সমীচীন ছিলনা। বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ এই ইবনে জুযী ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "যে ইসরাঈলীকে হযরত মূসা (আঃ) সাহায্য করেছিলেন সে কাফের ছিল।"

এই বক্তব্যকে যদি সঠিক মনে না করা হয় এবং এই ইসরাঈলীকে মুসলমানও ধরে নেয়া হয়, তাহলেও কুরআনের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, লোকটি ছিল অত্যন্ত ঝগড়াটে ও রগচটা ধরনের। কেননা তার পেছনে একজন মানুষ নিহত হলো-এটা দেখেও সে পরের দিন আর এক কিবতীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। সে হযরত মূসা (আঃ)কে দেখেই পুনরায় তাকে সাহায্যের জন্য ডাকে। এর জবাবে হযরত মূসা (আঃ) বলেন ঃ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ -

"তুমি নিশ্চয়ই একটা বিপথগামী লোক।"

এরপর লোকটি আরো একটি বিশ্রী কান্ড করে বসলো। হযরত মূসা (আঃ) যখন তার কিবতী প্রতিপক্ষকে ধরতে গেলেন, তখন এই ইসরাঈলী ভাবলো যে, উনি বোধ হয় তাকেই মারতে আসছেন। তাই সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, "হে মূসা! তুমি কাল যেমন একজনকে হত্যা করেছ, আজ তেমনি আমাকেও হত্যা করতে চাও নাকি? তুমি তো দেখছি, পৃথিবীতে গায়ের জোর খাটিয়েই জীবনযাপন করতে চাও এবং সংস্কার ও সংশোধনের কোনো ইচ্ছা তোমার নেই।" অর্থাৎ কিনা, এই লোকটি উপকারের বদলা এভাবে দিল যে, যে ব্যক্তি তার উপকার করেছে, তাকে প্রকাশ্যে হত্যাকারী বলে ফেরআউন ও তার দলবলের কাছে চিহ্নিত করে দিল এবং হযরত মূসা যাতে গ্রেফতার কিংবা নিহত হন, তার ব্যবস্থা করে দিল। এটা আলাদা কথা যে, হযরত মূসার (আঃ) ওপর আর কোনো বিপদের খড়গ নেমে আসুক তা আল্লাহ চাননি, তাই তিনি তার অন্য এক বান্দাকে পাঠালেন। এই নতুন আগন্তুক হযরত মূসাকে সতর্ক করলো এবং দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিল।

হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, কিবতীকে হত্যা করা বৈধ ছিলনা। মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য গ্রন্থে শাফায়াত সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন যখন লোকেরা শাফায়াতের জন্য হযরত মূসার (আঃ) কাছে যাবে, তখন তিনি বলবেন ঃ

ان ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وانّى قتلت نفسًا لم اومر بقتلها -

"আমার প্রতিপালক আজ এত অসন্তুষ্ট যা তিনি আগে কখনো হননি এবং পরেও কখনো হবেননা। আমি একটি প্রাণকে হত্যা করেছি। অথচ তা করার কোনো নির্দেশ আমার প্রতি ছিলনা।"

এ হাদীসের আলোকে এটা সুস্পষ্ট যে, নবুওয়তের আগে হযরত মূসা (আঃ) যে শরীয়তের অনুসারী ছিলেন, সে শরীয়তেও এই ব্যক্তির হত্যা বৈধ ছিলনা। সুতরাং তাকে হারবী অর্থাৎ বৈরী অমুসলিম আখ্যায়িত করে হত্যা করা বৈধ বা সওয়াবের কাজ ভাবা ঠিক হতে পারেনা।

হত্যাকান্ডটা হযরত মূসার নবুওয়ত লাভের পরের ঘটনা-এ ধারণাও সঠিক নয়। সূরা ক্বাসাসের দ্বিতীয় রুকু পড়তে গিয়ে বাহ্যত এরূপ মনে হয় যে, হযরত মূসাকে (আঃ) প্রথম "ইল্‌ম ও হুক্‌ম" দান করা হয় এবং পরে এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনায় যে ঘটনার ধারাবাহিকতার উল্লেখ পাওয়া যায়, তা কালগত ধারাবাহিকতা নয় বরং বর্ণনাগত ধারাবাহিকতা মাত্র। অথবা এও বলা চলে যে, "হুক্‌ম ও ইল্‌ম" শব্দ দুটি দ্বারা নবুওয়ত নয় বরং নেতাসুলভ যোগ্যতা ও প্রজ্ঞা বুঝানো হয়েছে। এ জিনিসটা তিনি নবুওয়তের আগেই ফেরআউনের রাজপ্রাসাদে একজন রাজপুত্রের মত লালিত পালিত হবার সময় অর্জন করেছিলেন। সূরা মারিয়ামের শুরুতেও এরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, প্রথম হযরত ইয়াহিয়াকে কিতাব দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে যে, আমি তাকে বাল্যকালেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছি। নচেৎ এই মর্মে তো কুরআন ও হাদীসের একাধিক স্পষ্টোক্তি রয়েছে যে, হযরত মূসা (আঃ) নবুওয়ত লাভ করেন মিসর থেকে পালিয়ে যাওয়ার কয়েক বছর পর-যখন তার বিয়েও সম্পন্ন হয়েছে এবং তিনি সপরিবারে মিসরে ফিরে যাচ্ছিলেন। সূরা শোয়ারাতেই হযরত মূসার (আঃ) এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হত্যাকান্ডের পর যখন আমি তোমাদের ভয়ে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম, তখন আল্লাহ আমাকে "হুকুম" (সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা) দান করলেন এবং রসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

ফেরেশতা ও নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী এ জায়গায় যা

কিছু লিখেছেন, সংক্ষিপ্ত হলেও কুরআন, সুন্নাহ এবং সুন্নী আলেমগণের মতামতের সাথে তার হুবহু মিল রয়েছে। আমি এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করি না। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব স্বীয় গ্রন্থ "মাওলানা মওদূদী পর ইতিরাযাত কা ইল্‌মী জায়েযা" প্রথম খন্ডে (৪৪ থেকে ৯২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) এ বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন, তা একেবারেই যথেষ্ট। তথাপি দেওবন্দী আলেমগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে আমি এখানে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর একটা জবাব উদ্ধৃত করছি। গাংগুহে অবস্থিত আশ্রাফুল উলূম মাদ্রাসার জনৈক মাওলানা আবদুল হামীদ সাহেবের নামে তিনি এ জবাবটি পাঠিয়েছিলেন এবং তা মাওলানা মাদানী মরহুমের গ্রন্থ "মাকতুবাত" দ্বিতীয় খন্ডের ৩৮২-৩৮৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রয়েছে। তিনি নবীদের (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

"তাঁরা ফেরেশতাগণের ন্যায় মানবীয় আবেগ অনুভূতি ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা থেকে মুক্ত থাকেননা। তবে নবীগণের মধ্যে সৎ প্রবণতা ও আল্লাহভীরুতা এত প্রবল থাকে এবং আল্লাহর সার্বক্ষণিক উপস্থিতির অনুভূতি এতটা জাগ্রত থাকে যে, তার কারণে সৎ কর্মের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ এবং অসৎ কর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিরাগ সদাসর্বদা সক্রিয় থাকে। যদি কখনো স্বভাবসুলভ তাড়না কিংবা শয়তানের কুপ্ররোচণার প্রভাবে কোনো পাপ কাজের প্রতি ঝোক সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর প্রত্যক্ষ সংরক্ষণ ও তদারকি বাধার সৃষ্টি করে ও মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এই বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকেই ইসমাত বা নিষ্পাপত্ব বলা হয়। কিন্তু ফেরেশতাদের নিষ্পাপত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কেননা তাদের মধ্যে আদৌ কোনো প্রবৃত্তির লালসা বা কামনা-বাসনাই থাকেনা। শিশু ও নপুংশকের মধ্যে যেমন স্ত্রী সংগমের ক্ষমতাই থাকেনা এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কোনো আকর্ষণই থাকেনা, ফেরেশতাদের নিষ্পাপ হওয়াটা ঠিক তদ্রুপ। তাই তাদেরকে মাসুম বা নিষ্পাপ বলা প্রকৃত অর্থবোধক নয় বরং রূপক অর্থবোধক।" [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৭০]

'আবুল আ'লা নামে আপত্তি

প্রশ্ন ঃ মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত বহু অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দেয়া হয়েছে। তবে একটা আপত্তি এখনো বাকী রয়েছে। এর কোনো বিস্তারিত ও যুক্তিনিষ্ঠ জবাব আজ পর্যন্ত দেয়া হয়নি কিংবা দেয়া দরকার বা সমীচীন মনে করা হয়নি। অথচ এটা একটা বাস্তব ঘটনা যে, দীর্ঘদিন ধরে এ আপত্তি বারবার তোলা হচ্ছে। মাওলানার নামের ওপর এই আপত্তি তোলা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, 'আল-আ'লা' তো আল্লাহর নাম। এভাবে আবুল আ'লার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর পিতা। (নাউযুবিল্লাহ!) সরলমতি জনগণকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে যখন কিছু লোক এ আপত্তি তোলে, তারপর অপব্যাখ্যা ও উস্কানিমূলক ভংগিমায় তা নিয়ে জনসমক্ষে নর্তনকুর্দন করা হয়, তখন জনগণ কি নিদারুণভাবে বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য।

যারা এতসব কিছুর পরও সুধারণা পোষণ করে, তারাও আমাদের কাছে দাবী জানায় যে, এ আপত্তি ভুল হলে এর ভ্রান্তি অকাট্যভাবে তুলে ধরা হয়না কেন? এতে তো এই বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারণার অবসান ঘটতে পারে।

প্রসঙ্গত এ কথাটাও স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, আবুল আ'লা কি মাওলানা মওদূদীর আসল নাম, না তিনি নিজে তাঁর এই উপনাম রেখে নিয়েছেন? এতে যদি কোনো ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির বা আপত্তি ওঠার অবকাশ থেকে থাকে, তাহলে এটা কি পরিবর্তন করা ভালো নয়? স্বয়ং রসূল (সঃ) যখন বিভিন্ন নাম পরিবর্তন করেছেন এবং কোনো কোনো উপনামও (কুনিয়াত) অপছন্দ করেছেন, তখন আমাদের তা করতে অসুবিধা কি? কেউ কেউ বলেন যে, এ নাম যদি আপত্তিকর নাও হয়, তবুও এর তেমন কোনো তাৎপর্য বোঝা যায়না। মাসিক তরজমানুল কুরআনে এই সকল দিক সামনে রেখে এ ধরনের সকল আপত্তির জবাব একবার দিয়ে দিলে জনসাধারণের মন থেকে সকল ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটতে পারে। নচেৎ এ ধরনের উস্কানির অভিযান অব্যাহত থাকলে তার পরিণাম ভয়ংকর হতে পারে। সাম্প্রতিককালের কিছু ঘটনায় এ কথার যথার্থতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জবাব ঃ কোনো শিক্ষিত ও যুক্তিগ্রাহী মানুষের কাছ থেকে এটা আশা করা যায়না যে, সে মানুষের নাম সম্পর্কে অনর্থক আপত্তি তুলবে অথবা সুস্থ মস্তিষ্কের এ জাতীয় আপত্তিকে বিবেচনার যোগ্য মনে করবে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কিছু কিছু অজ্ঞ লোক নিজেদের লেখায় ও বক্তৃতায় অন্যান্য আপত্তিসমূহের পাশাপাশি নাম সম্পর্কেও আপত্তি তোলার এক অভিযান শুরু করেছে। এভাবে সরলমতি জনসাধারণকে এ কথা বিশ্বাস করানোর চেষ্টা চলছে যে, আ'লা অর্থ আল্লাহ। তাই যে ব্যক্তির নাম আবুল আ'লা, সে নিজেকে আল্লাহর পিতা বলে দাবী করছে, (নাউযুবিল্লাহ)। এটি এমন এক ঘৃণ্য তৎপরতা যে, আজ পর্যন্ত আমরা একে বিবেচনার মধ্যেই আনিনি। আমরা সুক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের ওপর আস্থা রেখেছিলাম যে, তারা নিজেরাই এই অপকর্মকে ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে যে, এই নামের প্রকৃত তাৎপর্য যথাযথভাবে স্পষ্ট করে দেয়া সমীচীন মনে হচ্ছে, যাতে আপত্তিকারীদের অজ্ঞতা, দূরভিসন্ধি নস্যাৎ করে দেয়া যায়।

সর্বপ্রথম যে কথাটা জানানো প্রয়োজন তা হলো এই যে, আবুল আ'লা কোনো উপনাম নয়, বরং মাতাপিতার রাখা মূল নাম। মওদূদী পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হযরত আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) এর নামে এই নাম রাখা হয়েছে। ৯৩৫ হিজরীতে ওফাতপ্রাপ্ত এই মহাপুরুষ সিকান্দার লোদীর শাসনামলে চিশ্‌ত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ভারতে এসেছিলেন। তিনি ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত মহাপুরুষদের একটি প্রখ্যাত ধারার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। নিজে তো একজন বড় আলেম ছিলেনই, তদুপরি তাঁর যুগে আলেম ও পরহেজগার ব্যক্তিবর্গের প্রাচুর্যও ছিল। এ নামটিতে যদি আপত্তিকর কিছু থাকতো, তাহলে সে যুগের আলেমগণ ও সুফী সাধকগণ আপত্তি তুলতেন এবং

পরবর্তীকালে এই নাম ঐ পরিবারে আর কখনো রাখা হতোনা। তথাপি বিষয়টির পর্যালোচনা এখনো করা যেতে পারে যে, বাস্তবিকই আ'লা আল্লাহ তায়ালার সুন্দরতম নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত কিনা এবং আবুল আ'লা নাম রাখা জায়েয কিনা?

হাদীসে আল্লাহ তায়ালার ৯৯টি নাম রয়েছে বলে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে এবং হাদীসেও তা বর্ণিত আছে। তিরমিজী শরীফের কিতাবুদ্ দাওয়াত নামক অধ্যায়ে এ ধরনের সকল হাদীস একত্রিত করা হয়েছে। এসব হাদীসের একটি হযরত আবু হুয়াররা কর্তৃক বর্ণিত।

এ হাদীসে পুরো ৯৯টি নামের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তার ভেতরে আ'লা নামটি নেই। ইবনে মাজার কিতাবুদ দুয়ার মধ্যে আল্লাহ নামের বিবরণ সম্বলিত আবু হুয়াররা বর্ণিত হাদীসেও 'আল-আ'লা' নামটি নেই। কুরআন শরীফে রবের বিশেষণ হিসাবে 'আল-আ'লা' এসেছে বটে, কিন্তু একাকী শুধু 'আ'লা' শব্দটিকে আল্লাহর সুন্দরতম গুণবাচক নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। শুধুমাত্র 'আল-আ'লা' শব্দ তো আল্লাহর নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ইনি, এমনকি আলী বা আল-আলী শব্দদ্বয়ও একাকীভাবে আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন

قوماً عالين جنة عالية عاليها سافلها

ইত্যাদি। আ'লা শব্দটা আলীরই তুলনাবাচক পদ। আলী অর্থ উঁচু আর আ'লা অর্থ অপেক্ষাকৃত উঁচু বা সর্বোচ্চ। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধু আলা বা আ'ল আ'লা শব্দ বলে তা দ্বারা আল্লাহ তায়ালাকে বুঝাতে চায় এবং এ শব্দটি আল্লাহর নামের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করে, সে একেবারেই একটা অযৌক্তিক ও দলিল প্রমাণবিহীন দাবী করে। কেননা কুরআন ও হাদীসে কোথাও শুধুমাত্র আল-আ'লা বলে আল্লাহ তায়ালাকে বুঝানো হয়নি।

তথাপি যেহেতু কোনো কোনো আলিমের মতে আল্লাহর সুন্দরতম নাম ৯৯টিতে সীমাবদ্ধ নয়। তাই আল আলী বা আল আ'লাকে যদি আল্লাহর গুণবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়াও হয়, তবুও এ নাম বা শব্দ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বেলায় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে স্বয়ং হযরত মূসা (আঃ) কে বলেন,

لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى

"অর্থাৎ তুমি ভয় পেওনা-তুমিই শ্রেষ্ঠ।" (তাহা-৬৮) মুমিনদেরকে বলেন ঃ

وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ-

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।" (আল ইমরান-১৩৯)।

তিনি আরো বলেন ঃ

وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ -

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন।" (মুহাম্মদ-৩৫)।

হাদীসে আল্লাহ তায়ালার আসমায়ে হুসনা বা সুন্দরতম নামসমূহের যে বিবরণ রয়েছে তাতে মাত্র কয়েকটি নাম ওলামা ও মুহাদ্দিসগণের মতে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য তা ব্যবহার করা যায়না। সেই নাম ক'টি হলো আল্লাহ, আররহমান, আস্‌সাব্বুহ, আল কুদ্দুস। এগুলো ছাড়া বাদবাকী প্রায় সব ক'টি গুণবাচক নামই আল্লাহ এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য ব্যবহার করা যায়। কুরআন, হাদীস ও আরবী সাহিত্যে এরূপ প্রচুর উদাহরণ রয়েছে, যাতে এই শব্দগুলো আল্লাহ ও আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আররহীম (দয়ালু) আল মালিক, (রাজা) আলমুমিন (নিরাপত্তাদাতা,) আল মুহাইমিন (আধিপত্য বিস্তারকারী), আল আযীয (পরাক্রমশালী), আল মুতাকাব্বির (অহংকারী), আল আলীমু (মহাজ্ঞানী), আসসামীয়ু (শ্রোতা), আলবাছীর (দ্রষ্টা), আলহাসীব (হিসাব গ্রহণকারী), আল ওয়াদূদ (প্রেমময়), আররউফ (স্নেহময়) এবং এ ধরনের আরো বহু গুণবাচক নাম রয়েছে, যা খোদ্ কুরআন শরীফেই আল্লাহর জন্য ও অন্যদের জন্য সমানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا   إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ -

এখানে যে আলী শব্দটি রয়েছে, তা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, আবার ওটা একজন সাহাবীরও নাম। এ নাম যদি কোনোভাবেও আপত্তিকর হতো, তবে রসূল (সঃ) অবশ্যই তা পাল্টে দিতেন। কেননা যে কোনো বিচারে অপছন্দীয় বা নাজায়েয হওয়ার বহু নাম তিনি পাল্টে দিয়েছেন। ছয়টি বৃহৎ হাদীস গ্রন্থের একাধিক রাবী (বর্ণনাকারী) আবু আলী উপনামে খ্যাত। বুআলী সিনা ও বুআলী কলন্দর শব্দ তো সর্বজনবিদিত। বুআলী আবু আলীর সংক্ষিপ্ত রূপ। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ এরূপ কথা বলে নিজের মূর্খতা প্রকাশ করেনি যে, যেহেতু আলী আল্লাহর নাম, সুতরাং যে ব্যক্তি আলী নাম রাখে, সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করে। আর যে ব্যক্তি আবু আলী নাম রাখে, সে আল্লাহর পিতা হবার দাবীদার। হাকিম শব্দটাও আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত, আবার তা একজন সাহাবীরও নাম।

মালেক আল্লাহরও নাম, আবার জনৈক ফেরেশতারও নাম। আবার হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের একজন শীর্ষস্থানীয় ইমামের নামও মালেক। আমাদের প্রাচীন মহাপুরুষদের অনেকেই আবু মালেক, আবু হাকীম, আবু বাছীর প্রভৃতি কুনিয়াত বা উপনাম দ্বারা পরিচিত। এ সমস্ত নাম ও উপনাম যদি জায়েয ও শুদ্ধ হয়ে থাকে এবং যারা এসব নাম ও উপনাম রেখেছিলো, তারা যদি আল্লাহ আল্লাহর বাপ হবার দাবীদার না হয়ে থাকে, তাহলে কোন্ আহম্মক এ কথা বলতে বা স্বীকার করতে পারে যে, একমাত্র আবুল আ'লা নামধারী ব্যক্তিটিই নিজেকে আল্লাহর পিতা বলে দাবী করেছে ? মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অর্বাচীনতার তো একটা সীমা থাকা চাই!

তাছাড়া প্রত্যেক আরবী জানা ব্যক্তি এবং ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে কিছুমাত্র দখল রাখে এমন লোক মাত্রেই জানে যে, সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি এরূপ রয়েছেন, যাদের নাম ও উপনামের অর্থ সহজবোধ্য নয়। এসব নামের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেয়া যাচ্ছে ঃ

আবু বকর, আবু বকরা, আবু মাহযূরা, আবু সালাবা, আবু জানদাল, আবু বাহর, আবু ইয়াকতান, আবু হানীফা, আবুল আবরাদ, আবুল আহওয়াস, আবু আওয়াম, আবুল আসবাত, আবুল আশহাব, আবুল বুখতারী, আবু সাওর, আবু তাওবা, আবু যুরয়া, আবুল ফারজ ইত্যাদি। মোটকথা, এমন নাম শত শত রয়েছে, যার প্রকৃত অর্থ কি তা কেউ জানেনা, কেউ কেউ এসব নামের প্রকৃত অর্থ জানবার চেষ্টা করেছে, তবে এসব চেষ্টা কৃত্রিমতা মুক্ত নয়। এখন যারা জিজ্ঞাসা করে যে, আবুল আ'লার অর্থ কি, আমি তাদের কাছে জানতে চাই যে, প্রাচীন মহাপুরুষদের যে কয়টি নাম আমি এখানে উল্লেখ করেছি, এগুলো কিনা আপনারা কখনো পড়েছেন বা জানতে পেরেছেন?

কুনিয়াত জাতীয় উপনামে 'আবু' শব্দটির অর্থ যে সব সময় পিতা হয়না, তা আরবী ভাষায় একেবারে অজ্ঞ না হলে যে কেউ বুঝতে পারে। হযরত আবু বকরের সন্তানদের ভেতরে কারো নাম বকর ছিলনা। অনুরূপ ইমাম আবু হানিফার কোনো ছেলে বা মেয়ের নাম হানিফা ছিলনা। অনেক সময় আবু শব্দটা অধিকারী "মালিক" বা 'ওয়ালা' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন হযরত আবু হুরায়রার একটা ছোট বিড়াল ছিল (হুরায়রা অর্থ ছোট বিড়াল এবং আবু অর্থ ওয়ালা। আবু হুরায়রা অর্থ ছোট বিড়াল ওয়ালা।) এ জন্য তিনি এই নামে খ্যাত হয়ে যান। এর অর্থ বিড়ালওয়ালা –বিড়ালের বাপ নয়। হযরত আলী (রাঃ) একবার মসজিদের উদোম মাটির মেঝেতে শুয়েছিলেন। তা দেখে রসূল (সঃ) তাকে স্নেহবশত 'আবু তুরাব' বলে ডাকেন। এ দ্বারা মাটির বাপ নয় বরং ধূলোমাটি মাখানো ব্যক্তিকে বুঝায়। উজর বা আজরা কখনো কখনো কুমারী অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুমারীকে যে বিয়ে করে তাকে আবু উজর বলা হয়। সুতরাং আবু উজর অর্থ কুমারীর পিতা নয়-স্বামী। হাদীসশাস্ত্রীয় অভিধানের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আননিহায়া ফি গরিবিল হাদীস ওয়াল আসর" এর লেখক আল্লামা ইবনুল আসীর আল জাযরীর উপনাম হলো আবুস্ সায়াদাত অর্থাৎ সায়াদাত তথা সৌভাগ্যের অধিকারী বা প্রত্যাশী সৌভাগ্যের পিতা নয়। আবুল বরকাত ও আবুল হাসানাত শব্দের অর্থ বরকত ও সায়াদাতের পিতা বলা কেবল কোনো অজ্ঞ লোকের পক্ষেই সম্ভব। মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী শুধু পাকিস্তানেই পরিচিত নয় বরং আল্লাহর মেহেরবানীতে আরব জাহানের সকল শ্রেণীর মানুষ তার নাম ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে ওয়াকিফহাল। বড় বড় জ্ঞানীগুণী, পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ তার নাম প্রতিনিয়ত শোনেন, পড়েন, লেখেন ও উচ্চারণ করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো আরবী ভাষাভাষী পন্ডিত ব্যক্তি তার নাম সম্পর্কে কোনো আপত্তি তোলেননি। শুধুমাত্র আমাদের দেশেরই কিছু অচেনা, অখ্যাত ও অহংকারী লোক নিজেদের জ্ঞানের বহর দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিছক

জিদ, হঠকারিতা, হিংসা ও ঈর্ষার বশেই তারা এরূপ নিম্নমানের অভিযোগ নিজেদের বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে অবাধে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। এরপর যদি কেউ এসব লোকের অন্যান্য অভিযোগের গুরুত্ব দেয়, তবে সেটা সেই ব্যক্তিরই আহম্মকী ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, প্রতিনিয়ত তারা এক একটা আজে বাজে অভিযোগ রটাবে এবং আমরা তার জবাব দিয়ে নিজেদের সময় নষ্ট করতে থাকবো। [তরজমানুল কুরআন, নবেম্বর-১৯৭০]

বাইয়িনাত সম্পাদকের সমালোচনা

প্রশ্ন ঃ আল্লামা বিনুরী টাউনের মাসিক বাইয়িনাতের সম্পাদক বর্তমানে মাওলানা ইউসুফ সাহেব। ১৩৯৯ হিজরীর রজব ও শাবান মাসে তার সম্পাদনায় বাইয়িনাতের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেই বিশেষ সংখ্যা সম্প্রতি পুস্তকাকারে পুনঃপ্রকাশ করা হয়েছে। এর ১২৮ পৃষ্ঠায় মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এভাবে সমালোচনার সূচনা করা হয়েছে ঃ

> "তিনি যখন আধুনিক সভ্যতা, নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে লেখেক, তখন মনে হয় যেন দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস বক্তৃতা দিচ্ছেন। আর যখন তিনি হকপন্থীদের বিরুদ্ধে লেখনি চালান, তখন মনে হয় যে তিনি মিঃ পারভেজ কিংবা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর কলম কেড়ে নিয়েছেন। মাওলানা মওদূদীর কলম নবীদের পরম সম্মানিত অংগনে গিয়েও আদবের তোয়াক্কা করেনা এবং অত্যন্ত দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে থাকেন ঃ
>
> মূসা আলাইহিস সালামকে সেই দ্রুততাকামী বিজেতার সাথে তুলনা করা চলে যে, বিজিত ভূখন্ডে নিজের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা না করে সামনে অভিযান চালিয়ে যেতে থাকেন, আর পেছনে বিজিত এলাকায় দাবানলের মত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।" (তরজমানুল কুরআন সংখ্যা -৫১৪)।

উপরোল্লিখিত কথাগুলো যেহেতু কোনো বই-পুস্তক থেকে নয় বরং তরজমানের একটা পুরানো সংখ্যা থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন, তাই উদ্ধৃতি সঠিক হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা কঠিন। উক্ত পত্রিকা যদি আপনার কাছে থাকে তবে তা দেখে প্রকৃত তথ্য জানাবেন এবং তরজমানুল কুরআনেই প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করবেন, যাতে সকলের মন সংশয়মুক্ত হয় এবং মাওলানা মওদূদী ও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ভুল ধারণার যতটা সম্ভব অপসারণ ও প্রতিকার হয়।

জবাব ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেব তরজমানুল কুরআন সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সংখ্যার যে কথাগুলোকে মাওলানা মাওদূদীর কথা বলে অভিহিত করেছেন এবং ইনসাফ ও সততার মাথা খেয়ে তা নিয়ে মন্তব্য করেছেন, আসলে তা মাওলানা মাওদূদীর নয় বরং মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর উক্তি। মাসিক

তরজমানুল কুরআনের "ইশারাত" শীর্ষক সম্পাদকীয় থেকে ইসলাহী সাহেবের এই উক্তিগুলো উদ্ধৃত করতে গিয়েও কাটছাঁট করে খিয়ানতের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। ইসলাহী সাহেবের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"মানুষকে আল্লাহর আইন ও বিধান জানানো যেমন একজন ইসলাম প্রচারকের অবশ্য কর্তব্য, তেমনি মানুষকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ইসলামের শিক্ষা দান এবং হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দান করাও তার ওপর ফরজ, যাতে ইসলামের শিক্ষা মানুষের কাজকর্ম ও চিন্তায় এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যেন কঠোর থেকে কঠোরতর পরিস্থিতিতেও তার ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। যে প্রচারক শুধু শিক্ষা দানের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে এবং এর আগ্রহ তার ওপর এত প্রাধান্য বিস্তার করে যে, প্রশিক্ষণের জন্য যে ধৈর্য ও প্রতীক্ষার প্রয়োজন, তার দাবী যথাযথভাবে পূরণ করতে পারেনা, তাকে সেই দ্রুততা প্রিয় বিজেতার সাথে তুলনা করা চলে, যে নিজের ক্ষমতা সংহত করার চিন্তা না করে কেবল সামনে অগ্রসর হতে থাকে। এ ধরনের তাড়াহুড়োর একমাত্র পরিণতি এটাই হতে পারে যে, একদিকে সে অভিযান চালিয়ে এগিয়ে যাবে, অপরদিকে তার বিজিত এলাকায় দাবানলের মত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে।"

মাওলানা ইসলাহী সাহেবের মূল বক্তব্য এবং মাওলানা লুধিয়ানভীর উদ্ধৃতিকে খোলা মনে ও খোলা চোখে পড়লে যে কোনো ইনসাফ প্রিয় ব্যক্তি উভয়টির মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান অনুভব করবে। প্রশ্ন জাগে যে, এমন বিকৃতি ও প্রতারণা কিভাবে সংঘটিত হলো? দু'টি অবস্থার যে কোনো একটি এর পেছনে সক্রিয় থাকা অবশ্যম্ভাবী। হয় মাওলানা লুধিয়ানভীর সামনে তরজমানুল কুরআনের সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি বর্তমান ছিল এবং তিনি স্বেচ্ছায় জেনে শুনে মাওলানা ইসলাহী'র বক্তব্যকে মাওলানা মওদূদীর মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন। সেই সাথে উদ্ধৃত বক্তব্যটিকেও ইচ্ছামত কাটছাঁট করে নিলেন। কেননা তার মতে, সিরাতুম মুস্তাকিম তথা সত্য ও সঠিক পথে মানুষকে চলমান রাখতে হলে তাদেরকে যেভাবেই হোক মওদূদীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ, বিদ্বিষ্ট করে তোলা অপরিহার্য। না হয়তো মাওলানা ইউসুফ সাহেবের নিকট তরজমান ছিলনা এবং অন্য কোনো হিংসুটে লোক মাওলানা ইসলাহীর উক্তিকে বিকৃত করে ও তাকে মওলানা মওদূদীর উক্তি বানিয়ে তার কাছে পেশ করেছিল। মাওলানা লুধিয়ানভী সেই শোনা কথাকে হুবহু বাইয়িনাতে ছেপে দিয়েছেন এবং এখন পর্যন্ত বই আকারে তা ছেপে চলেছেন। কিন্তু এই শেষোক্ত অবস্থায়ও সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার দাবী অনুসারে মাওলানা সাহেবের একটু কষ্ট করে মূল তরজমান পড়ে দেখা উচিত ছিল। তরজুমানের পুরানো সংখ্যাগুলো দুর্লভ নয়। অনেক পাঠকের কাছেই তা পাওয়া যায়। তরজমানুল কুরআনের অফিসে চিঠি লিখে প্রকৃত তথ্য জেনে নেয়া যেত। কিন্তু এই কষ্টটুকু স্বীকার না করে তিনি কেবলমাত্র দায়িত্বজ্ঞানহীন বর্ণনাকারীর বর্ণনা উদ্ধৃত করলেন এবং দেশের ভেতর ও বাইরের হাজার হাজার পাঠকের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করলেন যে লুধিয়ানভী সাহেব ঐ

কথাগুলো লেখে যথাযথভাবে সরাসরি তরজমান থেকেই উদ্ধৃত করেছেন এবং ঐগুলি মাওলানা মওদূদীর লেখা। লুধিয়ানভী সাহেব যে দাবী করে থাকেন যে, মতভেদকে একটা মানদন্ড অনুসারে যাচাই করা হয়ে থাকে এবং ইনসাফকামী লোকের জন্য সত্য অনুসন্ধানে কোনো জটিলতা থাকেনা সেই মানদন্ড কি এটাই? মিথ্যার দায়-দায়িত্ব বর্ণনাকারীর ঘাড়ের ওপর-এ কথা বলে এমন ভয়ংকর প্রতারণা কি লুধিয়ানভী সাহেবের জন্যে জায়েয হয়ে গেল? অথচ তিনি নিজেই এই মিথ্যার আর একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন। তার ও তরজমানের মাঝখানে আর কোনো বর্ণনাকারী থাকলে তাকে তিনি লুকাচ্ছেন। রসূল (সঃ)-এর এই বাণী কি লুধিয়ানভী সাহেবের জানা নেই যে ঃ

كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع ؟

'যা কানে আসে তাই বলে বেড়ানো মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট।'

তাছাড়া ব্যাপারটা মাওলানা মওদূদী, মাওলানা ইসলাহী কিংবা অন্য যে কোনো ব্যক্তির লেখা নিয়েই হোক না কেন, আসল যে বিষয়টা ভেবে দেখা প্রয়োজন তা হলো, সংশ্লিষ্ট লেখক কি সারা জীবনে আর কিছু লিখেছেন, নাকি শুধু এই কয়টি কথাই লিখেছেন, যার ওপর ভিত্তি করে তার হক বা বাতিল হওয়া এবং তার সুপথগামী বা বিপথগামী হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া হচ্ছে। বিশেষত আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে লেখক যদি অন্য কোনো স্থানে নিজের মতামত ব্যক্ত করে থাকেন এবং তা যদি লিপিবদ্ধ আকারে বিদ্যমান থেকে থাকে, তাহলে তাকে উপেক্ষা করা চরম বেইনসাফী ও বাড়াবাড়ি। আজকাল প্রত্যেক ধর্মীয় গোষ্ঠী এই বেইনসাফীতে লিপ্ত হচ্ছে এবং প্রতিপক্ষের সাথে ঠিক সেই একই জুলুম ও বাড়াবাড়ি চালাচ্ছে, যার শিকার হয়ে সে নিজেও বিক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদমুখর। খোদ্ মাওলানা ইউসুফ সাহেবের দেওবন্দী মুরুব্বীদের লেখার ওপর কাফেরী ও ফাসেকী ফতোয়া কি কম দেয়া হয়েছে? একবার তো দেওবন্দের মুফতি সাহেব স্বয়ং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতভীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "তাসফিয়াতুল আকায়েদ" এর একটি বাক্যের ওপর কুফরির ফতোয়া দিয়ে বসলেন। পরে যখন জানলেন যে, ঐ বাক্যটি জনাব নানুতভীর, তখন মুফতি সাহেবের যে কি করুণ অবস্থা হয়েছিল, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায়না।

বাইয়িনাত পত্রিকার সম্পাদক ও পাঠকবৃন্দ যদি নিজেদের চোখ বন্ধ ও বিবেক তালাবদ্ধ না করে থাকেন, তাহলে আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো, তারা যেন মাওলানা মওদূদী ও মাওলানা ইসলাহীর তাফসীর ও অন্যান্য লেখা বিদ্বেষমুক্ত ও পক্ষপাতহীন মন নিয়ে পড়েন এবং আল্লাহ ও আখেরাতের জবাবদিহীর ভীতি হৃদয়ে জাগরুক রেখে আল্লাহর ওয়াস্তে পুনর্বার ভেবে দেখেন যে, এই সব লেখা কি আল্লাহ ও তাঁর মহান নবীদের প্রতি ঈমান আনতে ও শ্রদ্ধা করতে শিখায়, না সিরাতুল মুস্তাকীম তথা সত্যের সহজ ও সরল পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মাওলানা ইসলাহী সাহেবের আলোচ্য লেখাগুলো খুঁজে দেখার জন্য তরজমানুল কুরআনের প্রাচীন সংখ্যাগুলো অন্বেষণের

প্রয়োজন নেই। এই লেখা যে দীর্ঘ ধারাবাহিক নিবন্ধের অংশ, তা পুস্তক আকারে "ইসলামী দাওয়াত ও তার কর্মপদ্ধতি" নামে প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর আসরার আহমাদের প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় খুদ্দামুল কুরআন থেকে এটি সংগ্রহ করা যেতে পারে। মাওলানা ইসলাহী সাহেবের বক্তব্যটিকে যে বিকৃত সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করা হয়েছে, তা তিনি স্বীয় তাফসীর তাদাববুরে কুরআনের একাধিক জায়গায় বারবার উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, সূরা তা-হার ৮৪ নং আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তাদাব্বুরে কুরআন ৪র্থ খন্ডের ২১২ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন ঃ

"আমি একাধিক জায়গায় একথা বলেছি যে, নবীদের দ্বারা যদি কোনো ভুলভ্রান্তি বা পদঙস্খলন ঘটে থাকে তবে তা প্রবৃত্তির অনুসরণজনিত নয়, বরং তার কারণ এই যে, কখনো কখনো তারা সত্যের পথে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে কাংখিত সীমানা অতিক্রম করে যেতেন। এ জিনিসটা মূলত কোনো দোষ বা অন্যায় নয়। কিন্তু নবীগণ যেহেতু সত্যের মানদন্ড হয়ে থাকেন এবং তাদের প্রত্যেকটা কথা ও কাজ অন্যদের জন্য আদর্শ হয়ে থাকে, তাই আল্লাহ তাদের এ ধরনের কাজেও সমালোচনা করেন। এ কারণেই হযরত মূসার তাড়াহুড়ার সমালোচনা করা হয়েছে।"

বাইয়িনাত পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা মওদূদী বা মাওলানা ইসলাহীর তাফসীর থেকে যেসব অংশ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বর্ণিত নবীদের পদস্খলনসমূহের তাৎপর্য মাওলানা ইসলাহীর ভাষায় ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

এসব জায়গায় যে ব্যক্তি আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা করবে, সে নিশ্চয়ই ওহীর ভাষায় কথা বলবেনা এবং হুবহু কুরআন ও হাদীসের শব্দগুলির পুনরাবৃত্তিও করবেনা। কোনো খোদাভীরু ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান আল্লাহ কিংবা তার রসূলের সাথে বেআদবী করার ধৃষ্টতা তো দূরের কথা, তা কল্পনাও করতে পারেনা। আর যদি তা করে তবে তার ঈমান বজায় থাকতে পারেনা। তাই যারা দিনরাত ইসলামের খিদমাতেই নিয়োজিত থাকেন, তাদের ইসলামের অন্যান্য খাদেমদের সম্পর্কে কিছু বলা বা লেখার সময় এত বেশী খারাপ ধারণা তো পোষণ করতে চাই না যে, নিজে ও নিজের ঘনিষ্টতম ব্যক্তিবর্গ ছাড়া আর সবাইকে কেবল গোলাম আহমাদ পারভেজ ও গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীই মনে হতে থাকবে।

উপসংহারে মাওলানা লুধিয়ানভীকে বলতে চাই যে, এদেশে এমন লোকেরাও প্রকাশ্যে দাপটের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা খোলাখুলিভাবে বলে থাকে ও লিখে থাকে ঃ

"আল্লাহ অপরাধী"। "তোমরা ও তোমাদের ফিরেশতারা সবাই ভন্ড ও প্রতারক"। "সেই খোদার ওপর আমরা অচিরেই আধিপত্য বিস্তার করবো।" ......আল্লাহ "মানুষের বিরুদ্ধে প্রলাপ বকে।" মানুষকে মানুষের সাথে সংঘর্ষে লিপ্তকারী খোদা। --আল্লাহকে আদালতে পেশ কর। আমি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করছি।" যে শহর থেকে বাইয়িনাত ছাপা হয়, এইসব কুফরি কথাবার্তা সেখান থেকেই ছাপা হয়। কিন্তু

ইসলামের ভক্তদের আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের কারণে ইসলামের এই শত্রুদের এবং মানবতার কলংক এই শয়তানগুলোর পথ প্রশস্ত হয়েছে। "হে চক্ষুষ্মান লোকেরা, উপদেশ গ্রহণ করো।" (তরজমানুল কুরআন এপ্রিল, ১৯৮০)।

সুলাইমান (আঃ) এবং ইউসুফ (আঃ) এর কাহিনী সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ নিম্নলিখিত জটিল প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে সমাধানের পথ খুঁজছি। আশা করি উত্তরদানে বাধিত করবেন।

১. তাফহীমুল কুরআনে সূরা 'সাবার' ১৪ আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ ঃ "অতঃপর আমি যখন সুলাইমানের ওপর মৃত্যুর সিদ্ধান্ত কার্যকর করলাম, তখন ঐ ঘুন ছাড়া তার মৃত্যুর কথা জিন্‌দেরকে জানিয়ে দেবার আর কোনো জিনিসই ছিল না, যা তার লাঠিকে খেয়ে ফেলছিল। এভাবে সুলায়মান যখন পড়ে গেল, তখন জিন্‌দের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তারা যদি গায়েব জানতো, তবে তারা এ ধরনের অপমানকর শাস্তিতে নিমজ্জিত থাকতোনা।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যা ১৪ নম্বর টীকায় 'মাওলানা মরহুম' আধুনিক যুগের ঐসব মুফাসসির থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, যারা এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে- "এর তাৎপর্য হলো হযরত সুলাইমান (আঃ) এর অত্যন্ত অযোগ্য ছেলে রজ'আম স্বীয় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সম্মানিত পিতার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সামলাতে পারেনি। তার স্থলাভিষিক্ত হবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ সাম্রাজ্য সৌধটি ধপ করে ভূতলে পতিত হলো।"

এখানে 'মাওলানা' শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদি তথা যুক্তির মাধ্যমে ঐ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ঘটনাটিকে একেবারে বাস্তবরূপে দাঁড় করেছেন, যেমনটি অনুবাদে প্রকাশ পেয়েছে।

স্থূলদৃষ্টিতে একজন পাঠক এ যুক্তি দ্বারা সত্যই নিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে ঐ যুক্তি দ্বারা অন্য একটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর একজন প্রিয় নবী এবং এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি নিজের নুবুওয়াতী মিশনারী এবং রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ ফেলে একটি প্রাসাদ নির্মাণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে লিপ্ত হয়ে গেলেন। তাঁর অসংখ্য দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবার অন্য কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকলোনা। এতদসত্ত্বেও জনগণ কি এ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আদৌ সচেতন হতোনা?

এটা ঠিক যে, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার ব্যাপারে একথা বলা যেতে পারে যে, তিনি তাঁর কোনো প্রতিনিধি নির্ধারণ করে হয়তো বা অবসর নিয়ে থাকবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তৃষ্ণা কিভাবে নিবৃত্ত হবে যে, সর্বপরিচিত,সমারোহমন্ডিত এবং করিতকর্মা ব্যক্তিটি হঠাৎ করে একদিন সমস্ত দায়-দায়িত্ব ও ঝক্কী-ঝামেলা ছেড়ে ছুড়ে এক স্থানে

দাঁড়িয়ে গেলেন। এমন কি, তিনি একটুও শুচ্ছেননা, কিছু খাচ্ছেননা এবং কিছু পানও করছেননা। প্রাকৃতিক প্রয়োজনও তাঁকে স্পর্শ করছেনা। একটু নড়াচড়া পর্যন্তও যেন করছেন না।

প্রকৃতি বিরুদ্ধ এ অবস্থা কিছুক্ষণের জন্য শুধু নয়, বরং সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলছে। প্রজা সাধারণের মধ্যে কোনো মানুষ কিংবা কোনো জিন এতটুকুও সন্দেহ করছেনা যে, জনাব জীবিত আছেন, নাকি মৃত? এটি পরিষ্কার যে, সাইয়িদুনা সুলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যুর কারণে তাঁর হাতের পুরো লাঠিটি ঘুনে ধরে পড়ে যেতে অন্ততঃ একাধিক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে। এমন মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষে যেখানে কয়েক ঘন্টাও অভ্যাসের বিপরীত অতিবাহিত হওয়া অবাস্তব বলে প্রতীয়মান হয়, সে ক্ষেত্রে সপ্তাহ কেন, মাসও যেন অতিক্রান্ত হচ্ছে! তবে এসব কিছু কি করে সম্ভব? অনুগ্রহপূর্বক ছাফ করে বুঝিয়ে দিতে মর্জি হয়।

২. সূরা ইউসুফ অধ্যয়নে জানা যায় যে, যখন হযরত ইউসুফের (আঃ)-ভাইয়েরা শস্য সংগ্রহের জন্য মিসরে এসেছিলেন, তখন ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে চিনে ফেলেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের ভাইকে চিনতে পারেনি। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে না জানিয়ে তাদের খাদ্য শস্যের থলিতে সংগোপনে ঐ মূলধন (বিনিময় মূল্য) রেখে দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার বিনিময়ে ভাইয়েরা খাদ্যশস্য নিয়ে যাচ্ছিল। ইউসুফ ভ্রাতৃবৃন্দ গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যখন শস্যভর্তি বোঝাটি খুললো, তখন তার মধ্যে নিজেদের দেয়া হুবুহু মূলধন পেয়ে গেল। তারা খুশী হয়ে তাদের পিতাকে ডেকে বললোঃ "আব্বাজান! আমরা আর কি চাই। আমাদের খরচ করা মূলধন অবিকল ফেরৎ এসেছে। আমরা এ দিয়ে আবারো রসদপত্র সংগ্রহ করবো।"

এখানে একটা প্রশ্ন আমাকে পীড়া দিচ্ছে। যদিও ইউসুফ (আঃ) জেনে বুঝে ভাইদেরকে অবগত না করিয়ে টাকা-পয়সা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু ইউসুফ ভ্রাতৃবৃন্দ এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর জানা থাকার কথা নয় যে, এ টাকা-পয়সা জ্ঞাতসারে ফেরৎ দেয়া হয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে সততা ও বিশ্বস্ততার মৌল দাবী ছিলো ভুল বুঝাবুঝি অথবা ভুলক্রমে ফেরৎ আনা টাকা-পয়সা আমানত হিসেবে গ্রহণ করা এবং এগুলিকে ফিরিয়ে দেয়ার উপায় বের করা। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, একজন উঁচুদরের নবী হয়েও এদিকে আদৌ দৃষ্টিপাত করেননি।

কুর'আনে করীম কিংবা হাদীস শরীফে নিশ্চিতভাবে কোনোই ইশারা ইংগিত পাওয়া যাচ্ছেনা যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ টাকা পয়সা ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ কিংবা অন্ততঃ সে রকম মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন।

৩. ইসলামের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা হলো, একজন মুসলমান এবং একজন ইহুদী রসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের মধ্যেকার একটি মামলা দায়ের করেছিল। রসূল (সঃ) মোকদ্দমার বিবরণী শুনে ইহুদীর পক্ষে রায় প্রদান করেছিলেন।

ফিরে আসার পথে ঐ মুনাফিক মুসলমান মামলাটিকে হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট পেশ করার পরামর্শ দিল। যখন দু'জনই হযরত উমর (রাঃ)-এর সম্মুখে হাজির হলো এবং উমর ফারুক জানতে পারলেন যে, রসূল (সঃ) এ মামলাটির ফয়সালা ইতিপূর্বেই করে দিয়েছেন, তখন তিনি ঐ মুনাফিক মুসলমানের শিরচ্ছেদ করে ফেল্লেন। এ বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে রিসালাতের দরবার থেকে হযরত উমরকে 'ফারূক' খিতাবে ভূষিত করা হয়েছিল।

প্রশ্ন হলো হযরত উমর (রাঃ) কোন ক্ষমতাবলে একজন লোকের গর্দান উড়িয়ে দিলেন? অথচ ইসলামে একটি বিধিবদ্ধ, সাক্ষ্যপ্রমাণ সাপেক্ষ এবং শাস্তিমূলক বিচার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

উত্তর ঃ আপনি যে গুরুত্ব সহকারে নিজের আপত্তি এবং সংশয়সমূহ দ্বারা দিগন্ত প্রসারী ইমারত নির্মাণ করেছেন, তার উত্তর যদি সবিস্তারে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে কম-সে-কম একখানি পুস্তিকার রূপ পরিগ্রহ করবে। তা সত্ত্বেও সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর নিবেদন করছি ঃ

১. কুরআন মজীদের আয়াতগুলোতে কিংবা তাফহীমুল কুরআনের টীকাসমূহে এ বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যাবেনা যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) স্বীয় যাবতীয় নবুওয়াত ও হুকূমত সংক্রান্ত কার্যাবলী ফেলে রেখে শুধু একটি সৌধ নির্মাণ ও তা তত্ত্বাবধানের নিমিত্তে এমনভাবে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, যদ্দরুন অন্যান্য অসংখ্য দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার আর কোনো উপায় অবশিষ্ট ছিলনা।

কুরআন্ মজীদে শুধু এতটুকু বর্ণনা পাওয়া যে, কতক জিন্‌কে (খুব সম্ভব তারা বিদ্রোহী ও কাফির ছিল) সুলাইমান (আঃ) এর অনুগত বানিয়ে দেয়া হয়েছিল যাতে তারা তাঁর জন্য দালান কোঠা এবং ধাতব ডেগ-ডেগচি ইত্যাদি প্রস্তুত করতে পারে। একাজের জন্য সমস্ত দিন ও রাত দীর্ঘ সময় ধরে সুলাইমান (আঃ)কে দেখাশুনা করতে হবে এটি জরুরী ছিলনা। অবশ্যি এতটুকু মনে করার অবকাশ আছে যে, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম কোনো দিন কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে জিন্‌দের ওপর অর্পিত কাজ পরিদর্শন করছিলেন, আর ঠিক ঐ সময়ে তাঁর জান কবজ হয়েছিল। তাঁর হাতে যে লাঠি ছিল, তা কয়েক ঘন্টার জন্য হলেও স্থির থাকার কারণে উঁইপোকা খেয়ে ফেলতে পারে। আমাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, অনেক সময় কোনো বস্তু কিছুক্ষণের জন্য মাটির ওপর পড়ে থাকলে তাতে উই ধরা শুরু হয়ে যায়। 'মাওলানা মরহুম' এবং অন্যান্য উলামা কিরাম যদিও ঘুন শব্দ ব্যবহার করেছেন তার অর্থও পোকা হিসাবে 'উই' পোকা ধরা হবে। কুরআন মজীদে ব্যবহৃত শব্দ دَابَّةُ الْاَرْضِ (মাটির প্রাণী) একথার কাছাকাছি ধারণা পেশ করছে।

যদি লাঠির নিচের অংশ উইতে খেয়ে ফেলে এবং (হাত দিয়ে ধরা) উপর অংশের হাত যদি ঢিলা হয়ে যায়, তবে লাঠিটি স্বাভাবিক নিয়মে মাটিতে পড়ে যাবে। আর অমনি (সুলাইমান আঃ-এর) দেহ মুবারক ঢলে পড়ে থাকবে। জিনগণ যেহেতু সুলাইমান

(আঃ) এর অনুগত ছিল, সেহেতু (তাঁর মৃত্যুর পর) কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। হয়তো তারা ভেবেছিল, তারা যদি সুলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যুর খবর সঠিক সময়ে জানতো, তাহলে ঐ সময়েই তারা এই পরিশ্রমের কাজ ছেড়ে দিত। যা হোক এ ঘটনাটির জন্য অনেক সপ্তাহ ও মাসের বিরতির প্রয়োজন হয়না। কয়েক ঘন্টার মধ্যে এসব কিছু সংঘটিত হতে পারে।

২. যখন মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তখন খুবই সম্ভব যে, সিনাই এবং ফিলিস্তীন উপদ্বীপও তার করাল গ্রাসে পড়েছিল। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত সমস্ত অঞ্চলসমূহে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মিসরে পূর্বাহ্নে সংরক্ষিত শস্যভান্ডার মওজুদ আছে। সেখানকার সরকার শুধু নিজ দেশের জনগণের জন্য শস্য বিতরণ করছেননা, বরং দুর্ভিক্ষের ক্ষতিগ্রস্ত সব এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে শস্য বিতরণ করছেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে আপনি অনেক বেশী আপত্তিকর প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু আপনি এটা চিন্তাও করেননি যে, তাঁর পুত্র হযরত ইউসুফ (আঃ) যিনি নবীও ছিলেন, তিনি শস্য কেনাবেচার কোনো ব্যবসা শুরু করেননি। বরং এটিই খুব বেশী সত্য বলে ধারণা করা যায় যে, যারা সাহায্য প্রার্থী হয়ে তাঁর নিকট আসতো, তাদের প্রয়োজন পরীক্ষা করার পর তিনি অর্থের বিনিময়ে কিংবা বিনিময় ছাড়া তাদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। তাঁর ভাইয়েরা যদি অল্প বিস্তর কিছু মূল্য বাবদ নিয়ে এসে থাকে, তবে সম্ভবতঃ উপঢৌকনরূপে পেশ করা হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) মনে হয় মাপ জোঁপ ও হিসাব-নিকাশ জাতীয় কারবারী কায়দায় তাদের সাথে আচরণ করেননি। মূল্য হিসেবে হয়তো অল্প কিছু দিরহাম অথবা কিছু দীনার ছিল। ফিলিস্তীনে পৌছে গিয়ে যখন তারা দেখলো যে, বাদশা আমাদের পুঁজি আমাদেরই দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে গোপনে রেখে দিয়েছেন। তারা এমনটি দেখে ভেবে নিয়েছেলো যে, তিনি আমাদের সামনে আমাদের হাতেই এটা ফিরিয়ে দেয়া সমীচীন মনে করেননি। কেননা এমনটি করা উপহার উপঢৌকনের প্রতি এক প্রকার অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য জ্ঞাপন বুঝায়।

এরপরও কি আপনি মনে করেন যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলবেন ঃ 'শত শত মাইল দূরে উল্টা দিকে তোমরা চলে যাও এবং এ টাকা পয়সা তাঁকে গিয়ে পৌছাও।' অথচ এ ব্যাপারটি অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) জেনে বুঝে এটি রাখতে চাননি এবং এটাকে ফিরিয়ে দেবার একটি বিশেষ কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা যা কিছু বলেছিল, তার অর্থ এই যে, বাদশা যখন আমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও মহানুভবতার প্রমাণ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয়বার খাদ্য শস্যের প্রয়োজনে আমরা যখন আবার যাবো–আমাদের ভাইকেও সাথে নিয়ে যাবো- তখন আমরা পুনরায় সমগ্র উপহার তাঁর সামনে উপস্থিত করবো।

বাইবেলের বর্ণনায় আছে যে, পিতা ও পুত্র পাত্রের মধ্যে ঐ টাকা পয়সা ফেরৎ পেয়ে একেবারে চমকে উঠলো এবং পিতা বললেন, "যাও এগুলি ফিরিয়ে দিয়ে এসো" কিছু তাফসীরকারও এরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যদি এমনটিই হতো,

তাহলে এটি গোটা ঘটনার একটা গুরুত্বপুর্ণ অংশই ছিল, যা কুরআনে অনুল্লেখ থাকা চিন্তার বহির্ভূত বটে। "তবে প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।"

৩. ইহুদী ও হযরত উমর (রাঃ) এর মধ্যকার যে ঘটনা সম্পর্কে আপনি লিখেছেন, আমিও তা পড়েছি; কিন্তু আপনি কোনো বরাত দেননি। তাই আমার পক্ষে অনুসন্ধান চালানো কঠিন হয়ে গেল। সে যাই হোক ঘটনাটির বর্ণনা এমনও আছে, যা আমার নজরে পড়েছে। আর তাতে হযরত উমর (রাঃ) শুধু তলোয়ার বের করছিলেন বলে উল্লেখ আছে। মুনাফিকটার শিরচ্ছেদ করার কথা সেখানে উল্লিখিত হয়নি।

হযরত উমর (রাঃ) যেহেতু কড়া মেজাজের ব্যক্তি ছিলেন, সেহেতু তলোয়ার উত্তোলন করার আরো কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে ব্যাপারটি অত্যন্ত পরিষ্কার যে, একজন লোক নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করলো, আর সে নবী করীম (সঃ) এর মীমাংসা মেনে নিতে পারলনা, তখন তার একাজটি 'ইরতিদাদ' (ধর্মচ্যুতি)-এর সংজ্ঞায় এসে পড়ে। হয়তো বা হযরত উমর (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে 'মুরতাদ' (ধর্মত্যাগী) মনে করেছিলেন। আর 'মুরতাদ' 'ওয়াজিবুল কতল' অর্থাৎ তাকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে গণ্য করে তিনি তার জীবনলীলা সাঙ্গ করেছিলেন।

(ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক) প্রত্যেক খলীফার আদেশ অমান্য ও বিরুদ্ধাচরণের কারণে এ শাস্তি (মৃত্যু দন্ড) দেয়া যাবেনা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম-এর সাথে অন্য কোনো বিচারক বা শাসকের তুলনা করা যায়না। "খোলাফায়ে' রাশেদীন"-এর ফায়সালাসমূহের সাথে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। তাঁদেরকে কিছু লোক নিন্দা মন্দও বলেছেন, আবার কিছু লোক আনুগত্যের শপথ (বাই'আত) গ্রহণ করতে ইস্ততঃ করেছেন। অথচ খোলাফায়ে রাশেদীন এসব প্রতিবাদী লোকদেরকে ওয়াজিবুল কতল (নিশ্চিত হত্যাযোগ্য) বলে মনে করেননি। পক্ষান্তরে ইসলাম গ্রহণ করার পরে যদি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিন্দামন্দ বলে, তাকে (শাস্তিস্বরূপ) হত্যা করা যেতে পারে। [তরজমানুল কুরআন-জানুয়ারী ১৯৮১ ইং]

'তাফহীমুল কুরআনে' অনুবাদের এক স্থানে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

প্রশ্ন ঃ তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদের মধ্যে একটি দুর্বলতার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। সূরা বাকারার ১২৬ আয়াতে মাওলানা মওদূদী (রহঃ)

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا.......

এর অনুবাদ করেছেন "এ শহরকে শান্তির শহর বানাও।" মাওলানা আবদুল মাজেদ দারিয়াবাদীও এ ধরনের অনুবাদ করেছেন। এ অনুবাদ শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ অনুবাদ হচ্ছে "এ স্থানকে শান্তিপূর্ণ শহর বানাও।" কেননা যে সময়ে হযরত ইসমাঈল (আঃ)কে সেখানে বসানো হয়েছিল এবং যে সময় কা'বা তৈরী করা হয়েছিল; সে সময়ে ওখানে মাত্র কয়েকটি কুঁড়েঘর ও বাসোপযোগী জায়গা বর্তমান ছিল। এ অবস্থায় তাকে শহর বলা

শুদ্ধ নয়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর উদ্দেশ্যও এই ছিল যে, "হে পাক পরোয়ারদেগার! এ শস্যহীন উপত্যকা এবং কা'বা মরু অঞ্চলকে একটি শান্তিপূর্ণ ও জাঁকজমকপূর্ণ শহরে রূপান্তরিত করে দাও।" তাঁর এই দু'আ কবুল হয়।

সম্মানিত উভয় অনুবাদক অর্থাৎ মওদূদী (রহঃ), মাজেদ (রহঃ) সাহেবদ্বয় সম্ভবতঃ বুঝেছেন যে, هٰذَا بَلَدًا একই কর্মপদ। অথচ هٰذَا র পর কমা (,) আছে। ইশারা হয়েছে ঐ সময়ের মক্কা মু'আযযামার অবস্থান ভূমির দিকে. অর্থাৎ ঐ স্থানকেই বুঝান হয়েছে। অতপর প্রার্থনা করেছেন بَلَدًا آمِنًا (শান্তিপূর্ণ শহর) বানিয়ে দাও।

আরবী ভাষার দিক দিয়েও এটি ভুল, কেননা 'হাযা' মা'রিফা (নির্দিষ্ট বিশেষ্য) এবং 'বালাদান' নাকিরা (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য)। আপনি কি আমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন?

উত্তর ঃ আপনার চিঠি পেলাম। আমি এর সাথে মিলিয়ে তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ পড়লাম। উভয় অনুবাদ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাও করেছি। আমার বুঝে যা এসেছে, তা হলো উভয় অনুবাদই শুদ্ধ। তাফহীমুল কুরআন ও তাফসীরে মাজেদীর অনুবাদের প্রতি আপনি যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তা বেশী জোরদার ও জীবন্ত বলে প্রতীয়মান হয়না।

আপনার তরজমা নিম্নে দেয়া হলোঃ 'হে পরোয়ার দেগার! এ (ভূখন্ড শস্যবিহীন উপত্যকা এবং কা'বা মরুভূমি) কে একটি আবাদ শহর বানিয়ে দাও, যেখানে শান্তি ও স্বস্তি বিরাজমান থাকবে।"

মাওলানা মওদূদী (রহঃ)-এর তরজমা-'এ শহরকে শান্তির শহর বানাও'। মাওলানা দারিয়াবাদী (রহঃ) এর তরজমা 'এ শহরকে শান্তিপূর্ণ বানাও' আমার নিকট এসব তরজমাই শুদ্ধ। আপনার আপত্তি এই যে, যে সময় হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে সেখানে বসানো হয়েছিল এবং কা'বার ভিত্তি তৈরী করা হয়েছিল, ঐ সময় সেখানে শুধু কিছু পর্ণ কুটির এবং বাসোপোযোগী জায়গা ছিল মাত্র। এ অবস্থায় তাকে শহর বলা ঠিক নয়। আপনি আরো বলেছেন ঃ "উভয় হযরতই (মওদূদী ও দারিয়াবাদী) সম্ভবতঃ এটি বুঝেছেন যে, هٰذَا بَلَدًا একই কর্মপদ, অথচ هٰذَا-এর ইশারা بَلَد এর দিকে নয়, বরং 'হাযা'র ইশারা ঐ সময়ের মক্কা মু'আযযমার অবস্থানের ভূমিটুকুর দিকে মাত্র। আরবী ভাষার প্রেক্ষিতেও এটা ভুল, কেননা 'হাযা' মা'রিফা (নির্দিষ্ট বস্তুবাচক) এবং 'বালাদ' নাকিরা (অনির্দিষ্ট বস্তুবাচক)।" আমার জানামতে আপনার সমস্ত প্রতিবাদ ও প্রমাণ উত্থাপন নিছক শাব্দিক বিতর্ক-এর পর্যায়ভুক্ত। প্রথম কথা হচ্ছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর উদ্দেশ্য যদি এই মনে করা হয় যে, তিনি ঐ ভূখন্ডের জন্য দু'আ করে ছিলেন যা হারেমে মক্কা (মক্কার পবিত্র অঙ্গন) নামে অভিহিত; অথবা তাঁর দু'আর লক্ষ্য ও প্রার্থিত বস্তু ধারণা করা যায় যে, তিনি তথাকার

বসবাসকারী কিংবা বসতবাড়ীর জন্য দু'আ করেছিলেন। আর সে সময় ঐ স্থানে জনমানব মন্ডলী স্থান করে নিয়েছিল অথবা ভবিষ্যতে জনবসতি গড়ে উঠবে। এতদোভয়ের ভেতর কোনো বৈপরিত্য নেই বরং এর অর্থ দুই-ই হতে পারে। ঐ সময়কার জনমানবকেও শহর কিংবা 'বালাদ' বলা যেতে পারে। বসতবাড়ীর উপযোগী স্থান এবং হারেম শরীফের ভবিষ্যত বাসিন্দাগণের জন্যও শহর তথা 'বালাদ' শব্দের ব্যবহার হতে পারে।

এ ব্যাপারটি পূর্বাপর ভাষণের প্রেক্ষিতে প্রমাণিত ও প্রকাশিত যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) এ দু'আ ঐ সময় করেননি, যখন তিনি আল্লাহর আদেশ কার্যকর করার জন্য হযরত হাজিরা এবং তাঁর নবজাতক শিশুপুত্রকে বিজন মরুভূমিতে আল্লাহর হিফাযতে রেখে দিয়ে যাচ্ছিলেন। বরং এটি ঐ সময়ের দু'আ ছিল, যখন মহান কু'রবানীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ইসমাঈল (আঃ) যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। এ সময় পিতা-পুত্র এক সাথে আল্লাহর আদেশের অধীনে আল্লাহর ঘর নির্মাণের ফরয কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। তখন 'জুরহাম' কবীলা এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। এর মধ্যে ইসমাঈল (আঃ) পরিবারসুলভ পরিবেশ পেয়েছিলেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মাঝে মধ্যে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ও কুশলাদি জানতে মক্কা তাশরীফ আনতেন। এ সবের উল্লেখ সহীহ হাদীসসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং এটা জরুরী নয় যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর শৈশবকাল থেকে বায়তুল্লাহ নির্মাণ পর্যন্ত পর্যায়ক্রমিক ধারার মধ্যে ওখানকার জনবসতি কেবলমাত্র কয়েকটি কুঁড়ে ঘরেই সীমিত থাকবে। থাকলেই ঐ উপস্থিত কিংবা আগামী দিনের প্রত্যাশিত লোকালয়কে 'বালাদ' অথবা শহর বলে উল্লেখ করার মধ্যে ক্ষতির কোনো কিছু নেই।

আপনার হয়তো স্মরণ নেই যে, এ প্রকার দু'আ সূরা ইবরাহীমে উল্লিখিত হয়েছে। সেখানকার ভাষা হলো ঃ

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا---১-

এখানেও بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ (পানি ও তরুলতা শূন্য এক মরুপ্রান্তর) শব্দাবলীও এসেছে। মুফাসসিরগণের কিছু সংখ্যকের অভিমত এই যে, দ্বিতীয় দু'আ এবং অন্য কতকের মতে উভয় দু'আ কা'বা নির্মাণের সময় করা হয়েছিল। এ সময় হযরত ইসমাঈল (আঃ) যুবক ছিলেন এবং হযরত ইসহাক (আঃ)ও জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সে যাই হোক-যে অবস্থাই হোক, হযরত ইবরাহীম (আঃ) সে অবস্থাতেই প্রার্থনা করছেন 'হে আমাদের রব! আমি আমার সন্তানদেরকে তরুলতাহীন বিরান মরুপ্রান্তরে বসিয়ে দিলাম।" আরো দু'আ করেছেন ঃ "আমার রব। এ শহরকে শান্তিময় বানিয়ে দাও।" এখানে আপনার আনীত সমস্ত অভিযোগের উত্তর কি হবে? আপনি 'নাকিরা', মা'রিফা 'বালাদ' এবং 'আল-বালাদ' শব্দাবলীকে ভিত্তি করে অভিযোগ আপত্তি তুলে ধরেছেন। এ ক্ষেত্রে আপনার যে জবাব, আমাদেরও সেই একই জবাব। অপরের

তরজমাসমূহে আপনি যে টিপ্পনী কেটেছেন, তা এখন আপনার ওপর বর্তাচ্ছে। এখানে 'মারেফা'র স্থলে 'নাকিরা' ব্যবহৃত হয়েছে। পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, 'বালাদ'এর তরজমা উর্দূতে (বাংলাতেও) শহর বলা ছাড়া উপায় নেই। কেননা উর্দূ (বাংলা) ভাষার পরিসর আরবী ভাষার ন্যায় প্রশস্ত নয়। তবে আরবী অভিধানে প্রত্যেক শূন্য ভূমিখন্ডকেই 'বালাদ' শব্দে প্রকাশ করা যায়। সেখানে মানুষ বাস করুক, মৃতকে সমাধিস্থ করা হোক, অথবা জন্তু-জানোয়ার, পাখী কিংবা বন্য প্রাণী পাওয়া যাক তাতে কিছু এসে যায়না।

বিখ্যাত আরবী অভিধান 'কামূসে' 'আল-বালাদ'এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ঃ

كل قطعة مستحيزة عامرة اوفامرة والتراب والقبر والمقبرة والدار والاثر واذى النعام-

'বালাদ' মানে এমন প্রতিটি ভূমিখন্ড যার সীমানা নির্ধারিত আছে। সেখানে জনবসনিত থাকুক কিংবা জনবসতি শূন্য অনাবাদী জমি হোক, ফাঁকা সমতল ভূমি কিংবা কবরস্থান ঘরবাড়ী কিংবা জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ অথবা চর্তুষ্পদ পশুর আবাস-যাই থাকুক, থাকতে পারে।"

কুরআন মজীদের তিন স্থানে (আল-ফুরকান-৪৯, আয-যুখরুফ-১১ এবং ক্বাফ-১১) 'বালদাতান মাইতান' মৃত জমিকে বৃষ্টির সাহায্যে জীবন্ত করার কথা বলা হয়েছে। এখানে মৃত বস্তু বলতে পতিত জমিও হতে পারে, যেখানে মানববসতি অথবা তরুলতাদি বর্তমান নেই। তবে এখেকে একটি বিষয় অবশ্যই জানা যাচ্ছে যে, এটি আবাদ জায়গা নয়। [তরজমানুল কুরআন, মার্চ-১৯৮১ইং]

কাদিয়ানী কর্তৃক ইমাম মাহদী হবার মিথ্যা দাবী

প্রশ্ন ঃ আমরা সবাই সম্প্রতি সম্মিলিতভাবে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু বানিয়ে ছেড়েছি। এই সময় জনৈক কাদিয়ানী আমাকে কিছু বই দিয়েছে। আমার মনেও কৌতুহল বেড়ে গিয়েছিল। তাদের অন্যান্য কথাবার্তায় তো আমি তেমন কোনো গভীরতা অনুভব করিনি। তবে তাদের একটা কথা আমার মনে দাগ কেটেছে এবং সে ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা আমার বুঝে আসেনি। আপনার কাছে অনুরোধ, এর বিস্তারিত জবাব দেবেন এবং আমাকে এর প্রকৃত রহস্য জানাবেন।

এই বইগুলোর একখানিতে লেখা ছিল, রসূল (সঃ) এই মর্মে একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমাদের মাহদীর দুটো আলামত থাকবে। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর এ যাবত এ ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। প্রথমতঃ যখন ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন, তখন রমযান মাসের ১৩ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ তারিখে সূর্য গ্রহণ

হবে। "আর এ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি।" (দারকুতনী, ১৮৮ পৃঃ) বইখানাতে এ কথাও লেখা ছিল যে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ১৮৯১ সালে ইমাম মাহদী হবার দাবী করেন এবং ১৮৯৪ সালে পূর্ব গোলার্ধের অর্ধেক জুড়ে এবং ১৮৯৫ সালে পশ্চিম গোলার্ধে এ ঘটনা ঘটে। অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন যে, নবী (সঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য কি এবং তা কার সাথে সংশ্লিষ্ট?

জবাব ঃ মির্যা গোলাম আহমদের মিথ্যা দাবীসমূহ খন্ডন করতে আলেম সমাজ কোনো কিছুই বাদ রাখেননি। সম্প্রতি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদও একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মির্যা গোলাম আহমদ ও তার অনুসারীরা ইসলামের আওতা বহির্ভূত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এখনো কাদিয়ানীরা তাদের ও তাদের নেতাদের বাতিল দাবীসমূহ প্রচারের অনুমতি পাচ্ছে। মির্যা গোলাম আহমদ তার যেসব দাবীতে নিজেকে এ যুগের শ্রীকৃষ্ণ ও রিদ্দার গোপাল ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেসব দাবী নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু তার অনুসারীরা যখন মুসলমান হবার দাবী করে এবং মির্যা গোলাম আহমদের সেই সব দাবী পুনঃপ্রচার করে যাতে তাকে নবী ও রসূল, প্রতিক্ষিত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত ঈসা মাসীহ (আঃ) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তখন তাদের এ কাজটা আইনের চোখেও যেমন অপরাধ হয়ে দাঁড়ায় তেমনি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন প্রতিটি মুসলমানের জন্যও তা মানসিক কষ্টের কারণ ও অসহনীয় ব্যাপার বলে পরিগণিত হয়। জানি না তাদের এ সুযোগ সুবিধা আর কতদিন বহাল থাকবে।

যা হোক, মাহদী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা আপনি জানতে চেয়েছেন, সেটা যেহেতু কাদিয়ানীরা মির্যা গোলাম আহমদের ওপর প্রয়োগ করতে চায়, তাই আমি সংক্ষেপে তার প্রকৃত মর্ম জানিয়ে দিচ্ছি। প্রথমতঃ মাহদী শব্দের অর্থ আরবী ভাষায় হেদায়েত প্রাপ্ত। যে ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার হয়ে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছে, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় কিভাবে? এ ধরনের লোক হেদায়াতপ্রাপ্ত নয় বরং নিজেও বিপথগামী, আর অন্যদেরকেও বিভ্রান্তকারী। যে মাহদীর বিবরণ কোনো কোনো হাদীসে এসেছে, তিনি মুসলিম জাতিরই এক ব্যক্তি হবেন। তিনি ক্ষমতাসীন ও পরাক্রমশালী হবেন, কোনো বাতিল শক্তির ক্রীড়ণক হবেননা। নিত্য নতুন এমন সব দাবীদাওয়া নিয়েও তিনি আবির্ভূত হবেননা, যার সাথে বাস্তবতার কোনো যোগসূত্রই নেই।

কাদিয়ানীরা নিজেদের যুক্তিতে প্রতারণার নতুন যে কৌশল অবলম্বন করেছে, সেটা তাদের নিম্নোক্ত দাবীতে নিহিত রয়েছে। এ কৌশলটা তারা বারবার প্রয়োগ করে থাকে। আলফজল পত্রিকার বার্ষিক সভা সংখ্যায় ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৪ তারিখে ছাপা হয় যে, "শেষ যামানায়, যখন প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আবির্ভূত হবার কথা, সেই সময় সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী দেয়া হয়েছে।"

এই বক্তব্য দ্বারা পাঠকের মনে এই মর্মে বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, পরবর্তী প্যারায় যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি উল্লেখ করেছেন তা খোদ্ রাসূল (সঃ)-এর উক্তি

এবং তিনি নিজেই ইমাম মাহদীর এইসব লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। এখন দেখুন সুনানে দারকুত্‌নীতে বর্ণিত মূল বক্তব্যটি এরূপ ঃ

عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن على قال ان لمهدينا ايتين۔

এই সনদটিতে রসূল (সঃ)-এর উল্লেখ কোথাও নেই, এমনকি কোনো সাহাবীর পর্যন্ত উল্লেখ নেই। এর অর্থ এই যে, এটা রসূল (সঃ)-এর উক্তি তো নয়ই, এমনকি সাহাবীর উক্তিও নয়। সনদের সর্বশেষ বর্ণনাকারী হচ্ছেন মুহাম্মদ বিন আলী-যিনি এই কথাটা বলেছেন। তাহলে কাদিয়ানিদের এ কথা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, এটা রসূল (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী? মুহাম্মদ আলী সম্পর্কে দারকুত্‌নীতে বলা হয়নি যে, তিনি কোন্ মুহাম্মদ বিন আলী। রিজাল শাস্ত্রে এই নামে অন্ততঃ পনেরো জন বর্ণনাকারী পাওয়া যায়। অনেকের মতে ইনি ইমাম বাকের (রহঃ)। ইমাম বাকের নিঃসন্দেহে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। কিন্তু সনদের অন্য সকল রাবী অনির্ভরযোগ্য। আর যদি সকল রাবী (বর্ণনাকারী) নির্ভরযোগ্যও হতেন, তথাপি এটিকে রসূলের হাদীস বলা যাবেনা। অথচ কুরআন ও হাদীসই হলো আমাদের আসল উৎস।

তাছাড়া এ বর্ণনাটির অনুবাদে কাদিয়ানীরা যে ধাপ্পাবাজি ও প্রতারণার সাহায্য নিয়েছে, তারও কোনো তুলনা মেলেনা। এতে اوّل ليلة من رمضان (রমযানের প্রথম রাত) এর অনুবাদ করা হয়েছে রমযানের ১৩ই রাত এবং نصف منه -এর অনুবাদ করা হয়েছে ২৮শে দিন। এটা কাদিয়ানীদের কোনো আলাদা হিসাব কিতাব এবং নিজস্ব গাণিতিক দর্শন হয়ে থাকতে পারে। সেই হিসাব নিকাশে ১লা তারিখ ১৩ই এবং মধ্য রমযান ২৮শে তারিখ হয়ে যায়। সম্ভবতঃ তারা আলাদা কোনো ক্যালেন্ডারও উদ্ভাবন করে নিয়েছে এবং এটা হয়তো তারই অবদান!

এই বর্ণনা সম্পর্কে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কথা এই যে, এর বক্তব্য অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসের বক্তব্যের পরিপন্থী হওয়ার কারণেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। বহু সংখ্যক সহীহ হাদীসে রসূল (সঃ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, কোনো মানুষের জীবন ও মৃত্যুর সাথে কুসুফ (সূর্য গ্রহণ) ও খুসুফ (চন্দ্র গ্রহণ) এর কোনো সম্পর্ক নেই।

সহীহ বুখারীর কুসুফ সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে ঃ

كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.

"যেদিন রসূল (সঃ)-এর ছেলে ইবরাহীম মারা যায়, সেই দিন সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। লোকেরা বলতে লাগলো, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্য গ্রহণ হয়েছে। তা শুনে রসূল (সঃ) বললেন, কারো জীবন বা মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয়না। তোমরা কখনো এরূপ দেখলে কুসূফ ও খুসুফের নামায পড়ো এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করো।"

অন্যান্য হাদীসে রসূল (সঃ)-এর এ উক্তিও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ-উভয়ই আল্লাহর নিদর্শন। আল্লাহ এ দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। রসূল (সঃ)-এর এই মহিমান্বিত উক্তিগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, কোনো মানুষের জীবন বা মৃত্যুর সাথে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। এর উদ্দেশ্য শুধু ভীতিপ্রদর্শন। রসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় যখন সূর্যগ্রহণ হয়, তখন তিনি এই ঘটনাকে নিজের নবুওয়তের নিদর্শন হিসেবে কখনো পেশ করেননি। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর অপর কোনো ব্যক্তিও আজ পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ দ্বারা এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেননি। আসলে নিজেদের ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণার পক্ষে এরূপ অনিশ্চিত ও সন্দেহজনক প্রমাণ অনুসন্ধান করা কেবল মিথ্যাচারীদেরই কাজ হয়ে থাকে। [তরজমানুল কুরআন, এপ্রিল, ১৯৭৫]

মুসলিম কাদিয়ানী মতভেদের প্রকৃত স্বরূপ

মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মাঝে যে আকাশ পাতাল ব্যবধান এবং যার কারণে পাকিস্তানে বারবার সংঘর্ষ ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটছে, তাকে সঠিকভাবে বুঝা এবং তার সত্যিকার ধরন নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়না। জেনে হোক বা না জেনে হোক-একে সাধারণতঃ একটা ধর্মীয় উপদলীয় বিদ্বেষের ফল বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। আর এ কারণেই ধারণা করা হয় যে, শান্তি-শৃংখলা ও জননিরাপত্তার পর্যায়ে রেখে এবং উভয় পক্ষকে শক্তি দ্বারা দমিয়ে রেখে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ দ্বন্দ্ব মুসলমানদের দুটো ফের্কা বা উপদলের দ্বন্দ্ব নয়। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নামক এক ব্যক্তির কয়েকটি উক্তির ওপর এর ভিত্তি। এই মির্যা সাহেবের মতে এই দাবী কুরআনের মতই সুনির্দিষ্ট ও অকাট্য। এই দাবীকে যে মানেনা সে নিশ্চিতভাবে কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত। অপরদিকে সাধারণ মুসলমানদের মতে, এ ধরনের দাবী যারা তুলেছে এবং তাকে যারা মেনে নিয়েছে-তারা সকলেই কাফের। সুতরাং এ মতভেদ উপদলীয় দ্বন্দ্ব নয় বরং এটা কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব। নিম্নে এ

দ্বন্দ্বটার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা হলো ঃ

মির্যা গোলাম আহমদের ওহির ওপর ঈমান

মির্যা গোলাম আহমদ মনে করতেন তার কাছে ওহি ও এলহাম এসে থাকে। এ সম্পর্কে তার বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"আমি আল্লাহ তায়ালার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি কুরআন শরীফ ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের ওপর যেরূপ ঈমান আনি, ঠিক তদ্রুপ আমার কাছে আগত ওহি ও ইলহামের ওপরও আমি ঈমান আনি। কুরআন শরীফকে যেমন আমি নিশ্চিতভাবে ও অকাট্যভাবে আল্লাহর কালাম বলে জানি, তদ্রূপ যে কালাম আমার ওপর নাযিল হয়, তাকেও আল্লাহর কালাম বলে জানি। কেননা এর সাথে আমি খোদায়ী আলো ও চমক দেখতে পাই এবং তার সাথে আল্লাহর অসীম শক্তির নিদর্শন দেখতে পাই।" (হাকীকাতুল ওহি, মির্যা গোলাম আহমদ, পৃঃ ২১১)

"আমি অবিকল কুরআন শরীফের আয়াতের মতই বিন্দুমাত্র পার্থক্য ছাড়াই সেই প্রকাশ্য ওহির ওপরও ঈমান আনি, যা আমার ওপর নাযিল হয় এবং যার সত্যতা তার ক্রমাগত আলামতগুলো দ্বারা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে।" (এক গলতিকা ইযালা, মির্যা গোঃ আঃ পৃঃ ৮)

এর সুস্পষ্ট অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, স্বয়ং মির্যা গোলাম আহমদের ঈমান এবং যে ব্যক্তি মির্যা সাহেবের নবুওয়ত ও ওহিপ্রাপ্তির দাবীকে সত্য বলে মানে তার ঈমান মির্যা সাহেবের ওপর আগত ওহি ও ইলহামের ওপর এতটাই মজবুত অকাট্য, যতটা কুরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের ওপর হওয়া উচিত। তার মতে এইসব ওহি ও ইলহামকে অবিশ্বাস করা কুরআনকে অবিশ্বাস করারই শামিল। এভাবে মির্যা সাহেব ঈমানের স্তম্ভ স্পষ্টতই বৃদ্ধি ও সংযোজন করেছেন। এই বৃদ্ধি ও সংযোজনের ওপর ভিত্তি করে মির্যা সাহেব ঈমানের স্তম্ভগুলোতে যেভাবে সংশোধনী ও রদবদল ঘটাতে চেয়েছেন তা নিম্নে দেখুন ঃ

আখেরাতের ওপর ঈমানে বিকৃতি সাধন

আল্লাহতায়ালা সূরা বাকারার শুরুতেই খোদাভীরু মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

"যারা অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনে, নামায কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে এবং যারা তোমার ওপর নাযিল করা কিতাবের ওপর ঈমান আনে এবং তোমার পূর্ববর্তী কিতাবের ওপরও। উপরন্তু তারা আখেরাতেও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।"

স্পষ্টতই এখানে শুধু মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পূর্বে যেসব ওহি নাযিল হয়েছে তার ওপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে এবং এর পরের কোনো ওহি বা কিতাবের উল্লেখ নেই। স্বয়ং মির্যা গোলাম আহমদও ১৯০৬ সাল পর্যন্ত এই আয়াতের এই অর্থই গ্রহণ করতেন। রাবওয়াঙ্গ লেখক সংঘ তার সূরা বাকারার যে তাফসীর ছেপেছে, তার ১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

"...তারা ঈমান আনে তোমার ওপর ও তোমার পূর্বে নাযিলকৃত ওহির ওপর এবং আখেরাতে বিশ্বাস রাখে।" উক্ত তাফসীরের ১০ম পৃষ্ঠায় এবং ৬০তম পৃষ্ঠায় প্রায় অনুরূপ অনুবাদই ছাপা হয়েছে। তাতে "আখেরাতে বিশ্বাস রাখে" কথাটা বিদ্যমান। কিন্তু এর পর হঠাৎ অন্য ইলহাম এসে গেল এবং তাতে আয়াতের অর্থ ওলটপালট হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ

"আজ আমার মনে এই চিন্তার উদ্ভব হয়েছে যে, কুরআন শরীফ এবং তার পূর্ববর্তী ওহির ওপর ঈমান আনার কথা তো কুরআনে বলা হয়েছে। আমার ওহির ওপর ঈমান আনার কথা কেন বলা হলোনা? এ কথা ভাবতে ভাবতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের আকারে সহসা আমার মনে এ কথা ঢুকানো হলো যে, উক্ত আয়াতে "যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে" দ্বারা কুরআন শরীফ এবং যা "তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে" দ্বারা পূর্ববর্তী নবীদের ওহি, এবং আখিরাত দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহের ওহি বুঝানো হয়েছে। আখিরাতের অর্থ হলো পেছনে আগমনকারী। সেই পেছনে আগমনকারী জিনিসটা কি? পূর্বাপর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, এখানে পেছনে আগমনকারী জিনিস দ্বারা সেই ওহিকে বুঝানো হয়েছে, যা কুরআনের পরে নাযিল হবে। কেননা আয়াতের শুরু থেকে ওহিরই আলোচনা চলে আসছে। একটা ওহি রসূল (সঃ) ওপর নাযিল হয়েছে। অপরটি রসূল (সঃ)-এর পূর্বে নাযিল হয়েছে। তৃতীয়টি হচ্ছে, যা 'তার পরে নাযিল হবে' (সূরা বাকারার তাফসীর ৬৩ পৃঃ ১৬৪ পৃঃ)

পবিত্র কুরআনের যে ইংরেজী অনুবাদ কাদিয়ানীরা প্রকাশ করেছে, তা নিয়ে বেলুচিস্তানে সম্প্রতি বিরাট দাংগা সংঘটিত হয়ে গেছে। সেই অনুবাদেও আয়াতটির এরূপ অনুবাদ করা হয়েছে। কোনো কোনো কাদিয়ানী বা মুসলমান ভেবেছিল যে, এ অনুবাদ হয়তো অনুবাদকের নিজস্ব আবিষ্কার। অথচ তা মূলতঃ মির্যা গোলাম আহমদের ইলহাম থেকে নির্গত। ঐ ইলহামকে মির্যা সাহেব কুরআনের মতই অকাট্য ও অবিসম্বাদিত মনে করেন। কিন্তু আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি, ওটা কুরআনের বিকৃতি।

ফেরেশতার প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিকৃতি

আল্লাহর কিতাব ও আখেরাতের প্রতি ঈমানের বিষয়ে মির্যা গোলাম আহমদের কাটছাঁট ও সংযোজনের পর এবার আমরা আল্লাহর ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের বিষয়টি দেখতে চাই। এটিও ঈমানের মূল স্তম্ভসমূহের অন্যতম। মির্যা গোলাম আহমদ সূরা বাকারার তাফসীরে কিছুটা সামনে গিয়ে ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। এ আয়াতে প্রশ্ন ও উত্তরের উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীর খিলাফতের জন্য হযরত আদমকে সৃষ্টির সময় আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে এই প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠিত হয়। ফেরেশতা শিরোনামে মির্যা গোলাম আহমদ লিখেছেন ঃ

"সুতরাং যেসব বহিরাগত জিনিস আমাদের আধ্যাত্মিকতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং দেহের প্রয়োজন পূরণকারী সূর্য-চন্দ্র ও অন্যান্য উপাদানের ন্যায় আমাদের আত্মার প্রয়োজন পূরণ করে, আমরা তাকেই ফেরেশতা আখ্যায়িত করি।" (তাফসীর সূরা বাকারা- পৃঃ ১০১)

"পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও আকাশের জন্য ফেরেশতারা প্রাণতুল্য এবং ঐ সকল জিনিসের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব তাদের সাথে ফেরেশতাদের সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। তারা যেই আকাশের কিনারে চলে যায়, অমনি সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও আকাশ নির্জীবের মত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তারা প্রাণের মত হলো, না অন্য কিছুর মত?" (তাফসীর সূরা বাকারা পৃঃ ১০১)

"কুরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত যে, এই সব নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ নিজ নিজ দেহ সম্পর্কে এক একটা প্রাণের অধিকারী, যাকে তারা নক্ষত্রসমূহের সত্তা থেকেও মনোনীত করতে পারে। নক্ষত্র ও গ্রহ উপগ্রহে যেমন তাদের দেহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নানা রকমের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এবং সেসব বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের ওপর নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, ঠিক তেমনি তাদের আলোকময় সত্তাতেও নানা ধরনের বৈশিষ্ট রয়েছে, যা মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টার অনুমতিক্রমে বিশ্বের সকল সৃষ্টির অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর এই সব আলোকময় সত্তা আল্লাহর পূর্ণতাপ্রাপ্ত বান্দাদের ওপর দেহধারী মানুষের রূপ ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে থাকে এবং মানুষের আকারে দেখা দিয়ে আসে। মনে রাখতে হবে যে, এই বক্তব্য কেবল বক্তৃতা নয় বরং সত্য। সত্য ও তত্ত্বজ্ঞানের অন্বেষণকারীদেরকে এ কথা স্বীকার করতেই হবে।" (সূরা বাকারার তাফসীর-পৃঃ ১১৩)

"কুরআন শরীফের কোনো কোনো স্থানে জড়পিন্ডসমূহের অণু-পরমাণুকেও ফেরেশতা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেননা ঐসব অণু-পরমাণু আপন দয়াময় প্রভুর আওয়াজ শোনে এবং তাদেরকে যা করার নির্দেশ দেয়া হয় শুধু তাই করে। উদাহরণ স্বরূপ, মানবদেহে রোগ কিংবা সুস্থতার দিকে যা কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হয়, ঐ সকল বস্তুর প্রতিটি কথা আল্লাহর মর্জি অনুসারে আগে বা পিছে পদ সঞ্চালন করে।

(সূরা বাকারার তাফসীর ১১৪ পৃঃ)

অন্য কথায় বলা যায়, মির্যা সাহেবের বক্তব্য অনুসারে ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কেবল এতটুকুই যে, তা মহাশূণ্যের পিন্ডসমূহ, পৃথিবীর শক্তিসমূহ এবং মানবদেহে রূহ ও প্রাণের কাজ করে। পদার্থের পিন্ডসমূহ এবং উপাদানসমূহ হচ্ছে দেহ এবং ফেরেশতারা সেই দেহের প্রাণ। এই বিচারে সূর্য, চন্দ্র ও আকাশ প্রাণী এবং তাদের প্রাণ (অর্থাৎ ফেরেশতারা) যদি বেরিয়ে যায় তবে গোটা সৃষ্টিজগত নিষ্প্রাণ হয়ে যাবে। এ তত্ত্বটা ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা সংক্রান্ত আকীদায় সুস্পষ্ট বিকৃতি সাধনের শামিল। প্রশ্ন এই যে, ফেরেশতারা যদি কেবল মানবদেহ ও আকাশের পিন্ডসমূহের প্রাণই হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহর কালাম নিয়ে তারা যে নবীদের ওপর নাযিল হন, সে সত্যের কি গুরুত্ব থাকে? তেমন হলে তো ঈমান ও ধর্ম বলতে কেবল রূপকথার কাহিনী ছাড়া আর কিছু বাকী থাকেনা। ফেরেশতাদের ব্যাপারে এ ধারণা কুরআন ও হাদীসের দেয়া ধারণা নয় বরং পৌত্তলিকতাবাদী গ্রীক দর্শন থেকে আমদানিকৃত।

ফেরেশতাদের সংজ্ঞা নির্ণয়ে আরো বিকৃতি

এরপর মির্যা গোলাম আহমদ ফেরেশতা এবং ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর কথাবার্তার বিবরণ সম্বলিত আয়াতসমূহের অন্য একটা সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"আমার সম্পর্কে খোদা তায়ালা আমারই মাধ্যমে বারাহীনে আহমাদিয়াতে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি আদমের নমুনায় একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। এ খবরটা শুনে কিছু বিরোধী লোক আমার অবস্থাকে তাদের আকীদা বিশ্বাসের কিছুটা পরিপন্থী দেখে মনে মনে বললোঃ হে আল্লাহ! তুমি কি এমন মানুষকে নিজের প্রতিনিধি বানাবে যে একজন গোলযোগ সৃষ্টিকারী লোক, যে অকারণে জনগণের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং আলেমদের স্বীকৃত সত্যের বাইরে অবস্থান নেয়। তখন আল্লাহ জবাব দিলেন যে, আমি যা জানি তা তোমরা জাননা। এটা আমার ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর কালাম বা কথা। প্রকৃতপক্ষে আমার ও আমার খোদার মাঝখানে এমন সুক্ষ্ম গোপন তত্ত্ব নিহিত রয়েছে, যার কথা দুনিয়ার মানুষ জানেনা। আল্লাহর সাথে আমার এমন এক গোপন সম্পর্ক রয়েছে, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায়না এবং এ যুগের লোকেরা তা জানেনা। এটাই আল্লাহর এই উক্তির মর্মার্থ যে, "আল্লাহ বললেন আমি যা জানি তা তোমরা জান না।" (সূরা বাকারার তাফসীর, পৃঃ ১১৮)

এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, কুরআনের সূরা বাকারার ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যে এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি যখন ফেরেশতাদের কাছে পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন, তখন ফেরেশতারা বললো, আপনি পৃথিবীতে এমন লোককে নিয়োগ করছেন যে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাবে। সেখানে খলীফা দ্বারা মির্যা গোলাম আহমদ এবং আপত্তি উত্থাপনকারী ফেরেশতা দ্বারা মির্যা সাহেবের বিরোধীদের

বুঝানো হয়েছে। মির্যা সাহেবের বিরোধীদেরকে আল্লাহ এই বলে চুপ করিয়ে দিলেন যে, আমি যা জানি তা তোমরা জাননা। এ হচ্ছে মির্যা সাহেবের ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর বাণী এবং এতে এমন তত্ত্ব বুঝানো হয়েছে যা খোদ্ মুহাম্মদ (সঃ), সাহাবায়ে কেরাম এবং উম্মাতের কোনো ব্যক্তির জানা ছিলনা। (নাউযুবিল্লাহ) কেননা তারা কেউ আজ পর্যন্ত এ আয়াতের এই মর্মার্থ বর্ণনা করেননি।

জান্নাত ও আদম সংক্রান্ত কুরআনী ধারণার বিকৃতি সাধন

এরপর সূরা বাকারার ৩৬নং আয়াতের যে ব্যাখ্যা মির্যা গোলাম আহমদ করেছেন, তাও লক্ষ্যণীয়। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, আমি বললাম ঃ

"اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو....."

"হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী বেহেস্তে বাস করতে থাকো..."

এর ব্যাখ্যায় মির্যা সাহেব বলেন ঃ

"হে আদম! তুমি এবং তোমার অনুসারীরা বেহেস্তে অর্থাৎ প্রকৃত জীবনের উপকরণাদিতে প্রবেশ কর।" (সূরা বাকারার তাফসীর পৃঃ ১৩৫)

অথচ অন্য এক জায়গায় লিখেছেন ঃ

"এখন উল্লেখ্য যে, এই বান্দার শারীরিক জন্মও এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই হয়েছিল অর্থাৎ আমি যমজ হয়েছিলাম। আমার সাথে একটা মেয়ে ছিল যার নাম ছিল জান্নাত। এখানে আল্লাহর এই আদেশ

يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔

(হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর) আজ থেকে বিশ বছর আগে বারাহীনে আহমাদিয়া ৪৯৬ পৃষ্ঠায় এটি উদ্ধৃত হয়েছে। এতে জান্নাত শব্দটার উল্লেখ এই মর্মে একটা সুক্ষ্ম ইংগিত বহন করছে যে, আমার সাথে জন্মগ্রহণকারী মেয়েটির নাম জান্নাত ছিল এবং সে মাত্র সাত মাস জীবিত থেকে মারা গিয়েছিল। মোট কথা, আল্লাহ যেহেতু নিজের বাণীতে ও ইলহামে আমাকে হযরত আদমের সাথে তুলনা করেছেন, তাই এ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে সৃষ্টির আইন অনুসারে যে সৃজনী রীতি ও ধারা চলে আসছে, তাতে আমাকে হযরত আদমের মেজাজ প্রকৃতি সহকারে ও তদ্রুপ ঘটনাবলীর মধ্যদিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে হযরত আদম যেমন যমজ হিসেবে সৃষ্টি হয়েছেন অর্থাৎ একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী এক সাথে জন্মেছে, আমার জন্মও সেই ভাবেই হয়েছে। অর্থাৎ এই মাত্র লিখেছি যে, আমার সাথে জান্নাত নাম্নী একটা মেয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে এবং সেই মেয়েটি প্রথম ভূমিষ্ট হয়।" (সূরা বাকারার তাফসীর পৃঃ ১৩০)

হজ্জের জন্য মির্যার অনুমতির শর্ত

ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহের মধ্যে হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কুরআন শরীফের সূরা আল ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -

"যার সাধ্য আছে সে যেন আল্লাহর ঘরের হজ্জ করে-এটা মানুষের নিকট আল্লাহর অধিকার।"

সমগ্র উম্মাতের এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও সহায়সম্পদের দিক দিয়ে হজ্জে যেতে সক্ষম এবং পথে কোনো দুর্লংঘ্য বাধাও না থাকে, তবে তার ওপর হজ্জ ফরজ।

কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ বলেন, "কোনো হজ্জ গমনেচ্ছু ব্যক্তির যদি এই প্রতিশ্রুত মসীহের সাথে (অর্থাৎ মির্যা সাহেবের সাথে) দেখা হয়ে যায়, যার জন্য মুসলিম জাতি তেরশ বছর ধরে প্রতীক্ষারত, তাহলে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান অনুসারে উক্ত মসীহের অনুমতি ছাড়া সে হজ্জে যেতে পারবেনা।" (সূরা আল ইমরানের তাফসীর পৃঃ ১৩৪)

বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আমাদের রসূল (সঃ) স্বয়ং যেখানে এমন কোনো শর্ত আরোপ করেননি যে, যে মুসলমানের আমার সাথে দেখা হয়ে যায় সে আমার অনুমতি ছাড়া হজ্জ করতে পারবেনা। পবিত্র কুরআনে এমন কোনো স্পষ্টোক্তি তো দূরের কথা, ইশারা ইংগিতও নেই। আর মসীহে মাওউদ (প্রতিশ্রুত মাসীহ) শব্দটিও কুরআন বা হাদীসের কোথাও নেই। সেখানে যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর উম্মাতী নবী হবার দাবীদার, সে হজ্জকে নিজের অনুমতির শর্তযুক্ত করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে!

অপরদিকে মির্যা গোলাম আহমদ নিজের জামায়াতের বার্ষিক সম্মেলনের ব্যাপারে লিখছেন যে,

"এখানে নফল হজ্জের চেয়ে বেশী সওয়াব রয়েছে এবং গাফেল থাকলে ক্ষয়ক্ষতির আশংকা। কেননা এটা আসমানী ধারাবাহিকতা ও খোদায়ী নির্দেশ।" (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৩৫২)

জেহাদ রহিত করণ

আল্লাহর পথে জেহাদ ও কেতালও (সর্বাত্মক সংগ্রাম ও সশস্ত্র যুদ্ধ) ইসলামের একটা মৌলিক ফরয। এর গুরুত্ব কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ তা রহিত করার কথা ঘোষণা করেন।

হাকীকাতুল ওহী নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"প্রতিরক্ষা দুশমনের হামলা অনুপাতে নির্ণিত হয়। মানুষ পুজারীরা শেরকের ওপর অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়েছে এবং এখন এই ঝোঁক সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছে গেছে। তাই এখন আল্লাহ নিজেই লড়বেন। তিনি মানুষকে কোনো তলোয়ার দেবেননা আর কোনো জেহাদও হবেনা। কেবল হাত দেখাবেন।"

অন্যত্র লিখেছেন ঃ "আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আমার মুরিদরা যতই বাড়তে থাকবে, জেহাদের ভক্ত ততই কমে যেতে থাকবে। কেননা আমাকে মসীহ ও মাহ্দী মেনে নেয়ার অর্থই জেহাদকে অস্বীকার করা।" (তাবলীগে রিসালাত, পৃঃ ১৭)

জেহাদ রহিতকরণের উদ্ভট যুক্তি

"সহীহ্ বুখারীতে প্রতিশ্রুত মসীহের গুণাবলী প্রসংগে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ যখন আসবেন, তখন তিনি যুদ্ধ ও জেহাদকে রহিত করে দেবেন। এর অন্তর্নিহিত রহস্য এই যে, মসীহের তীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কারণে যখন ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মহামারী ও ভূমিকম্প ইত্যাদিতে মারা যাবে, তখন তলোয়ার দিয়ে কাউকে হত্যা করার দরকার হবেনা। আল্লাহ এতটা নির্দয় নন যে, দুই রকমের কঠিন আযাব একই সময়ে কোনো জাতির ওপর নাযিল করবেন অর্থাৎ একটা গজবের আযাব আর একটা মানুষের দ্বারা তলোয়ারের আযাব। আল্লাহ তায়ালা কুরআন শরীফে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, এই দুই ধরনের আযাব এক সময়ে একত্রিত হবেনা।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহী -পৃঃ ১১)

এই সমস্ত ব্যাখা ও যুক্তি মিথ্যায় পরিপূর্ণ। বুখারী শরীফে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মহামারীর আযাবের কথা কোথাও বলা হয়নি। কুরআনেও একথা কোথাও নেই যে, মহামারী ও তলোয়ারের আযাব এক সময়ে একত্রিত হতে পারেনা। হাদীসে 'যুদ্ধ বিরতি' শব্দটি হযরত মরিয়মের পুত্র ঈসার (আঃ) সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এর ব্যাখ্যা সেখানেই পাওয়া যায় যে, হযরত ঈসা দাজ্জাল ও তার অনুসারীদেরকে হত্যা করে কুফরের অস্তিত্ব নির্মূল করে দুনিয়াকে পবিত্র করবেন এবং যুদ্ধের অবসান ঘটে যাবে। কাদিয়ানীদের নিজেদের মনগড়া কোনো কুরআনে বা বুখারীতে যদি প্রতিশ্রুত মসিহের কথা থেকে থাকে, তবে সে আলাদা কথা। আমাদের কুরআন ও হাদীসে একথা নেই যে, হযরত ঈসা যুদ্ধ না করেই কেবল রোগ মহামারী দ্বারাই কাফেরদেরকে খতম করে দেবেন।

বৃটিশ সরকারের আনুগত্য

জেহাদ থেকে হাত গুটানোর এই ঘোষণার একটা উদ্দেশ্য বৃটিশ সরকার এবং অন্য যে কোনো অনৈসলামিক সরকারকে আনুগত্যের নিশ্চয়তা প্রদান। তিনি নিজেই বলেছেন যে, ইংরেজদের চাটুকারিতায় তিনি এত বই লিখেছেন যে, ৫০টি আলমারী

ভরে যেতে পারে। মির্জা গোলাম আহমদের নিজের ইলহাম অনুসারে ইংরেজ সরকারই তার আশ্রয়দাতা ছিল। তাই হাকীকাতুল ওহী নামক বই এর আরবী পরিশিষ্টে তিনি লিখেছেন ঃ

"আল্লাহ আমাদেরকে রাবওয়াতে আশ্রয় দিয়েছেন।"

অতঃপর টীকায় রাবওয়া শব্দটির ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

"আল্লাহতায়ালা কুরআনে হযরত ঈসা (আঃ) ও তার মার সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি তাদের উভয়কে একটা উচ্চ, শান্ত ও ঝর্ণা পরিবেষ্টিত জায়গায় আশ্রয় দিয়েছি। আর আমাকে যেহেতু আল্লাহ হযরত ঈসার (আঃ) সদৃশ বানিয়েছেন, তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আমার জন্য শান্তি, নিরাপত্তা ও সুখে পরিপূর্ণ আশ্রয়স্থল বানিয়ে দিলেন।" (হাকীকাতুল ওহী, পরিশিষ্ট-পৃঃ ৪৫)।

মির্জা গোলাম আহমদ শুধু যে নিজে ইংরেজদের অনুগত ও বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন, তা নয়-বরং তিনি পরবর্তী বংশধরকেও বৃটিশ সরকারের অনুগত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"আল্লাহতায়ালা রহমতের বৃষ্টির ন্যায় ইংরেজ শাসকদেরকে দূর থেকে আনলেন এবং শিখদের আমলে যে তিক্ততা ও নির্যাতন আমরা ভোগ করেছি, বৃটিশ সরকারের ছায়ার নীচে এসে তা ভুলে গেলাম। আমাদের ওপর এবং আমাদের বংশধরদের ওপর বৃটিশ সরকারের চিরকৃতজ্ঞ থাকা কর্তব্য হয়ে গেল।" রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৬৬ ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড)।

মির্যার চোখে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের সম্পর্কে তার অভিমত এই যে ঃ

ইংরেজ সরকারের প্রজা ও তার দ্বারা প্রচুরভাবে উপকৃত হওয়া সত্ত্বেও তারা একটা অবৈধ ও অসংগত পন্থায় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। অথচ এ ধরনের বিদ্রোহ ও জেহাদ তাদের জন্য শরীয়ত মোতাবেক জায়েয ছিলনা। কেননা তারা এই সরকারের প্রজা ও তার অধীন ছিল। কোনো প্রজা যে সরকারের শাসনাধীন থাকে এবং যার অধীন স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে, সেই সরকারের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ করা মারাত্মক হারাম, কবীরা গুনাহ, অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও খারাপ কাজ। ১৮৫৭ সালের ইতিহাস এবং সে সময়কার মৌলবীদের ও তাদের ফতোয়াসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে যখন দেখি যে, তারা সাধারণভাবে সিল মেরে হুকুম জারি করেছিলেন যে, ইংরেজদেরকে হত্যা করা উচিত, তখন আমরা লজ্জার সমুদ্রে ডুবে যাই আর ভাবি যে, তারা কেমন ধরনের মৌলবী ছিল এবং তাদের ফতোয়াইবা কি ধরনের ছিল। সেসব ফতোয়ায় দয়ামায়া, বুদ্ধি বিবেক, নৈতিকতা ও সুবিচার-এর কোনটাই ছিলনা। তারা তাদের পরম উপকারী সরকারের ওপর, চোর, ডাকাত ও

লুটেরাদের মত হামলা শুরু করেছে। আর এরই নাম রেখেছে জিহাদ। (রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৮৯-৪৯০ ইযালায়ে আওহাম, ২য় খন্ড)।

রিসালাত ও নবুওয়াতের দাবী

যেহেতু কুরআন শরীফ আল্লাহর শেষ কিতাব, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর শেষ নবী ও রসূল এবং উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সর্বশেষ হেদায়াতপ্রাপ্ত উম্মত, তাই এটা একেবারেই অসম্ভব ও নিষিদ্ধ যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পর জন্মগ্রহণকারী অন্য কোনো ব্যক্তিকে নতুন করে নবুওয়ত দেয়া হবে, তার ওপর আল্লাহর বাণী ও ওহী নাযিল হবে এবং তার নবুওয়াতের স্বীকৃতি ঈমানের অংগ এবং অস্বীকৃতি কুফরীর কারণ হবে।

মির্যা গোলাম আহমদ যদি নবুওয়াতের দাবী না করতেন, তবুও তিনি যেভাবে ঈমান ও ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহে পরিবর্তন ও কুরআনের আয়াতসমূহের বিকৃতি সাধন করেছেন, (যার কিছু নমুনা ইতিপূর্বে তুলে ধরেছি) ইসলামের এই বিকৃতি তাকে কাফের বলে ঘোষণা করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে তিনি নবী ও রসূল হবার দাবী করে এবং এই দাবী অমান্যকারীদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে তার অপকর্ম ষোল কলায় পূর্ণ করেছেন। মির্যা গোলাম আহমদ প্রথমে কয়েকটি ছোটখাট দাবী তোলেন এবং সেগুলোর মাধ্যমে তার চূড়ান্ত ও সর্বশেষ দাবীর পথ সূচনা করতে থাকেন। ১৯০১ সাল পর্যন্ত তিনি খোলাখুলি নবুওয়াতের দাবী করার ধৃষ্টতা দেখাননি। কোথাও দাবী করলেও পরে তা অস্বীকারও করেন। এরপর তিনি সোজাসুজি নিজেকে নবী ও রসূল বলে দাবী করে বসেন। যদিও এর সাথে সাথে তিনি প্রত্যেক পর্যায়ে অন্যান্য নানা ধরনের দাবীও করতে থাকেন এবং নবুয়াতের দাবীকেও অন্যান্য আপেক্ষিক দাবীর মোড়কে ঢেকে পেশ করতে থাকেন, যাতে তার ভক্তরা ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে তার নিত্যনতুন দাবীগুলোকে সহায়তা ও গ্রহণ করার যোগ্য হয়ে ওঠে এবং বিরোধীদের ভেতরে সহসা কোনো মারাত্মক ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়। কিন্তু এতসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও তিনি যে শেষ সীমান্তে উপনীত হন, সে সীমান্ত একেবারেই স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট এবং এ জন্য নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো যথেষ্ট ঃ

“শেষ যামানায় একজন রসূলের আবির্ভাবের সম্ভাবনা প্রতীয়মান হচ্ছে এবং তিনিই প্রতিশ্রুত মসীহ।” (হাকীকাতুল ওহীর পরিশিষ্ট, পৃঃ ৬৫)।

“সত্য খোদা তিনি, যিনি কাদিয়ানে স্বীয় রসূল পাঠিয়েছেন। (দাফেউল বালা-পৃঃ ১১)।

“আমাকে বলা হয়েছে যে, এই আয়াতে তোমার কথাই বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ -

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তার রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, যাতে সে তাকে সকল ধর্মমতের ওপর বিজয়ী করে দিতে পারে।" (ইজাজে আহমাদী-পৃঃ ৭ ও রূহানী খাযায়েন-৩য় খন্ড, পৃঃ ১০)

"আমার দাবী এই যে, আমি নবী ও রসূল।" (রুহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৬)

১৯০৮ সালের ২৬শে মে তারিখে প্রকাশিত "আখবারে আম" পত্রিকায় তিনি লিখেছেন ঃ

"সুতরাং আমি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক নবী। এ কথা আমি যদি অস্বীকার করি, তবে আমার গুণাহ হবে। আর যে অবস্থায় আল্লাহ আমার নাম নবী রাখেন, তাকে আমি কি করে অস্বীকার করতে পারি। আমি এই দুনিয়া ত্যাগ করার মুহূর্ত পর্যন্ত এর ওপর বহাল থাকবো।" (রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১১)।

মির্যা গোলাম আহমদ যারা তাকে নবী বলে মানেনা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে কাফের আখ্যায়িত করেছেন। তার নিম্নোক্ত উক্তিসমূহ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

"যে ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবেনা, তোমার আনুগত্য স্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেনা এবং তোমার বিরোধী থাকবে, সে আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানীতে লিপ্ত জাহান্নামী।" (মিয়ারুল আখয়ার, পৃঃ ১২৯)

জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করলো ঃ যে ব্যক্তি আপনাকে শুধু নবী বলে মানেনা এবং যে ব্যক্তি আপনাকে কাফের বলে- এরা দুজনই কি কাফের? আপনি তো 'তিরইয়াকুল কুলুব' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমাকে নবী না মানলে কেউ কাফের হয়না, কিন্তু এখন আপনি লিখছেন যে, আমাকে কেউ অস্বীকার করলেই সে কাফের হয়ে যাবে। কোনটা ঠিক?

এর জবাবে মির্যা গোলাম আহমদ বলেন ঃ "আশ্চর্য্যের ব্যাপার, যে ব্যক্তি আমাকে কাফের বলে আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করে এই দুই ব্যক্তিকে দু'ধরনের মানুষ বলে সাব্যস্ত করছো? অথচ আল্লাহর কাছে তারা উভয়ে একই ধরনের মানুষ। কেননা যে ব্যক্তি আমাকে নবী মানেনা, সে আমাকে মিথ্যুক ও প্রতারক মনে করে বলেই মানেনা। অথচ আল্লাহ্ বলেন যে, আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা রটনাকারীই সবচেয়ে বড় কাফের। যেমন এক জায়গায় বলেন ঃ

فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيته -

অর্থাৎ দু'জন সবচেয়ে বড় কাফের। একজন আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা রটনাকারী। আর দ্বিতীয়জন হচ্ছে, আল্লাহর কালামকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। সুতরাং আমি যখন একজন মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর মতে, আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করেছি, তখন সে অবস্থায় আমি শুধু কাফের নই বরং বড় কাফের হয়ে গেছি। আর যদি আমি মিথ্যা রটনা না করে থাকি, তাহলে নিঃসন্দেহে সেই কুফরি তার উপরেই বর্তাবে। আলোচ্য আয়াতে

আল্লাহ্ এ কথাই বলেছেন। এ ছাড়া যে ব্যক্তি আমাকে নবী মানেনা, সে আল্লাহ্ ও তার রসূলকেও মানেনা। কেননা আমার সম্পর্কে আল্লাহ ও রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। রসূল (সঃ) জানিয়েছিলেন যে, শেষ যামানায় আমার উম্মতের মধ্য থেকেই প্রতিশ্রুত মাসীহ্ আসবেন। তিনি একথাও জানিয়েছিলেন যে, আমি মেরাজের রাতে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাওয়া নবীদের মধ্যে মাসীহ্ ইবনে মারিয়ামকে দেখে এসেছি। তাকে আমি দ্বিতীয় আকাশে শহীদ ইয়াহিয়ার কাছে দেখেছি। আল্লাহতায়ালা কুরআন শরীফে এ কথাও বলেছেন যে, মারিয়ামের পুত্র মাসীহ্ তিরোহিত হয়েছেন। আল্লাহ আমার সত্যতার সাক্ষ্য হিসাবে তিন লাখেরও বেশী ঐশী আলামত প্রকাশ করেছেন এবং আকাশে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ রমযান মাসে হয়েছে। এখন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের কথা বিশ্বাস করেনা, কুরআনকে অবিশ্বাস করে, ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর নিদর্শনগুলো অবজ্ঞা ও অস্বীকার করে এবং শত শত আলামত সত্ত্বেও আমাকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করে, সে কি করে মুমিন হয়। সে যদি মুমিন হয় তাহলে আমি মিথ্যুক হবার কারণে কাফের হয়ে যাই। কেননা তার দৃষ্টিতে আমি মিথ্যুক।" (হাকীকাতুল ওহি-পৃঃ ১৬৩-১৬৪)

আরো খানিকটা সামনে অগ্রসর হয়ে মির্যা গোলাম আহমদ লিখেছেন ঃ "কাফের হওয়া দু'রকমের। এক, ইসলামকেই অস্বীকার করা এবং রসূল (সঃ)কে অস্বীকার করা।"

দুই, প্রতিশ্রুত মাসীহকে বিশ্বাস না করা, যাবতীয় প্রমাণাদি আসা সত্ত্বেও তাকে মিথ্যুক মনে করা, আল্লাহ ও রসূল কর্তৃক এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে তাকে বিশ্বাস করা ও সত্য বলে মানার পুনঃ পুনঃ আদেশ দেয়া সত্ত্বেও তাকে বিশ্বাস না করা। সুতরাং আল্লাহ ও রসূলের আদেশ অমান্য করার কারণে সে কাফের। একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে এই উভয় রকমের কুফরি একই রকমের কুফরির আওতাভুক্ত। কেননা যে ব্যক্তি জেনে শুনে আল্লাহ ও রসূলের আদেশ মানেনা, সে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য বক্তব্য অনুসারে আল্লাহ ও রসূলকেই মানেনা, আর এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, যে ব্যক্তি প্রথম ধরনের কুফরীতে ও দ্বিতীয় ধরনের কুফরিতে লিপ্ত বলে অকাট্যভাবে প্রমাণিত, সে কেয়ামতের দিন জবাবদিহীর সম্মুখীন হবে।" (হাকীকাতুল ওহি, পৃঃ ১৭৯-১৮০)

উল্লিখিত উদ্ধৃতসমূহ থেকে এ কথা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মির্যা গোলাম আহমদ যে নবুওয়াত ও রিসালাতের দাবী করেছেন, চাই সেটা তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে প্রতিকী বা ছায়া নবুওয়াত হোক, কিংবা তাঁর স্বকথিত মতানুসারে তাতে মুহাম্মদ (সঃ) এর সিলমোহর লাগানো থাক, মির্যা গোলাম আহমদ ও তাঁর অনুসারীদের মতে যে ব্যক্তি তাকে নবী বলে মানবেনা, সে কাফের ও অমুসলিম এবং কিয়ামতের দিন জবাবদিহীর সম্মুখীন ও জাহান্নামী হবে। অপর দিকে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মতে মির্যা গোলাম আহমদকে সত্য নবী ও তার দাবীকে সত্য দাবী বলে মান্যকারীরা সবাই কাফের ও ইসলাম থেকে খারিজ। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, মুসলমানদের কোনো কোনো ফেরকা বা উপদলের (যেমন শীয়া, সুন্নী, দেওবন্দী ও বেরেলবী) কেউ কেউ

একে অপরকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়ে বসে। (আমরা এরূপ ফতোয়া দেয়ার বিরোধী) কিন্তু তাদের কেউ নিজের কোনো পদ বা দাবীকে অস্বীকার করার কারণে কাফের ফতোয়া দেয়না। আর এমন কথাও বলেনা যে, তার কাছে আল্লাহর ওহি বা ইলহাম এসেছে।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফতোয়া

মুসলমানদের সম্পর্কে মির্যা গোলাম আহমদ ও তার পুত্রদের ধারণা ও বিশ্বাস কেমন, তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দেখে অনুমান করা যায়। মির্যা গোলাম আহমদ নিজের এক পুত্র মির্যা বশীর আহমদকে (এম,এম, আহমদের পিতা) কামারুল আম্বিয়া (নবীদের চাঁদ) উপাধি দিয়েছেন। মির্যা বশীর আহমদ লিখেছেন ঃ

"হযরত মূসাকে (আঃ) মানে কিন্তু হযরত ঈসাকে (আঃ) মানেনা, অথবা হযরত ঈসা (আঃ)কে মানে কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সঃ)কে মানেনা, অথবা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে মানে কিন্তু প্রতিশ্রুত মাসীহকে মানেনা- এমন প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু কাফের নয় বরং কট্টর কাফের এবং ইসলাম থেকে খারিজ।" (কালেমাতুল ফযল, মির্যা বশীর আহমদ কাদিয়ানী, পৃঃ ১১০)

মির্যা বশীর অন্যত্র লিখেছেনঃ "রসূল (সঃ) খৃস্টানদের সাথে যেরূপ আচরণ করেছিলেন, হযরত প্রতিশ্রুত মাসীহ (মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) তাকে অবিশ্বাসকারী তাবত অ-আহমাদীদের সাথে কেবলমাত্র সেইরূপ আচরণেরই অনুমতি দিয়েছেন। অ-আহমদীদের থেকে আমাদের নামাযও আলাদা করা হয়েছে। তাদের সাথে মেয়ে বিয়ে দেয়া হারাম করা হয়েছে। তাদের জানাযা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এখন তাদের সাথে মিলে মিশে আমরা করতে পারি এমন আর কি বাকী রইল? দু'ধরনের সম্পর্ক হয়ে থাকে। একটা ধর্মীয় আর একটা দুনিয়াবী বা বৈষয়িক। ধর্মীয় সম্পর্কের প্রধান উপকরণ হচ্ছে একত্রে ইবাদাত করা। আর দুনিয়াবী সম্পর্কের মাধ্যম হচ্ছে বিয়ে শাদী। এই দুটো মাধ্যমই আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি বলতে চাও যে, তাদের মেয়ে বিয়ে করার অনুমতি আছে, তবে আমি বলবো যে, খৃস্টানদের মেয়েও বিয়ে করার অনুমতি আছে। আর যদি বল যে, অ-আহমদীদেরকে সালাম করা হয় কেন, তবে তার জবাব এই যে, রসূল (সঃ) কখনো কখনো ইহুদীদেরকেও সালামের জবাব দিয়েছেন।" (কালেমাতুল ফযল, ১৯৬ পৃঃ)

মির্যা গোলাম আহমদের মেজ ছেলে মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লিখেছেন ঃ "প্রতিশ্রুত মাসীহের কাছে আনুগত্যের শপথ বা বায়য়াত করেনি- এমন সকল মুসলমান কাফের ও ইসলামের আওতা বর্হিভূত, চাই তারা হযরত প্রতিশ্রুত মাসীহের নামও না শুনে থাক না কেন।" (আয়েনায়ে সাদাকাত-পৃঃ ৩৫)

মির্যা বশীরুদ্দীনের একটা বক্তৃতা ২২শে আগস্ট ১৯১৭ এবং আরেকটা বক্তৃতা ৩০ জুলাই ১৯৩১, আল-ফজল পত্রিকায় ছাপা হয়। সে বক্তৃতা থেকে দুটো উদ্ধৃতি যথাক্রমে

নিম্নে দেয়া যাচ্ছে ঃ “হযরত প্রতিশ্রুত মাসীহ বলেছেন যে, তাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) ইসলাম আলাদা, আর আমাদের ইসলাম আলাদা। তাদের খোদা আলাদা এবং আমাদের খোদা আলাদা। আমাদের হজ্ব আলাদা এবং তাদের হজ্ব আলাদা। এভাবে তাদের সাথে সব কিছুতেই আমাদের বিরোধ রয়েছে।”

“এটা ভুল কথা যে, অন্যান্য লোকদের সাথে আমাদের মতভেদ শুধু হযরত ঈসা (আঃ) ইন্তিকাল করেছেন কি করেননি তা নিয়ে। আল্লাহ, রসূল (সঃ), কুরআন, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, মোট কথা প্রত্যেকটা জিনিসে তাদের সাথে আমাদের মত বিরোধ রয়েছে।”

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মতভেদ একেবারেই মৌলিক, নীতিগত ও সর্বাত্মক। এ মতভেদ কুফরী ও মুসলমানিত্বের মতভেদ। এর একমাত্র সমাধান এই যে, কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করতে হবে। তাদের সামাজিক মর্যাদা ও জনসংখ্যা অনুপাতে তাদের অধিকার এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তৎপরতার সীমা নির্ধারণ করতে হবে। (তরজমানুল কুরআন, জুলাই-১৯৭৪)

জনৈক কাদিয়ানী প্রচারকের চিঠি

[কাদিয়ানীরা আজকাল তাদের বিভ্রান্তির ও বিভেদাত্মক অপতৎপরতা খুবই জোরেশোরে চালিয়ে যাচ্ছে। সারদেশে তারা পোস্টার লাগিয়ে ও বই পুস্তক বিতরণ করে চলেছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে তারা চিঠিও লিখছে। এ ধরনের একটা চিঠি আমার নামেও ডাকযোগে এসেছিল। আমিও ডাকযোগে তার জবাব পাঠিয়ে দিয়েছি। পাঠকদের কৌতূহল ও উপকারীতার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত চিঠি ও তার জবাব তরজমানুল কুরআনে ছাপা হলো।]

আপনার পুস্তক “খিলাফত ও মুলুকিয়াত পর ইতিরাজাত কা তাজযিয়া” (খিলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থ সংক্রান্ত আপত্তিসমূহের পর্যালোচনা) অধ্যয়ন করছি। তরজমানুল কুরআনেও আপনার লেখাগুলো আমি পড়ে থাকি। আমার ধারণা, আপনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি, ঠান্ডা মাথার মানুষ, ধীরস্থির ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও হিংসাবিদ্বেষ মুক্ত উদার ও সহনশীল ব্যক্তি। সত্য কথা যার বিরুদ্ধেই যাক, তাকে সত্য বলে মেনে নেবার মত সহিষ্ণুতা আপনার আছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এম, এ পরীক্ষা দেয়ার পর কয়েক বছর ইউরোপে কাটিয়েছি এবং সেখানে ইসলামের সমর্থনে প্রবন্ধাদি লিখেছি। ধর্মীয় বিষয়াদি এবং কুরআন ও হাদীসের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ বিদ্যমান। তরজমান এবং মাওলানা মওদূদীর কয়েকটা বইও পড়েছি। আহমদিয়া জামায়াতের মত এই যে, যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার রসূল (সঃ)কে পূর্ণ মর্যাদা সহকারে খাতামুন্নাবীয়ীন (নবীদের মোহর তথা শেষ নবী) বলে বিশ্বাস করেনা, তার ওপর আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের ও সকল মুমিনের অভিসম্পাত। আর যে ব্যক্তি

আহমদীদের এই আকীদা বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও এ কথা বলে যে, আহমদীরা রসূল (সঃ)কে খাতামুন্নবীয়ীন বলে বিশ্বাস করেনা, তার আচরণ দুঃখজনক।"

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত চিঠির সাথে কাদিয়ানীদের মুখপত্র "আল ফজল"-এর কয়েকটা লেখার অংশ বিশেষও পাঠানো হয়েছে, যাতে শঠতা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে এ কথা বুঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছে যে, খতমে নবুওয়ত (নবুওয়তের সিলমোহর সংক্রান্ত আকিদা) সত্ত্বেও নতুন করে নবুওয়ত চালু করা সম্ভব এবং বৈধ। রসূল (সঃ)কে যে নবীদের সিলমোহর (খাতুমুন্নাবীয়ীন) বলা হয়েছে তার অর্থ তিনি নবুওয়তের ধারা সমাপণকারী ও বিলোপকারী সিলমোহর নয়, বরং আল্লাহ মাফ করুন, ডাক বিভাগীয় ধরনের সিলমোহর, যা দ্বারা নবুওয়তের প্রেরণ ও বিতরণ চিরদিন চালু থাকবে।

চিঠির জবাব

আপনার চিঠি ও সেই সাথে "আল ফজল" পত্রিকার কাটিংগুলো পেয়েছি। পত্রিকার কাটিং পাঠানোর কষ্টটা আপনি খামাখাই করেছেন। মির্যা গোলাম আহমদ ও তার অনুসারীদের লেখা ও তাদের ধ্যান-ধারণা আমার অজানা নয়। ১৯০১ সালে মির্যা গোলাম আহমদ নবী ও রসূল হবার দাবী করেন। তার আগে যদি মির্যা সাহেব নবুওয়াতের দাবী না করে থাকেন অথবা দাবী করতে অস্বীকার করে থাকেন, তবে নবুওয়তের দাবী করার পর আর সেই অস্বীকৃতির কোনো মূল্য থাকেনা। ১৯০১ সালের আগে মির্যা গোলাম আহমদ নিজেই যে কোনো নবুওয়াতের দাবীদারকে কাফের মনে করতেন। আমি মির্যা গোলাম আহমদকে এবং তার নবুওয়াত স্বীকারকারীদেরকে সম্পূর্ণ কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত মনে করি।

মির্যা গোলাম আহমদ শুধু যে একজন ভন্ড নবুওয়াতের দাবীদার তা নয় বরং তার অধিকাংশ লেখা ভাষাগত ত্রুটি, মিথ্যা, শঠতা, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। আমি মনে করি, যে ব্যক্তি তাকে নবী অথবা মুজাদ্দিদ বলে বিশ্বাস করে, সে নবী ও মুজাদ্দিদের পদ সম্পর্কে অত্যন্ত নিকৃষ্ট, অসম্পূর্ণ ও নিচু মানের ধারণা পোষণ করে। আমি মির্যা গোলাম আহমদের "শাহাদাতুল কুরআন" নামক একখানা বইকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরছি। এতে মির্যা গোলাম আহমদ দাবী করেছেন যে, আল্লাহ তাকে প্রতিশ্রুত মাসীহ ও মাসীহের অবতার বানিয়ে নিজের পক্ষ থেকে সেই সব পাশ্চাত্য জাতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছেন, যারা ইয়াজুজ মাজুজ ও দাজ্জালের দোসর। এই বই এর ৮০ পৃষ্ঠারও বেশী জায়গা জুড়ে কেবল এই সব দাবী ও তার পক্ষের যুক্তি প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অবান্তর আলোচনার পর সর্বশেষে মির্যা সাহেব "সরকারের মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন" শিরোনামে লিখেছেন ঃ

সরকারের মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন

"এই অধম সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় নিবেদন করছে যে, যেহেতু আমার পিতা মরহুম মির্যা গোলাম মোর্তজার আমল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের পরিবার বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহধন্য রয়েছে, তাই কোনো রকমের কৃত্রিমতার বশে নয় বরং সত্যিকার অর্থেই এই মহৎ সরকারের কৃতজ্ঞতা আমার শীরা ও ধমনীতে মিশে আছে। আমার মরহুম পিতা এই সরকারের শুভাকাংখী হিসাবে যে সেবা করে গেছেন, তা তার জীবনী থেকে কোনো ক্রমেই বাদ পড়তে পারেনা। তিনি নিজের মর্যাদা ও ক্ষমতা অনুসারে সর্বদা সরকারের সেবায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ও বিভিন্ন প্রয়োজনের সময় এমন সততা ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন, যা কোনো মানুষ খাঁটি মনে কারো হীতাকাংখী না হলে প্রদর্শন করতে পারেনা। সাতান্ন সালের (অর্থাৎ ১৮৫৭) গোলযোগের সময় যখন অসভ্য লোকেরা আপন মহোপকারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দেশে বিশৃংখলার সৃষ্টি করলো, তখন আমার মরহুম পিতা নিজের পকেট থেকে পঞ্চাশটি ঘোড়া কিনে এবং পঞ্চাশজন ঘোড় সওয়ার সৈন্য সংগ্রহ করে সরকারের হাতে তুলে দেন। অন্য এক সময়ে চৌদ্দজন ঘোড় সওয়ার দিয়ে সরকারের সেবা করান। এ সব সেবাকর্মের দরুন তিনি সরকারের প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। এ কারণে বড় লাট বাহাদুরের দরবারে তিনি সম্মানজনক আসন লাভ করতেন এবং সকল পর্যায়ের বৃটিশ কর্মকর্তা ও কর্মচারী তার সাথে খুবই মর্যাদাপূর্ণ ও আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি আমার ভাইকে শুধুমাত্র সরকারের সেবার খাতিরে কোনো কোনো যুদ্ধে পাঠিয়েছেন এবং প্রত্যেক পর্যায়ে সরকারের সন্তোষ অর্জন করেছেন। এভাবে গোটা জীবনই তিনি সুনামের সাথে কাটিয়ে এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় হন। এরপর আমার বড় ভাই মির্যা গোলাম কাদের যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনিও মরহুম পিতার অনুকরণে সরকারের একনিষ্ঠ সেবায় নিয়োজিত থাকেন। অতঃপর তিনিও এই মুসাফিরখানা থেকে বিদায় নিয়ে যান। আমি মনে করি, এখনো এমন বহু বৃটিশ কর্মচারী বেঁচে আছেন, যারা আমার পিতাকে ও তার নিষ্ঠাপূর্ণ সেবাকর্মকে স্বচক্ষে দেখেছেন। তাঁদের মধ্যে মিঃ গ্রিফেন অন্যতম। তিনি পাঞ্জাবের নেতৃস্থানীয় লোকদের সম্পর্কে একখানা বইও লিখেছেন এবং তাতে আমার মরহুম পিতার কথাও প্রশংসা সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।"

ইংরেজদের চাটুকারিতায় মির্যা গোলাম আহমদ আরো লিখেছেন ঃ "বৃটিশ এমন একটি জাতি, যাদেরকে আল্লাহতায়ালা প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য এবং বিদ্যাবুদ্ধির দিকে টেনে নিতে চান এবং যারা সততা ও ইনসাফে ক্রমাগত উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর আধুনিক ও প্রাচীন জ্ঞান বিজ্ঞানে তো তারা নদীর মত প্রবহমান। এ জন্য আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি যে, আল্লাহ এই সম্পদ অর্থাৎ ঈমানের সম্পদও তাদেরকে দেবেন। বরঞ্চ আমার জানা মতে ভেতরে ভেতরে তিনি এ সম্পদ তাদের হৃদয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সে যাই হোক, যখন আল্লাহ আমাদের শারীরিক ও পার্থিব বিষয়ে এই জাতির মধ্য থেকে আমাদের জন্য সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আমরা এই

সরকারের এত অনুগ্রহ ও বদান্যতা উপভোগ করেছি, যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সহজ কাজ নয়। তাই আমরা আমাদের সম্মানিত সরকারকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের মতই এ সরকারের অনুগত ও হীতাকাংখী। আমাদের হাতে দোয়া ছাড়া আর কি আছে? তাই আমরা দোয়া করি যে, আল্লাহ এই সরকারকে যাবতীয় অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন এবং তার শত্রুদেরকে অবমাননাকরভাবে পর্যুদস্ত করেন। স্বয়ং আল্লাহতায়ালার শোকর আদায় করা যেমন ফরয,আল্লাহ এই মহানুভব সরকারের কৃতজ্ঞতাও আমাদের ওপর তেমনি ফরয করেছেন। কাজেই আমরা যদি এই মহোপকারী সরকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করি অথবা আমাদের মনে তার প্রতি কোনো অশুভ ইচ্ছা থাকে, তাহলে তার অর্থ হবে এই যে, আমরা আল্লাহ তায়ালারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলামনা। কেননা আল্লাহতায়ালার শোকর করা এবং এমন কোনো মহানুভব সরকারের শোকর করা-যাকে আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে নিয়ামত হিসাবে দান করেন– মূলতঃ একই জিনিস এবং পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে ছেড়ে দিলে অপরটিও অনিবার্যভাবেই ছেড়ে দিতে হয়। কোনো কোনো বেকুফ প্রশ্ন করে থাকে যে, এই সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা জায়েয কিনা। স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের এ প্রশ্ন অত্যন্ত নির্বোধসুলভ প্রশ্ন। কেননা যে সরকারের অনুগ্রহের শোকর করা ফরয, তার সাথে আবার জেহাদ কিসের? আমি সত্যি সত্যি বলছি, উপকারীর অকল্যাণ কামনা চরম বদকার ও অসৎ লোকের কাজ। কাজেই আমার মত আমি বার বার ব্যক্ত করছি যে, ইসলামের দুটো অংশ। এক হলো, আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালন ও আনুগত্য করা। দ্বিতীয়ঃ সেই সাম্রাজ্যের আনুগত্য করা যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে, যে জালেমদের কবল থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে নিজের নিরাপদ ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছে। সেই সাম্রাজ্য হচ্ছে বৃটিশ সরকার।

যদিও একথা সত্য যে, ইউরোপের জাতিগুলোর সাথে আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে এবং আল্লাহ সম্পর্কে তারা যে ধরনের ধারণা পোষণ করেন, আমরা তা করা পছন্দ করিনা। কিন্তু রাষ্ট্র ও প্রজার সম্পর্কের সাথে এইসব ধর্মীয় বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, যে সরকারের অধীনে শান্তির সাথে বাস করতে পার, তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত থাকো। কাজেই আমরা যদি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি, তবে তার অর্থ হবে এই যে, আমরা ইসলাম, খোদা ও রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি। সেক্ষেত্রে আমাদের মত অসৎ আর কে হবে? কেননা আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে আমরা বর্জন করেছি।.....একথাও মনে রাখা চাই যে, যে রাজার অধীন আমরা নিরাপদ জীবন যাপন করি, সে সরকারের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা স্বয়ং আল্লাহর অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক থাকারই নামান্তর। আর যখন আমরা এরূপ কোনো রাজার আনুগত্য করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহর ইবাদত করি। ইসলামের শিক্ষা কি এমন হতে পারে যে, আমরা নিজেদের অনুগ্রহকারীর সাথে খারাপ আচরণ করবো? যে আমাদেরকে সুশীতল ছায়ায়

আশ্রয় দেয়, তার ওপর অগ্নিবর্ষণ করবো? যে আমাদেরকে খাবার দেয়, তাকে পাথর ছুড়ে মারবো? যে ব্যক্তি তার সাথে সদাচরণকারীর সাথে খারাপ আচরণ করার কথা চিন্তাও করে, তার চেয়ে খারাপ মানুষ আর কে হতে পারে? ....১৮৫৭ সালে যা কিছু গোলযোগ হয়েছে, তাতে মূর্খ ও অসৎ লোকেরা ছাড়া কোনো সভ্য, সৎ ও জ্ঞানী মুসলমান অংশ নেয়নি। .....এরপরেও এমন ব্যক্তির ওপর এই অপবাদ আরোপ করা যে, সে বৃটিশ সরকারের বিরোধী এবং তার লেখা বই সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করা যে, তা বৃটিশ সরকারের বিরোধী, চরম পর্যায়ের বেঈমানী ও শয়তানি কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের শুভাকাংখীরা ও ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা এইসব প্রলাপ বকা হিংসুটে লোকদের এ ধরনের কুৎসা রটনায় কান দেবেননা এবং এই বই-এর লেখক সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা পোষণ করবেনা। সরকারের ব্যাপারে আমরা আগেই নিশ্চিত যে, তারা লেখক সম্পর্কে এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেননা, বরং যে ব্যক্তি এসব কথা সরকারের গোচরীভূত করবে, তাকেই তার মিথ্যা প্রচারণার জন্য তিরস্কার করবেন।"

"বস্তুত এই অধম তৃতীয় খন্ডে ইংরেজ সরকারেরও যত শোকর আদায় করেছে, তা শুধু নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে করেনি, বরং কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের সুমহান শিক্ষাই আমাকে এই শোকর আদায় করতে বাধ্য করেছে।"

বৃটিশ সরকারের এত চাটুকারিতা করার পরও অধিকতর দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, এই বই-এর পরিশিষ্টে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী স্বীয় পিতা মির্যা গোলাম মোর্তজা সাহেবের সেইসব সনদ ও সার্টিফিকেটের মূল ইংরেজী ভাষা ও তার ফার্সি অনুবাদ দিয়েছেন, যা তাকে মিঃ জে, নিকলসন ও লাহোরের কমিশনার রবার্ট কাষ্ট এবং পাঞ্জাবের ফাইনান্সিয়াল কমিশনার স্যার রবার্ট এজার্টন অত্যন্ত সন্তুষ্ট, মুগ্ধ হয়ে দিয়েছিলেন। আমি মনে করি যে, মির্যা গোলাম মোর্তজা সাহেবের বৃটিশের আনুগত্য ও নেমক হালালী এত দুঃখজনক ও নিন্দনীয় নয়, যতটা লজ্জাকর এই ব্যক্তির আচরণ, যিনি স্বীয় পিতার জীবনীর এই কালো অধ্যায়টিকে গর্ব ভরে সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরছে। সে যে প্রতিশ্রুত মাসীহ, মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) ও আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হবার দাবীদার, সেই কথা ভেবে অন্তত: কিছুটা লজ্জাবোধ করা তার উচিত ছিল। তদুপরি এই তথাকথিত নবীর অনুসারীদের এ আচরণও দেখার মত এবং কৌতুকপ্রদ যে, তারাও নিজেদের "কলম সম্রাটের" এই সব ইলহাম প্রকাশ ও প্রচার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনা। আমি এই পুরো উদ্ধৃতি দিয়েছি "শাহাদাতুল কুরআন" বইটির ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত সংস্করণের শেষ ষোল পৃষ্ঠা থেকে।

মির্যা গোলাম আহমদ স্বীয় পুস্তক "শাহাদাতুল কুরআন"-এর ২৭ পৃষ্ঠায় "আমার উম্মাতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের মত" এই বহুল প্রচলিত কথাটাকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে নিজের প্রতিশ্রুত মাসীহ হবার যুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। অথচ ঐ কথাটা কোনো বিশুদ্ধ হাদীসে নেই। অনুরূপ, কোনো

মুহাদ্দিসও এ কথাটাকে হাদীস বলে স্বীকার করেননি। এই বই এর ৪১তম পৃষ্ঠায় মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে. "বুখারীতে লেখা আছে যে, 'আকাশ থেকে তার পক্ষে এই মর্মে আওয়াজ আসবে যে, هذا خليفة الله المهدى - "ইনি আল্লাহর প্রতিনিধি মাহদী"। তখন চিন্তার বিষয় যে, এ হাদীস কিরূপ মর্যাদা রাখে যে, তা "আল্লাহর কিতাবের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ" বলে খ্যাত বুখারীতে স্থান পেয়েছে।" এটাও মির্যা গোলাম আহমাদের মিথ্যা প্রচারণা। এ ধরনের কোনো হাদীস সহীহ বুখারীতে নেই। মির্যা সাহেবের এই বইতে জনৈকা মহিলার সাথে প্রতিশ্রুত বিয়ের ব্যাপারে একটি ভাবিষ্যদ্বাণী ও হুমকির উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর উদ্ধৃতি দেয়াও সুস্থ রুচির পক্ষে বেমানান এবং তার সবই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। এই হলো "শাহাদাতুল কুরআন" (কুরআনের সাক্ষ্য) নামক বই এর বক্তব্যের মান। এতদসত্ত্বেও যে ব্যক্তি এর লেখককে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে এবং তাকে নবী বা মুজাদ্দিদ বলে মানে, তার জ্ঞান বুদ্ধি ও বিশ্বাসের উপর পরিতাপ করা ছাড়া আর কিছু করার নেই।

মির্যা গোলাম আহমদ ও তার অনুসারীরা কুরআন ও সহীহ হাদীসমূহের ভাষায় এত রদবদল ও বিকৃতি ঘটিয়েছেন যে, যা সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহকে অস্বীকার করার শামিল। ইহুদী ও খৃস্টানরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থে এ ধরনেরই বিকৃতি ঘটিয়েছিল। সূরা মায়েদায় তাদের এই বিকৃতি ঘটানো প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ
يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ -

"তারা শব্দগুলোকে ওলটপালট করে অর্থ বিকৃত করে ফেলতো এবং আল্লাহর কিতাবের আসল অর্থ সুনির্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও আসল অর্থ পাল্টে ফেলতো।" উদাহরণস্বরূপ, কুরআন শরীফের সূরা সাফফের ৬নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ -

"স্মরণ কর, যখন মারিয়ামের পুত্র ঈসা বলেছিল যে, হে বনী ইসরাঈল, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার আগেই বিদ্যমান তাওরাত গ্রন্থের সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহমদ নামক যে রসূল আসবেন তার সম্পর্কে সুসংবাদদাতা।"

হযরত ঈসা মাসীহ আলাইহিস সালামের এই ভবিষ্যদ্বাণী কুরআনে ও ইনজীলে

বর্ণিত হয়েছে। ইনজীলের এই ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর সেন্ট পলের অনুসারী খৃস্টানরা এমন হাত সাফাই করলো যে, ইনজীলের মূল শব্দে রদবদল ঘটিয়ে এবং তার ভুল অনুবাদ করে তাকে একবারেই ভিন্ন রকম বানিয়ে ফেললো। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা মাসীহের আসল ও প্রত্যক্ষ সাহাবী ও শিষ্য বারনাবাস যে ইনজীল সংরক্ষণ করেছিলেন, তাতে আজও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম অবিকৃত রয়েছে।

এরপর ভন্ড নবী ও ভন্ড মাসীহ গোলাম আহমদ ও তার উম্মাত খৃস্টানদের অনুকরণে কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াতে এরূপ বিকৃতি ঘটালো যে, আয়াতে বর্ণিত আহমদের অর্থ করলো গোলাম আহমদ এবং হযরত ঈসা মাসীহ (আঃ) তাঁর পরে আগমনকারী রসূল (সাঃ) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাকে নিজের ওপর প্রয়োগ করার নোংরা ধৃষ্টতা দেখাতে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করলোনা। আমি জানতে চাই যে, মির্যা গোলাম আহমদের পিতা গোলাম মোর্তজা যখন তার নাম গোলাম আহমদ অর্থাৎ আহমদের গোলাম রেখেছিলেন, তখন তিনি তাকে যে আহমদের গোলাম বানাতে চেয়েছিলেন, তিনি কি আরবের সেই আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন? পরিতাপের বিষয় যে, গোলাম আহমদ নিজেকে আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম বা অনুসারী প্রমাণ করার পরিবর্তে চরম নির্লজ্জভাবে নিজেকে হযরত ঈসা মাসীহের (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিল, যা ছিল আসলে আমাদের মহান নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত। কাদিয়ানীদের প্রচার কেন্দ্র রাবওয়া থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত "দ্বীনী মালুমাত" (ধর্মীয় তথ্য) নামক পুস্তিকাটিতেও মির্যা গোলাম আহমদকেই এ আয়াতের লক্ষ্য বলা হয়েছে। আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে কাদিয়ানীরা যেসব প্রচারপত্র ছড়িয়েছে, আমি দেখেছি যে, তাতে বিভিন্ন জায়গায় মির্যা গোলাম আহমদের নাম শুধু আহমদ লেখা হয়েছে।

যে ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা নিয়ে মির্যা গোলাম আহমদ ও তার সাংগ পাংগরা কুরআন শরীফের এই আয়াতে বিকৃতি ঘটিয়েছে, সেই একই ধরনের স্পর্ধা ও নির্লজ্জতা নিয়ে তারা খাতামুন্নাবীয়ীন সংক্রান্ত আয়াতে এবং মাসীহের পুনরাবির্ভাব ও খতমে নবুওয়াত সংক্রান্ত বিশুদ্ধ হাদীসগুলোতেও ব্যাখ্যার নামে বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা চালিয়েছে। মাওলানা মওদূদীকৃত সূরা আহযাবের তাফসীর, খতমে নবুওয়াত, কাদিয়ানী সমস্যা ও বিচারপতি মুনীরের তদন্ত কমিশনে প্রদত্ত তৃতীয় জবানবন্দীতে এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। অন্যান্য আলেমগণও এ ব্যাপারে অনেক কিছু লিখেছেন এবং যাবতীয় তত্ত্ব তথ্য ও অকাট্য যুক্তি প্রমাণের সমাবেশ ঘটিয়ে এ সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও যদি কাদিয়ানীরা বলে যে, আমরা খতমে নবুওয়াতও মানি আবার নতুন নবীর আগমনও সম্ভব মনে করি, তাহলে সেটা হবে খৃস্টানদের এ কথা বলার সমতুল্য যে, আমরা একত্ববাদেও বিশ্বাস করি, ত্রিত্ববাদেও বিশ্বাস করি। তারা বলে থাকে যে, তিন খোদার মধ্যেও এক খোদা আবার এক খোদার

মধ্যেও তিন খোদা। ঈসা মসীহ (আঃ) তাদের মতে আদম (আঃ) এর পুত্র আবার আল্লাহরও পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ) এ ধরনের কুযুক্তি ও অপব্যাখ্যা আসলে অস্বীকৃতিরই শামিল এবং এসব অপব্যাখ্যা দ্বারা তাদের কাফের হওয়া কোনো মতেই ঠেকানো যায় না। আমি সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এবং মন ও বিবেকবুদ্ধির পূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে তাদেরকে কাফের ও ইসলাম বহির্ভূত বলে বিশ্বাস করি। যতক্ষণ তারা কুফরি পরিত্যাগ না করে এবং মির্যা গোলাম আহমদের নবুওয়াতকে প্রত্যাখ্যান না করে, ততক্ষণ তাদেরকে মুসলমান মানতে পারিনা।

আপনি আমার লেখা বই পড়ে আমাকে বিদ্বান ও বিদ্বেষমুক্ত মানুষ উপাধিতে ভূষিত করেছেন ঠিকই। কিন্তু আপনি আমাকে মানুষের সাথে সাথে মুসলমানও মনে করেন কিনা তা জানা গেলনা। আমার এই চিঠি পড়ার পর আপনি আমাকে কি মনে করবেন বা করবেননা, তাও আমার জানা নেই। যা হোক, আমি আমার সাধ্যমত সত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ আপনাকে সত্য গ্রহণের তাওফিক দিন। আমার কিছু কিছু কথা হয়তো আপনার কাছে কটু লাগবে ও অপছন্দ হবে, কিন্তু এই মিথ্যা, ভন্ড ও মনগড়া নবুওয়ত আমাদের হৃদয়কে যেভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে, তাতে আমরা এতটুকু কটু বাক্য উচ্চারণে বাধ্য। যেসব জঘন্য নোংরা ইলহামী কথাবার্তা মির্যা সাহেব মুসলিম জনগণকে উপহার দিয়েছেন, তার সাথে আমার এই কথাগুলোর কোনো তুলনাই করা চলেনা।

সত্যের অনুসারীকে সালাম। (তরজমানুল কুরআন, ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

নবীর আগমন দ্বারা কি বুঝায়?

কাদিয়ানীদের ধারণা যে, হযরত ঈসা (আঃ) এর পুনরাবির্ভাবের ধারণা মুসলমানদের ভুল বুঝাবুঝির ফল। তাঁর পরিবর্তে মির্যা সাহেব হযরত ঈসার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বিকল্প ব্যক্তি হিসেবে এসেই গেছেন। কিন্তু লোকেরা তাকে চিনতে পারেনি। বরং তার সাথে ইচ্ছামত আচরণ করেছে। আসলে মির্যা সাহেবেরই আসার কথা, দুই হাজার বছর আগে আগত হযরত ঈসার নয়।

এ ধারণার সমর্থন মেলে তাফহীমুল কুরআনের একটি বক্তব্য থেকে। তাফহীমুল কুরআনের ৪র্থ খন্ডের পৃঃ ৩০৫-৩০৬-এর এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

"হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত ঈসার (আঃ) আবির্ভাবকালে সাধারণভাবে ইহুদীরা তিনজন আগমনকারীর প্রতীক্ষা করছিল। এক, হযরত ইলিয়াস, দুই-হযরত ঈসা মাসীহ এবং তিন-"সেই নবী", হযরত ঈসা (আঃ) এই বলে তাদের ভুল ধারণার অপনোদন করলেন যে, ইলিয়া তো এসেই গেছে......এ দ্বারা হাওয়ারীরা অর্থাৎ হযরত ঈসার (আঃ) অনুসারীরা আপনা আপনি জেনে গেল যে, আসলে আগমনকারী হচ্ছেন হযরত ইয়াহিয়া, আটশ' বছর পূর্বে আগত হযরত ইলিয়াস নয়।"

অনুগ্রহপূর্বক জানাবেন যে, নবীর পুনরাগমনের অর্থ কি তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ

কোনো বিকল্প ব্যক্তির আগমন?

জবাব ঃ তাফহীমুল কুরআনের যে উক্তি আপনি উদ্ধৃত করেছেন, তা দ্বারা কাদিয়ানী নবীর সমর্থনও হয়না, মুসলমানদের কোনো ধারণা বিশ্বাস খন্ডনও হয়না। হযরত ইয়াহিয়ার যে উক্তি বাইবেলে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটা যদি সত্যিই হযরত ইয়াহিয়ার উক্তি হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ এই যে, হযরত ইলিয়াস আগেই এসে গেছেন। তখন কোন ইলিয়াস বা তার সাদৃশ্যপূর্ণ বিকল্প আসবেনা। বরং আমি (ইয়াহিয়া) নতুন এক নবী হয়ে এসেছি। ইয়াহিয়া (আঃ) যদি বলতেন যে, আমি ইলিয়াসের সাদৃশ্য বা সমকক্ষ বিকল্প ব্যক্তি এবং আমার আগমনকে ইলিয়াসেরই পুনরাবির্ভাব ধরে নাও। যিনি আসলে ইন্তিকাল করেছেন, তাহলে অবশ্য কাদিয়ানীদের নিজেদের সপক্ষে একটা যুক্তি খাড়া করার অবকাশ ছিল।

এটা আসলে কাদিয়ানীদের অন্তসারশূন্য ও বিভ্রান্তিকর অপব্যাখ্যার চেষ্টা। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে বাঁচতে চায়, তারা তেমনি নিজেদের মিথ্যা নবুওয়তকে যেন তেন প্রকারে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, স্বয়ং মারিয়ামের পুত্র ঈসারই পুনরাগমন ঘটবে, ঈসার সদৃশ কোনো বিকল্প ব্যক্তি জন্ম নেবেনা। হাদীসেও মারিয়ামের পুত্রের অবতরণের উল্লেখ রয়েছে। মাসীহের সদৃশ কেউ বা কোনো প্রতিশ্রুত মাসীহ আসবে- এমন কথা কোথাও নেই। এই সব সদৃশ, অবতার ইত্যাদির ধারণা সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী ও পৌত্তলিক ধারণা। এ হচ্ছে অবতারবাদ বা তিব্বতের দালাইলামা সংক্রান্ত মতবাদের চর্বিত চর্বন। এসব মতবাদ অনুসারে একটি আত্মা বিভিন্ন দেহ ধারণ করে বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে বারবার আগমন করে থাকে। আমাদের মতে, যখন আসবেন তখন খোদ হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ামই আসবেন, যিনি ইতিপূর্বে নবী হয়ে এসেছিলেন। আমরা আগে থেকেই এই বিশ্বাস পোষণ করে আসছি। (তরজমানুল কুরআন, জুলাই, ১৯৭৭)

যাকাত ও সদকার বিধান

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর পথে ব্যয় ও যাকাত সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের আপনার কাছ থেকে জবাব চাই। পবিত্র কুরআন বলে ঃ "তারা জিজ্ঞাসা করে, তারা কি ব্যয় করবে? তুমি বলে দাও, প্রয়োজন পুরণের পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে।"

এখানে দুটো প্রশ্ন উঠে ঃ

১. প্রয়োজনের সীমা ও সংজ্ঞা কি? প্রয়োজন সম্পর্কে প্রত্যেকেরই ধারণা ভিন্ন। কেউ মনে করে, যা না হলে জীবন বাঁচানো যায়না শুধু সেগুলিই প্রয়োজনের আওতাভুক্ত। আবার কারো কারো প্রয়োজনের আওতায় স্বচ্ছন্দ জীবন এবং কারো প্রয়োজনের আওতায় বিলাসী ও আয়েশী জীবনের উপকরণাদিও এসে যায়। তাহলে উল্লিখিত আদেশের মর্ম কি এই হতে পারে যে, প্রয়োজনের সীমানা বা যা অবশিষ্ট

থাকে, তাই আল্লাহর পথে ব্যয় কর?

২. আল্লাহর পথে সমস্ত সঞ্চিত পুঁজি খরচ করে ফেললে পুঁজি বিনিয়োগ (INVESTMENT) কিভাবে হবে? এভাবে তো কোনো পুঁজিই থাকবেনা এবং উৎপাদনের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

যাকাত সম্বন্ধেও কয়েকটা প্রশ্ন আছে। আমাদের অধ্যাপক সাহেব যাকাতের পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত দুটো বিষয় বর্ণনা করলেন। এই দুটো বিষয় আসলে যাকাতের বিরুদ্ধে আপত্তি। অনুগ্রহপূর্বক এই আপত্তিরও জবাব দেবেন।

প্রথম আপত্তি এই যে, যাকাত একটা আনুপাতিক কর (Proportional Tax), ক্রমবর্ধমান কর (Progressive Tax) নয়। অর্থাৎ শুরুতে যেখান থেকে যাকাত ফরয হয়, সেখান থেকে শুরু করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে গেলেও যাকাতের হার একই থাকে। এভাবে অপেক্ষাকৃত কম বিত্তশালীদের ওপর বোঝা বেশী হয়ে যায়। কেননা শতকরা আড়াই টাকার হার অধিক বিত্তশালীদের তুলনায় কম বিত্তশালীদের জন্য বেশী ভারী। এভাবে ইসলামী অর্থনীতিতে একটা বেইনসাফী চালু রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, পুরো বছরব্যাপী প্রয়োজন পুরণের পর যে সম্পদ অবশিষ্ট ও সঞ্চিত থাকে তাতেই যাকাত হয়। কেউ যদি চরম অমিতব্যয়িতার মাধ্যমে সব কিছু খরচ করে ফেলে এবং কিছুই সঞ্চয় না করে তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয হয়না।

জবাব ঃ আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব নিম্নে দিচ্ছি ঃ "তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তারা কি ব্যয় করবে? তুমি বলে দাও, যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত।" এ আয়াতটিতে ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানের একটা প্রাথমিক ও মৌলিক নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। সেই মূলনীতি এই যে, নিজ নিজ বৈধ আয়ের ওপর প্রত্যেকের মালিকানার অধিকার রয়েছে। কারো কাছে এটা দাবী করা হয়না যে, সে ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করুক। নিজের সম্পদকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। আইন ও নৈতিকতার আলোকে তার কাছে যে অর্থ ব্যয়ের দাবী করা হয় তা কেবল তার প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট। ইসলামের এই দৃষ্টিভঙ্গী সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা পুরোপুরি অস্বীকার করা হয় এবং তাতে সামষ্টিক তত্ত্বাবধান সমর্থন করে ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয় যে, সে নিজের উপার্জিত সম্পদ থেকে নিজেই নিজের প্রয়োজন পূরণ করার পরিবর্তে রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়।

বৈধ প্রয়োজন চিহ্নিত করার উপায় কি হবে- এ প্রশ্নের জবাব এই যে, সম্পদের বস্তুগত পরিমাণ দ্বারা এটা নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব। এজন্য ইসলাম কিছু সাধারণ মূলনীতি বর্ণনা করে ও মুসলমানদেরকে নৈতিক প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছে, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বৈধ প্রয়োজন নিজেই চিহ্নিত করে। এর পরিবর্তে যারা আইনের সাহায্যে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের সীমা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছে, তারা তাদের চেষ্টায় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে।

এরপর অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে আপনার এই প্রশ্নের জবাব যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব কিছু খরচ করে ফেললে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা এবং উৎপাদনের উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার এ ধারণা দুই কারণে সঠিক নয়। প্রথমতঃ এ আয়াতে আইনগতভাবে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমস্ত সম্পত্তি খরচ করে ফেলতে হবে। তা যদি হতো, তাহলে সদকা, যাকাত ও উত্তরাধিকার ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু বিধান নাযিল হওয়া অপ্রয়োজনীয় হয়ে যেত। দ্বিতীয়তঃ এ আয়াত দ্বারা যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত সমস্ত সম্পদ ব্যয় করা বাধ্যতামূলক মেনে নেয়াও হয়, তবুও আল্লাহর পথে দান করার সাথে সাথে কোনো ব্যক্তি যদি নিজের পরিবার পরিজনের জন্য কিছু সঞ্চয়ও করে, তবে এটাও তার একটা প্রয়োজন এবং এ প্রয়োজন থেকে তাকে জোরপূর্বক বঞ্চিত করা যায়না।

যাকাত সম্পর্কে আপনি আপনার অধ্যাপক সাহেবের যে আপত্তি উদ্ধৃত করেছেন, তার পেছনে প্রচুর অজ্ঞতা ও ভুল বুঝাবুঝি সক্রিয় রয়েছে। অর্থনীতির এই সব শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞের পয়লা ভ্রান্তি এই যে, তারা যাকাতকে নিছক একটা রাজস্ব কর মনে করেন, যা সরকার বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আদায় করে এবং দাতা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে দেয়। অথচ যাকাত ইসলামে নামাযের মত একটা ইবাদাত। যে আবেগ এটা দিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং যে প্রেরণা এর পেছনে শক্তি যোগায় তা রাজস্ব কর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আমাদের সমাজে শত শত বছর ধরে যাকাত আদায়কারী কোনো ইসলামী সরকার নেই। অথচ যাকাতদাতারা এসে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে, বলুন তো আমার ওপর কত টাকা যাকাত পাওনা হয়েছে, যাতে যাকাত দিয়ে ফরয থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারি। সুতরাং যাকাতকে করের মত মনে করে তাকে করের নিয়ম কানুন দ্বারা মূল্যায়ণ করা ঠিক নয়।

যাকাতকে কর মনে করলে দ্বিতীয় যে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, সেটি এই যে, করের উপকারিতা সাধারণভাবে ধনী গরীব নির্বিশেষে সবাই লাভ করে। কেননা তা জাতীয় কোষাগারের অংশে পরিণত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধনীরা তা দ্বারা বেশী উপকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু যাকাত এমন একটা সম্পদ, যা নেয়া হয় ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছ থেকে, অথচ তা দ্বারা শুধুমাত্র গরীব লোকেরাই উপকৃত হতে পারে। এটা শুধু নগদ পুঁজির ওপর আরোপিত হয়না বরং ব্যবসায়ের পণ্যের ওপরও হয়। কৃষি উৎপাদনের ওপরও হয়, গবাদি পশুর ওপরও হয় এবং ধাতব সম্পদ ও অলংকারাদির ওপরও হয়। এর হার সর্বক্ষেত্রে শতকরা আড়াই ভাগ নয়, বরং কোথাও শতকরা দশভাগ এবং কোথাও আরো বেশী। যাকাতের বিধান অত্যন্ত ব্যাপক, সুদূর প্রসারী ও বহুবিধ। এটি একতরফাভাবেই চালু থাকে এবং এতে ক্রমবর্ধমান করের প্রয়োজনই হয়না। এ প্রক্রিয়া লাগাতার চালু থাকলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অতিশীঘ্র আপনা থেকেই ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে যায়।

আপনার অধ্যাপক সাহেবের এ আপত্তিও ভুল বুঝাবুঝি থেকে উদ্ভূত যে, যাকাত

যেহেতু উপার্জনের ওপর নয় বরং সঞ্চয়ের ওপর আরোপিত, তাই কোনো ব্যক্তি অমিতব্যয়ী হয়ে নিজের সম্পদ উড়িয়ে দিয়ে যাকাত থেকে রেহাই পেয়ে যেতে পারে। এ আপত্তির একটি জবাব এই যে, যাকাত সর্বাবস্থায় সঞ্চয়ের ওপর আরোপিত হয়না। বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত শুধু নগদ অর্থ ও সোনা রূপার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কৃষি উৎপাদনের ওপর যাকাত তাৎক্ষণিকভাবেই আরোপিত হয়। আমাদের কৃষি প্রধান দেশে এই সম্পদ যাকাতের একটা বিরাট উৎস। অনুরূপভাবে, শুধু সঞ্চয়ের ওপর যাকাত আরোপিত হওয়া সংক্রান্ত আপত্তি বাণিজ্যিক পণ্য, শিল্পপণ্য এবং অনুরূপ অন্যান্য কারবারের ক্ষেত্রেও সহজে ধোপে টেকে না। কেননা কোনো ব্যবসায়ী এত বেকুফ হতে পারেনা যে, শুধু যাকাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের সমস্ত পণ্য দ্রব্য বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যে দামেই পাওয়া যায় বেঁচে দেবে এবং মূল পুঁজিও খুইয়ে দিয়ে খালি হাতে বসে থাকবে।

এ ধরনের আপত্তিগুলো উত্থাপনের পেছনে যে মৌলিক ভ্রান্তিটা ক্রিয়াশীল থাকে, সেটি এই যে, আপত্তি উত্থাপনকারীরা যাকাতের বিধানটাকে ইসলামের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা থেকে আলাদা করে এককভাবে তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তারা একটু কষ্ট স্বীকার করে যাকাতকে ইসলামের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় এবং সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ইসলামের গোটা সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামোতে রেখে বিচার করে না। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, একটা স্তম্ভ যতই মজবুত ও সুশোভিত হোকনা কেন, তাকে যদি কোনো ছাদ ও ভবন ছাড়া শূন্য স্থানে একাকী দাঁড়ানো দেখা যায়, তাহলে তাকে আজব ও উদ্ভট মনে হবে। যাকাত ও তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। লোকেরা আপত্তি তুলে থাকে যে, যাকাত যদি আয়ের ওপর না বসিয়ে সঞ্চয়ের ওপর বসানো হয়, তাহলে লোকেরা সমস্ত টাকা বিলাসিতা করে উড়িয়ে দেবে। প্রশ্ন এই যে, যদি এটা ধরেও নিই যে, কেবলমাত্র শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তি নিজের যাবতীয় সম্পত্তি খরচ করে ফেলবে, তাহলে সে খরচটা করবে কোন্ খাতে? ব্যভিচারে? মদখুরীতে? নাচ গানে? জুয়া খেলায়? রেশম বস্ত্র পরিধানে? সুদী বিনিয়োগে? এ সবই তো তার জন্য নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে অনুৎপাদনশীল (Unproductive) ও ক্ষতিকর কার্যকলাপের পথও প্রায় পুরোপুরি বন্ধ। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র অপচয় ও অপব্যয়ের পথে পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, বিশেষ ধরনের বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন ও আমদানি বন্ধ করে দিতে পারে। মানুষ তার বেশীর ভাগ অর্থ এই সব বিনোদন ও ভোগের উপকরণেই ব্যয় করে থাকে। এরপর সে যদি কিছু করে, যেমন ঘরবাড়ী বানায়, বা আসবাবপত্র খরিদ করে, তা হলে কোনো না কোনো উপায়ে টাকার আবর্তন ও বিকেন্দ্রায়ণ প্রক্রিয়া তো শুরু হলো। তার বিনিময়ে কোনো কোনো জিনিস অবশ্যই তৈরী হবে। কিছু লোকের আয় রোজগার হবে এবং টাকা পুঞ্জীভূত করে রাখার চেয়ে তা ঢের ভালো হবে। ইসলাম যে অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে জমা করার ওপর যাকাত

আরোপ করে, তার এও একটা উদ্দেশ্য যে, মানুষ সম্পদ গোলাজাত করার পরিবর্তে তা বৈধভাবে খরচ করতে অভ্যস্ত হোক এবং সম্পদ নিশ্চল থাকার পরিবর্তে সচল হোক ও বাড়তে থাকুক।

কিন্তু এই মাত্র যে কথা বলে এসেছি, তার পুনরাবৃত্তি করে বলছি, ইসলাম শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইন বিধান দিয়েই আমাদের পথ প্রদর্শন করেনা। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটা অংশ। সেখানে বহু সংখ্যক নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকারণ মিলিতভাবে কাজ করে। ইসলাম আমাদেরকে এ কথাও শিখায় যে, "সম্পদের ভেতরে যাকাত ছাড়া আরো অনেক হক আছে।" ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাও দেয় যে, আমরা যে অর্থ সঞ্চয় করে রাখি তা নয় বরং যে অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করি সেটাই আমাদের আসল উপার্জন। সে আমাদেরকে বলে যে, সুদ খাওয়া দ্বারা নয় বরং দান করা দ্বারা সম্পদ বাড়ে।

এ কারণেই ইসলাম বাধ্যতামূলকভাবে যা দিতে হয়, তা ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ কোনো মালিকের কাছ থেকে আদায় করেনি। কিন্তু সে সম্পদশালীদের মন ও চরিত্র এমনভাবে তৈরী করেছে যে, অনেক ধনী ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর পথে উজাড় করে দিয়েছে। কেউ কেউ তো সব কিছু উজাড় করে দেয়ার পরও কোনো অভাবী ব্যক্তি দেখতে পেলে ধার করে তার প্রয়োজন পূরণ করতেও দ্বিধা করেনি। বস্তুতঃ মানুষের সামাজিক ও নৈতিক প্রেরণার সাথে তার অর্থনৈতিক প্রেরণার অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। যতক্ষণ মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রকে শুধরানো না হয় এবং তার আশপাশের সামগ্রিক পরিবেশকে একটা বিশেষ বস্তুগত ও নৈতিক কাঠামোতে গড়ে তোলা না হয়, ততক্ষণ বিচ্ছিন্নভাবে মানুষের কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, চাই তা অর্থনৈতিক সমস্যা হোক বা জীবনের অন্য কোনো সমস্যা হোক। (তরজমানুল কুরআন, মে, ১৯৬৩)

এক ধরনের মুদারাবা ও তার শরয়ী বিধি

প্রশ্ন ঃ ফিকাহবিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, মুদারাবা ভিত্তিক ব্যবসায়ে কোনো শ্রমিক কর্মচারীও যদি পুঁজি খাটায়, তবে তার সমস্ত মুনাফা সে একাই পাবে। সেই সাথে সে মূলধনের মালিকের পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করে তার মুনাফায়ও ভাগ বসাতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন জাগে। অনুগ্রহপূর্বক এগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করে উপকৃত করবেন।

মনে করুন, আসলামের এক হাজার টাকা মূলধন দিয়ে ওষুধের একটা দোকান চালু করা হলো। এই মূলধনে মাত্র চারটে কোম্পানীর ওষুধ রাখা যায় এবং এতে যা বিক্রি হয়, তাতে মূলধনের শতকরা ২০ ভাগ মুনাফা হয়। তবে রফিকের দুশো টাকা মূলধন যুক্ত করে যদি পঞ্চম কোম্পানীর ওষুধও রাখা যায়, তাহলে মুনাফা হয় শতকরা ৩৫ ভাগ। কিন্তু এই শতকরা ১৫ ভাগ বাড়তি মুনাফা শুধু দুশো টাকা মূলধন বৃদ্ধির কারণে

হয়নি, বরং এক হাজার টাকা মূলধনকে বারোশো টাকায় উন্নীত করার কারণে হয়েছে। নচেৎ শুধু দু'শ টাকা মূলধন দিয়ে যদি ওষুধের দোকান খোলা হতো, তাহলে হয়তো মুনাফা শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী হতোনা। কেননা ওষুধের স্টক কম ও মূলধনের নির্দিষ্ট পরিমাণ পূর্ণ না হওয়ার কারণে ক্রেতা কম আসে।

আরো একটা উদাহরণ নিন। ধরুন, উপরোক্ত জুটির রফিক যাবতীয় কেনাকাটার কারবার আসলামের এক হাজার টাকা মূলধন দিয়েই সমাধা করলো এবং নিজের দু'শো টাকা কেবল প্রচারের কাজে ব্যয় করলো। এরফলে পণ্যদ্রব্য তাৎক্ষণিকভাবে বিক্রি হয়ে গেল। মূলধন দ্রুত ফিরে এলো এবং পরবর্তীতে মুনাফার হার অনেক বেড়ে গেল। প্রচারে অর্থ ব্যয় না করা হলে ব্যবসায় মন্দা হতো।

উক্ত দুটি উদাহরণ থেকে বুঝা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে মূলধন বাড়লে তার উৎপাদনী ক্ষমতা ও মুনাফার হার বেড়ে যায়। কিন্তু যদি মূলধনের এক এক অংশ আলাদা আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে মুনাফার হার বাড়ার পরিবর্তে অনেক কমে যায় অথবা একেবারে শূন্য থেকে যায়।

এ রকম অবস্থায় শ্রমিক কর্মচারীকে তার খাটানো মূলধনের মুনাফার একক হকদার সাব্যস্ত করার যৌক্তিকতা বুঝে আসেনা। হয়তো ফিকাহবিদগণের উল্লিখিত রায় সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বরং তাদের সমকালীন বিশেষ ব্যবসায়িক পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

আরো একটা ব্যাপার এই যে, শ্রমিক যখন নিজের মূলধনও যুক্ত করবে, তখন উভয় মূলধন দ্বারা ক্রীত পণ্য যদি মিশ্রণযোগ্য না হয়, তাহলে এমনও সম্ভাবনা আছে যে, তার নিজের মূলধনে কেনা পণ্যগুলোর ব্যাপারে তার আগ্রহ মালিকের পণ্যের চেয়ে কম হয়ে যেতে পারে। এভাবে মালিকের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই শ্রমিকের খাটানো পুঁজির মুনাফায় মালিকেরও অংশীদার হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়।

জবাব ঃ আপনি আপনার প্রশ্নে লিখেছেন যে, ফিকাহবিদদের সিদ্ধান্ত এই যে, মুদারাবায় যদি শ্রমিক নিজের মূলধন খাটায়, তবে তার সমস্ত মুনাফা শ্রমিক পাবে এবং সেই সাথে মালিকের মূলধন দ্বারা ব্যবসায় করে তার মুনাফাতেও অংশীদার হবে। এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে আপনি বিভিন্ন আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং তার সমাধান সম্বলিত জবাব চেয়েছেন।

যে সিদ্ধান্ত বা অভিমতটিকে আপনি ফিকাহবিদদের সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছেন, তাতে এ কথা আগাম স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, শ্রমিক বা শরীক মুদারাবার ব্যবসায়ে মালিকের মূলধনের সাথে নিজের যে কোনো পরিমাণ পুঁজি সংযুক্ত করে নেবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এতে মূল মালিক বা মহাজনের অনুমতি বা সম্মতির কোনোই বাধ্যবাধকতা নেই। এই কল্পিত সিদ্ধান্তের ওপরই আপনার সব কটি প্রশ্নের ভিত্তি।

কিন্তু এটিকে ফিকাহবিদদের বিশেষতঃ হানাফী ফিকাহবিদদের সিদ্ধান্ত বলা

কোনক্রমেই সঠিক নয়। হানাফী মতামত এ ব্যাপারে এই যে, শ্রমিক বা মজুর মূলধনের মালিকের অনুমতি ছাড়া তার মূলধনকে নিজের সম্পদের সাথেও মিশ্রিত করতে পারে না, অন্যের কাছেও তা হস্তান্তর করতে পারেনা এবং মালিকের মূলধন দ্বারা তৃতীয় কোন ব্যক্তির সাথেও অংশীদারী কারবার করতে পারেনা। তবে মালিক যদি মুদারাবাকারীকে এ ধরনের কর্মকান্ডের অনুমতি দেয় অথবা বলে দেয় যে, তুমি নিজের ইচ্ছানুসারে যেভাবে পারো ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন কর, তাহলে সেই ক্ষেত্রে মুদারাবার অংশীদার নিজের সম্পদ মালিকের মূলধনের সাথে মিশ্রিত করতে পারে। এ ধরনের আগাম অনুমতি ছাড়া কোনো শ্রমিক-কর্মচারী যদি নিজের টাকা মুদারাবার ব্যবসায়ে খাটায়, অথবা অন্য কোনো তৎপরতায় লিপ্ত হয়, তবে তা অপর অংশীদারের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল হবে। সে মেনে নিলে বৈধ হবে, নচেৎ বাতিল হয়ে যাবে। এটা চার মাযহাবের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

হানাফী ফকীহগণ মুদারাবা ব্যবসায়ে এই অতিরিক্ত বাধ্যবাধকতাও আরোপ করেছেন যে, এর অংশীদার ঋণ দিয়ে বা নিয়ে এর সম্পদে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাতে পারবেনা এবং এমন অন্য কোনো কাজও করতে পারবেনা, যা সামগ্রিকভাবে উভয়পক্ষের জন্য বা কোনো এক পক্ষের জন্য ক্ষতির কারণ হয় বা ব্যবসায় ও মুদারাবার সর্বস্বীকৃত রীতিনীতির পরিপন্থী হয়। এমন কাজ করলে সে অন্যের অধিকার আত্মসাৎকারী সাব্যস্ত হবে এবং তার ওপর উপযুক্ত অর্থদন্ড প্রয়োগ করা হবে।

এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুদারাবায় অংশীদার ব্যক্তি যদি নিজের সম্পদ বাড়াতে চায়, তবে সেজন্য অপর পক্ষের সম্মতি অপরিহার্য। সে যদি ভালো মনে করে তবে সম্মতি দেবে, নচেৎ দেবেনা। ফকীহগণ এ ব্যাপারেও একমত যে, এই অনুমতি বা সম্মতি দেয়ার পর বাড়তি পুঁজি বিনিয়োগকারী অংশীদার তার পুঁজি থেকে অর্জিত মুনাফা একাই পাবে। এটা তার একক প্রাপ্য না হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ নিজের বিনিয়োগকৃত অর্থের আওতার ভেতরে শ্রম ও মূলধন উভয়ের মালিক সে একাই। এর বিপক্ষে আপনি যে শত আপত্তি তুলেছেন, তার কোনো সারবত্তা নেই। মূলধন বৃদ্ধিতে যে বাড়তি মুনাফা অর্জিত হয়, তাতে উভয়পক্ষের মূলধন একত্রে ক্রিয়াশীল থাকে। নিজ নিজ অংশ অনুপাতে প্রত্যেক পক্ষের মূলধন মুনাফা আনে। তাই মূলধনের অনুপাতেই উভয়পক্ষের মধ্যে মুনাফা বন্টিত হয়। এরপর অধিক মূলধনের মালিককে কেবল মূলধনের আধিক্যের কারণে পুনরায় বাড়তি মুনাফায় অংশীদার করা কোনো প্রকারেই বৈধ হতে পারেনা।

এভাবে তো মুশারাকা বা অংশীদারী ব্যবসায়েও অধিকতর মূলধনের মালিক বলে বসবে যে, আমি যেহেতু মূলধনের পরিমাণের দিক দিয়ে বৃহত্তর অংশীদার, তাই আনুপাতিক মুনাফার চেয়ে অতিরিক্ত অন্য অংশীদারের মুনাফাতেও আমার অংশ পাওয়া চাই। একইভাবে লোকসানের বেলায় স্বল্প মূলধনের মালিক বলতে পারে যে, আমি যদি, একা অল্প পুঁজি নিয়ে কারবার করতাম, তাহলে আমার লোকসানও কম হতো। তাই

আমার ক্ষতির ভাগটা আনুপাতিক হারের চেয়ে কম এবং বেশী মূলধন ওয়ালার ক্ষতির ভাগ বেশী হওয়া উচিত। মোট কথা, এমন আজব ও উদ্ভট নীতি দ্বারা এমন ফল লাভ হবে, যা অযৌক্তিক ও হাস্যকর হয়ে দেখা দেবে। [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮]

উশর যাকাত ও সরকারী করের পার্থক্য

প্রশ্ন ঃ একটা শরীয়ত সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে আপনার মতামতের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি একটা বৈঠকে উশর ও যাকাতের বিষয়ে আলোচনা হলো। এক ব্যক্তি যিনি আলেম নন, তবে যথেষ্ট পড়াশুনা করেছেন এবং এক সময় বিচারকও ছিলেন – বললেন, উশর হচ্ছে ক্ষেতের ফসলের ওপর আরোপিত এক দশমাংশ, আর যাকাত হলো সঞ্চিত সম্পদের কেবল চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। পক্ষান্তরে রাজস্ব কর ও জলকর ক্ষেতের ফসলের অর্ধেকের ওপর হিসাব করা হয়। কৃষি কর এর অতিরিক্ত। সঞ্চিত সম্পদের ওপর বিপুল হারে আয়কর আরোপ করা হয়ে থাকে। এই সব রাজস্ব কর, জলকর, কৃষি কর, আয়কর ও ভূমিকর আদায় হয়ে সরকারী কোষাগারে জমা হয় এবং তারপর জনকল্যাণমূলক খাতে যথা মাদ্রাসা, হাসপাতাল ইত্যাদিতে ব্যয়িত হয়ে থাকে। তাই যাকাত ও উশর ইত্যাদি এখন আর না দিলেও চলে। আমি তার ঐ মত মেনে নিতে পারিনি। আমি নিজের মত এভাবে তুলে ধরলাম যে, প্রথমতঃ তহশীল ও আয়করের অফিসগুলো বাইতুলমালের সংজ্ঞার আওতায় আসেনা। দ্বিতীয়তঃ এইসব কর কুরআনের বর্ণিত খাতে ব্যয়িত হয়না। আপনি বলুন আমার মত সঠিক, না জজ সাহেবের মত?

জবাব ঃ যাকাত সম্পর্কে সর্বপ্রথম এ কথা বুঝে নিতে হবে যে, এটা কর নয়। বরং একটা ইবাদাত এবং ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। নামায, রোযা ও হজ্ব যেমন ইসলামের স্তম্ভ, এটাও তেমনি। যে ব্যক্তি কখনো চোখ মেলে কুরআন শরীফ পড়ে, সে দেখতে পাবে, কুরআনে সাধারণভাবে নামায ও যাকাতের কথা এক সাথেই বলা হয়েছে এবং এটাকে সকল যুগের নবীদের অনুসৃত ইসলাম ধর্মের একটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই একে কর মনে করা এবং এর সাথে কর হিসাবে আচরণ করা প্রথম মৌলিক ভ্রান্তি। একটি ইসলামী রাষ্ট্র যেমন স্বীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে দাপ্তরিক কাজকর্ম ও অন্যান্য কাজ আদায় করার পর এ কথা বলতে পারেনা যে, এখন আর নামায পড়ার দরকার নেই, কেননা তারা সরকারী দায়িত্ব পালন করেছে, তেমনি ইসলামী সরকার জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করার পর একথা বলতে পারেনা যে, এখন যাকাতের প্রয়োজন নেই, কেননা কর আদায় করা হয়েছে। ইসলামী সরকারকে যেমন নাগরিকদের সময়মত নামায পড়ার সুযোগ দানের জন্য উপযুক্তভাবে সরকারী কর্মকান্ডের রুটিন তৈরী করতে হবে, তেমনি কর দেয়ার পরও যাতে যাকাত দিতে

পারে, সেজন্য কর ব্যবস্থায় উপযুক্ত রদবদল ঘটাতে হবে।

এ ছাড়া এ কথাও বুঝে নেয়া দরকার যে, কুরআনে যেসব উদ্দেশ্যে যাকাত ফরয করা হয়েছে, সেসব উদ্দেশ্যে সরকারের কোনো কর ব্যবহৃত হয়না এবং যাকাতের মত খাতগুলোতে তা বন্টনও করা হয়না। [তরজমানুল কুরআন, মার্চ ১৯৭৭]

কতিপয় নিবন্ধ

বিদায় হজ্বের ভাষণ বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা

১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে সিন্ধু সরকারের পক্ষ থেকে রসূল (সঃ)-এর বিদায় হজ্বের ভাষণ বাজেয়াপ্ত করার এক কলংকজনক আদেশ জারি হয়েছিল। এরপর সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী সেই আদেশ বাতিল করে একজন ডেপুটি সেক্রেটারী ও একজন সেকশন অফিসারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে বলেন, তারা উভয়ে অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ জারি করা হয়েছে।

সে সময় আমরা মনে করেছিলাম, বাজেয়াপ্ত আদেশ তো বাতিল হলো, চাকরিও সাসপেন্ড হলো। এখন হয়তো আরো কিছু জরুরী ব্যবস্থা নেয়া হবে। ঐ সব হতভাগার নামও প্রকাশ করা হবে। তাদের এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে, যাতে আমাদের আহত হৃদয় সান্ত্বনা পাবে এবং ভবিষ্যতে আর কোনো নরপিশাচ এমন কলংকজনক কাজ করার ধৃষ্টতা দেখাবেনা। কিন্তু এটা দেশ ও দেশবাসীর দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে, এখন পর্যন্ত ঐ ধিকৃত ও পাজী অপরাধীদ্বয়ের কোনো পরিচয়ও পাওয়া গেলনা। তারা কি কেবল নামেই মুসলমান, মুনাফিক, রাজা দাহিরের বংশধর, হিন্দু, কাদিয়ানী, খৃস্টান, নাকি ইহুদী-তা জানা গেলনা। যে পাকিস্তানের অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা হতো এবং যা ইসলামের নামে কায়েম হয়েছিল, সেই পাকিস্তানে কোনো নরপশুর এই ঔদ্ধত্য কিভাবে হয় যে, সে রসূল (সঃ)-এর বাণীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপের চিন্তাভাবনাও করতে পারে? কিন্তু আমাদের দেশে এহেন হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। আমরা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় হজ্বের ভাষণ বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত সেই সরকারী আদেশের বিজ্ঞপ্তিটির অনুবাদ তুলে দিচ্ছি, যা প্রত্যাহার করে নেয়া হলেও তার প্রভাবে জনগণের মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, তা এখনো নিরাময় হয়নি। সরকারী বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নরূপ ঃ

> "সিন্ধু সরকার জানতে পেরেছেন যে, করাচীর গোলিমার বাজারে অবস্থিত ইদারায়ে তালীমুল ইসলাম, প্রকাশনা বিভাগ, পাকিস্তান জামায়াতে হানাফী আহলে সুন্নাত থেকে খুতবায়ে হাজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ্বের ভাষণ) শিরোনামযুক্ত একটি প্রচারপত্রে এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যা দ্বারা পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ভুল বুঝাবুঝি ও প্রতিহিংসার মনোভাব জেগে ওঠার আশংকা রয়েছে। এই প্রচারপত্রটির ধরন সম্পর্কে ১৯৬৩ সালের পশ্চিম পাকিস্তান প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিনান্সের ৩৯নং ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু

উল্লেখিত প্রচারপত্রটি, যার শিরোনাম খুতবায়ে হাজ্জাতুল বিদা (বিদায় হজ্বের ভাষণ), উক্ত অর্ডিনান্সের ৩৯ নং ধারা অনুসারে বাজেয়াপ্ত হওয়ার যোগ্য, তাই উক্ত আইনের উক্ত ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার পূর্ণ আনন্দের সাথে জানাচ্ছে যে, উপরোল্লিখিত খুতবায়ে হাজ্জাতুল বিদা শিরোনামযুক্ত প্রচারপত্রটির সকল কপি সিন্ধু সরকারের পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে এবং সিন্ধুতে এই প্রচারপত্রটি যেখানেই পাওয়া যাবে, সাব ইনস্পেক্টরের নিচে নয় এমন যে কোনো পুলিশ কর্মচারী তা বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।"

যেহেতু কুফরির মনোভাব প্রকাশ পায় এমন বক্তব্য নিছক উদ্ধৃত করা কুফরি নয়, তাই আমরা অত্যন্ত কম্পিত লেখনি দিয়ে এই উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেছি। আমরা মনে করি, এই গেজেট বিজ্ঞপ্তিটি যে কর্মকর্তা বা সাধকই প্রকাশ করে থাক না কেন, তার সমুচিত শাস্তি হলো প্রকাশ্য চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে তার মাথার খুলির ওপর জুতো মারা এবং চাবুক দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তার চামড়া তুলে নেয়া। তাকে নিছক চুপি চুপি বরখাস্ত বা সাসপেন্ড করার কি অর্থ হয়? সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রী গোলাম মোস্তফার ধর্মীয় ও পেশাগত দায়িত্ব হলো, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের চেয়েও জঘন্য এই সব রসূল বিদ্বেষী ব্যক্তির নাম আমাদেরকে জানাবেন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন। আমরা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও দাবী জানাই যে, এই মারাত্মক ঘটনায় তিনি যেন ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেন এবং অপরাধীদের সমুচিত শাস্তি বিধান করেন। রসূলের (সঃ) ইজ্জত সম্মান কোনো প্রাদেশিক ব্যাপার নয়, বরং সমগ্র পাকিস্তানের এবং সকল মুসলমানের দীনদারী ও ঈমানদারীর বিষয়। পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজ রসূল (সঃ)-এর চিঠি ছিড়ে টুকরো টুকরো করার স্পর্ধা দেখিয়েছিল। এর পর রসূল (সঃ)-এর বদদোয়ার ফলে তার গোটা সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। রসূল (সা)-এর যে বিদায়ী ভাষণ সমগ্র মানবজাতির মুক্তি সনদ হিসেবে পরিচিত এবং যার শ্রোতাদেরকে তিনি স্বয়ং অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণকে নিষিদ্ধ করার ধৃষ্টতা আমাদের দেশে দেখানো হয়েছে। এই অপরাধে যারা জড়িত, তাদের শাস্তি দিতে গড়িমসি করলে দেশের শাসক ও শাসিতরা সকলেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য হবে। [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬]

ইসলামী আইনে সাক্ষ্যের মাপকাঠি

শাহাদাত (সাক্ষ্য) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে নিষ্পত্তিকারী সংবাদ অর্থাৎ কোন বিতর্কিত বিষয়ে বা তদন্তাধীন ব্যাপারে এমন বিবৃতি বা প্রমাণ, যা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হতে পারে। এ কথা সুবিদিত যে, কোনো শাসক বা বিচারক অদৃশ্য জান্তা নয় এবং কোনো বিরোধের ব্যাপারে যদি তার ব্যক্তিগতভাবে কিছু জানাও থাকে, তথাপি তিনি কেবল নিজের জানার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননা, যতক্ষণ তার কাছ যথারীতি সাক্ষ্য উপস্থাপন করা না হয়। এ জন্য ইসলামে সত্য সাক্ষ্য দানকে ফরযে

কিফায়া গণ্য করা হয়েছে। আর সাক্ষ্য গোপন করা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে কবীরা গুনাহ্ বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوْا ـ

"সাক্ষীদেরকে ডাকা হলে তারা যেন সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার না করে"

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ـ

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করোনা। যে ব্যক্তি সাক্ষ্য গোপন করে তার মন পাপী হবে।"

সূরা আল ফুরকানের ৭২নং আয়াতে আল্লাহর বান্দাদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ـ

"আল্লাহর বান্দা তারাই, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না।"

সূরা হজ্জের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ـ

"মূর্তির নোংরামি থেকে দূরে থাক এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দান থেকে বিরত থাকো।"

সুনানে আবু দাউদে আছে যে, রসূল (সঃ) ফজরের নামায পড়ানোর পর দাঁড়িয়ে নিম্নরূপ ঘোষণা দিলেন ঃ

"মিথ্যা সাক্ষ্য শেরকের সমপর্যায়ের" অতপর উপরোক্ত আয়াতটি আবৃত্তি করলেন।"

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে কমের পক্ষে সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহর উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে পয়লাটা হলো শিরক, দ্বিতীয়টা পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। তৃতীয়টা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং চতুর্থটা হলো মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান।

এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ "মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্য দেয়ার পর পা সরানোর আগেই আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেবেন।"

আরেকটি হাদীসে আছে যে, "মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা শাফায়াত পাবেনা।" সাক্ষ্যদানের নিয়ম এই যে, সাক্ষ্য দেয়ার সময় সাক্ষী বলবেঃ "আশহাদু বিল্লাহ" হানাফী ফিকাহর কিতাব হেদায়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, এ শব্দটি অবলোকন, শপথ করা, জ্ঞাত

হওয়ার অর্থসম্বলিত। অর্থাৎ সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়ার সময় বলে যে, আমি নিজের চাক্ষুস অবলোকনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর কসম খেয়ে এই মর্মে সংবাদ দিচ্ছি। আমাদের দেশে শুধু 'সাক্ষ্য' শব্দটিতে এত সব অর্থ অন্তর্ভুক্ত নেই বলে সাক্ষীর স্পষ্ট ভাষায় বলা উচিত যে, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি।

হাফেজ ইবনে কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থ আত্‌তুরুকুল হুকমিয়াতে ২৪তম পৃষ্ঠায় বাইয়িনা বা সাক্ষ্যের (Evidence) সংজ্ঞা প্রসংগে বলেছেন ঃ "শরীয়তে সাক্ষ্য বলতে সেই জিনিসকে বুঝায় যা সত্যকে স্পষ্ট করে দেয়। সাক্ষ্য কখনো চার ব্যক্তির কখনো তিন ব্যক্তির কখনো দুই ব্যক্তির এবং কখনো এক পুরুষ ও দুই নারীর সাক্ষ্য হয়ে থাকে। কখনো শপথ করা কিংবা তা অস্বীকার করাও সাক্ষ্যের অর্থবোধক হয়ে পড়ে। কখনো পরিস্থিতির সাক্ষ্যের (Circumstancial evidence) বিভিন্ন রূপও হতে পারে। সুতরাং রসূল (সঃ)-এর উক্তি যে, "সাক্ষ্য উপস্থিত করা দাবীদারের দায়িত্ব"-এর মর্মার্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোনো কিছুর দাবী করে, সেই দাবীর বিশুদ্ধতা ও সত্যতার প্রমাণ উপস্থিত করা তারই দায়িত্ব। এর বিভিন্ন পন্থার কোনো এক পন্থায়ও তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গেলে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে।"

ফকীহগণ সাধারণভাবে সাক্ষ্যের জন্য দুই ধরনের শর্তাবলী আরোপ করেছেন। একটা হলো যোগ্যতার শর্তাবলী, আর একটা হলো সাক্ষ্য দানের শর্তাবলী। যোগ্যতার শর্ত তিনটে ঃ সাক্ষীর সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, তার দৃষ্টিশক্তি সুক্ষ্ম থাকা এবং কোনো দর্শনীয় জিনিসের সাক্ষ্য দিলে সাক্ষ্যটি চাক্ষুস হওয়া। সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উপরোক্ত তিন শর্ত তো থাকবেই, তদুপরি আরো কয়েকটা শর্ত আছে। যথাঃ সাক্ষীর ওপর কখনো মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি কার্যকর না হওয়া এবং সাক্ষীর সততা ও সত্যবাদিতা। তবে বিচারের বিশুদ্ধতার জন্য এ শর্ত জরুরী নয়। তবুও ফৌজদারী দন্ডবিধির (চুরি, ব্যভিচার, খুন ইত্যাদির শাস্তি) মামলায় সাক্ষীদের চরিত্র সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়া বিচারকের কর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য মামলায় আসামী যদি সাক্ষীর ওপর আপত্তি তোলে, তাহলে সাক্ষীর চরিত্র তদন্ত জরুরী। বিচারক ইচ্ছা করলে তদন্ত ছাড়াও অচেনা সাক্ষীর সাক্ষ্যকে সত্য মনে করে গ্রহণ করতে পারে এবং তার রায় কার্যকর হবে।

যে জিনিস দেখার মত, তার চাক্ষুস সাক্ষ্য দিতে হবে। যে কথা শোনার মত, তার জন্য কথা শোনা এবং সেই সাথে বক্তাকেও দেখা চাই। যার কথা শুনেছে, তাকে চোখে না দেখলে তার সম্পর্কে সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবেনা। অনুরূপভাবে সাক্ষীর শুধু আওয়াজ কাজীর কাছে পৌঁছা যথেষ্ট নয় বরং সাক্ষীর সামনে হাজির থাকা অপরিহার্য। এই হিসেবে রেডিও বা টেলিফোন বা পর্দার পেছনের আওয়াজকে সাক্ষ্য বলা যাবেনা।

কিছু কিছু ব্যাপার এমনও থাকে যে, তার সর্বজনবিদিত হওয়া, বিখ্যাত হওয়া ও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া সাক্ষ্যের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। যেমন কোনো ব্যক্তির বংশধারা, বিয়ে অথবা মৃত্যুর খবর সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে যায় এবং তাকে খন্ডন

করার কোনো নিশ্চিত উপায়ও থাকেনা। এরূপ খবর সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে।

অমুসলিমের সাক্ষ্য মুসলমানের বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে উভয় পক্ষ অমুসলিম হলে অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ধর্মীয় ও শরয়ী কারণে যদি সাক্ষী কোন পক্ষের বিরুদ্ধে শত্রু ভাবাপন্ন হয়, তাহলে সে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তবে শুধু পার্থিব কারণে শত্রুতা সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করে দিতে পারে। সগীরা গুনাহে লিপ্ত থাকার কারণে সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান হবেনা।

স্বামী স্ত্রী, পিতামাতা, সন্তান এবং পালক ও পালিত-এদের একের সাক্ষ্য অপরের সপক্ষে গ্রহণযোগ্য হবেনা। আংশিক ও অগুরুত্বপূর্ণ শাব্দিক পার্থক্যের জন্য সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবেনা। এরূপ অবস্থায় সর্বসম্মত অংশ গৃহীত হবে। রায় ঘোষণার আগে যদি সাক্ষী তার পূর্ববর্তী সাক্ষ্য আদালতে প্রত্যাহার বা অস্বীকার করে, তাহলে তার উভয় বিবৃতি অগ্রাহ্য হবে।

সাক্ষ্য মিথ্যা হওয়া নিশ্চিত হলে বিচারক তাকে সমুচিত শাস্তি দিতে পারেন। এর সর্বনিম্ন শাস্তি হলো ভবিষ্যতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারক তার দূত মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার গ্রাম বা মহল্লায় পাঠাবেন। সে বিচারকের ঐ রায় জনগণকে সমবেত করে শোনাবে যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, তার ব্যাপারে তোমরা হুশিয়ার থাকো ও তাকে এড়িয়ে চল।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের ফতোয়া এই যে, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে জনগণের সামনে পরিচিত করা ছাড়াও দীর্ঘ কারাদন্ড দেয়া উচিত। হযরত ওমরের কথা ও কাজ থেকে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে বেত মারা ও মাথা কামানোর আদেশও দিয়েছেন।

নারী অধিকার কমিটি ১৯৭৬-এর রিপোর্ট পর্যালোচনা

১৯৭৬ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের এটর্নী জেনারেলের সভাপতিত্বে পাকিস্তানী মহিলাদের অধিকার নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করার জন্য ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। এই কমিটির উপস্থাপিত রিপোর্টের একটা অংশ ১৯ ও ২০শে জুলাই, ১৯৭৬ তারিখে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, রিপোর্ট সম্পর্কে জনগণের মতামত ও প্রতিক্রিয়া অবহিত হওয়া। কমিটির সম্মানিত সভাপতি যখন করাচিতে রিপোর্টটি সংবাদপত্রের কাছে অর্পণ করেন তখন বলেন, সরকার বা কমিটি কখনো এমন কোনো আইন চালু করবেনা বা করার প্রস্তাব দেবেনা, যা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী। তথাপি কোনো কোনো বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের অবকাশ আছে এবং সেসব ব্যাপারে আমাদের মন খোলা। তাঁর এই ঘোষণা আমাদের জন্য কিছুটা স্বস্তিদায়ক এবং আমরা রিপোর্ট সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরবো। আমরা আশা করি, এই বক্তব্য খোলা মনে এবং মন ও দৃষ্টির প্রশস্ততা সহকারে বিবেচনা করা হবে। আর এতে যদি রিপোর্টের কোনো অংশের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করা হয় এবং কোনো

ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দেয়া হয়, তবে তা উপেক্ষা না করে ও তাতে বিরক্তি বোধ না করে তার যথাযথ সদ্ব্যবহার করা হবে।

এ কথা তো কিছুতেই অস্বীকার করা যাবেনা যে, যেহেতু দীর্ঘকালব্যাপী আমাদের সমাজে ইসলামী আইন অচল রয়েছে এবং ইসলামের ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। এ জন্য মুসলিম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি শ্রেণী অস্থিরতা ও উত্তেজনার শিকার এবং সংস্কারের মুখাপেক্ষী। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন জাগে তা হলো, আমরা আমাদের সমস্যাবলীর সমাধান এবং আমাদের সমাজের পুনর্গঠন কি ইসলামী শিক্ষা ও মূলনীতির আলোকে করতে চাই, না আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির তাত্ত্বিক ও বাস্তব শিক্ষাকে আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করতে চাই? এ প্রশ্নের জবাব নিশ্চয়ই এই যে, আমাদের প্রত্যেকটি সংস্কারমূলক ও পুনর্গঠনমূলক পদক্ষেপ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিখানো পদ্ধতিতেই হওয়া চাই। স্বয়ং জনাব এটর্নি জেনারেলও বলেছেন যে, কোনো সুপারিশ বা আইন রচনা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হবেনা। এটাও সুবিস্তৃত যে, কোনো জিনিস কুরআন ও সুন্নাহর মোতাবেক বা বিরোধী কিনা, সে সম্পর্কে সাধক ও উত্তম ফায়সালা কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ ও সহযোগিতায় পরিচালিত ব্যক্তিই করতে পারে। নারী অধিকার নির্ণয়কারী এই সম্মানিত কমিটির সদস্যবর্গের নাম নিম্নরূপঃ

১. বেগম নাসীম জাহান এম, এন, এ
২. বেগম রায়হানা সরওয়ার এম, পি, এ
৩. বেগম সামীয়া উসমান, সাবেক সিনেটর
৪. বেগম রশীদা পাটেল, পাকিস্তান সরকারের উপদেষ্টা
৫. বেগম নাসীমা সুলতানা এডভোকেট
৬. মিস ফাজেলা ইলিয়ানী এম, পি, এ
৭. মিঃ ডিএম আওয়ান, এডভোকেট জেনারেল, সীমান্ত প্রদেশ
৮. মিঃ গোলাম আলী মেমন, এডভোকেট জেনারেল, সিন্ধু
৯. মুফতী মুহাম্মদ ইদরিস, এডভোকেট জেনারেল, সীমান্ত প্রদেশ
১০. বেগম জরী সরফরাজ, মরদান
১১. মিঃ মুহাম্মদ হায়াত জোনেজো, এডভোকেট, করাচী
১২. মিসেস মারিয়াম হাবীব, সম্পাদক মহিলা বিভাগ, পাকিস্তান টাইমস
১৩. মিসেস মিরা ফিলিপস, প্রিন্সিপাল কেনার্ড কলেজ, লাহোর

এ ছাড়া ডক্টর মিসেস পারভীন শওকত আলী, পাঞ্জাব শিক্ষা বিভাগ, মিসেস সিএ রহমান ভাট্টি এবং জিএস রংরো, সেক্রেটারী ও ডেপুটি সেক্রেটারী ল ডিভিশন কমিটির উপদেষ্টা ও সেক্রেটারী হিসেবে রয়েছেন।

আমরা জানতে ইচ্ছুক যে, এই সদস্যবৃন্দের মধ্যে ক'জন সদস্য বা সদস্যা এমন

রয়েছেন, যিনি কুরআন ও সুন্নাহর সামান্যতম জ্ঞানও রাখেন। কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞানের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদ তথা ইসলামী বিধান সংক্রান্ত গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের দায়িত্ব গ্রহণ এবং ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা ও তাতে রদবদলের চেষ্টার ফল এছাড়া আর কি হতে পারে যে, মুসলিম সমাজের বিভ্রান্তি বিশৃংখলা ও অরাজকতার যেটুকু বাকী ছিল, তাও সম্পূর্ণ হবে? ইসলামী আইনের যে অংশ বিশেষভাবে মুসলমানদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত, সেটা তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিমূল। কোনো মুসলিম নারী ও পুরুষ দাম্পত্য সম্পর্ক এবং কর্তব্য ও অধিকারকে বিধিবদ্ধকারী আইনের এই অংশটি আওতার বাইরে নয়। একজন মুসলিম স্বামী ও স্ত্রীর ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি, আকীদা বিশ্বাস, সততা ও সতিত্বের চেতনা এবং বৈধ পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক বিদ্যমান। কোনো সরকার বা তার নিযুক্ত কোনো কমিটি যদি সেচ্ছাচারী ও মনগড়াভাবে কোনো বিশেষ শ্রেণী যথা শ্রমিক, কৃষক অথবা কারখানা ও অফিস আদালতে কর্মরত কর্মচারীদের কিছু অধিকার নির্ধারণ করে দেয় এবং তা আইনানুগভাবে চালুও হয়ে যায়, তবে তাতে মুসলিম সমাজের নৈতিক ও সামাজিক জীবন অতটা প্রভাবিত হয়না, যতটা প্রভাবিত হয় নারী অধিকারের প্রলুব্ধকর পরিভাষা ব্যবহার করে বিয়ে, তালাক, খুলা, ভরণ পোষণ ইত্যাদির মত পারিবারিক জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনের রদবদল দ্বারা। মুসলিম সমাজে নারী ও পুরুষের জন্য এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারেনা যে, তাদের দাম্পত্য জীবনের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামের সুস্পষ্ট ও অকাট্য আইনগুলো উপেক্ষা করে তাদের ওপর অনৈসলামিক, অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক আইন চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা বা সুপারিশ করা হবে।

ভূমিকাস্বরূপ এই সংক্ষিপ্ত কথা কয়টি বলার পর এখন আমরা তার ব্যাখ্যাস্বরূপ ধারাবাহিকভাবে কমিটির কিছু সুপারিশ ও সেই সুপারিশ সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা পেশ করবো। এতে করে আমাদের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি কমিটির সদস্যবৃন্দ ও সাধারণ পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হবে। কমিটি স্বীয় রিপোর্টের সূচনায় কিছু সাধারণ সুপারিশমালা ও ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিনান্সের ৩১ ধারা পর্যন্ত কিছু আনুমানিক সংশোধনী পেশ করেছে। এরপর ৩২ ধারা থেকে শুরু করে ৪৩ ধারা পর্যন্ত যে সব সুপারিশ করা হয়েছে, তা মনোযোগ সহকারে পড়লে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম বিয়ের বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার যেমন স্বামীকে দিয়েছে, তেমনিভাবে ঐ অধিকার স্ত্রীকেও দেয়া এই সুপারিশসমূহের উদ্দেশ্য। অন্য কথায়,এতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, স্বামী যেমন স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, তেমনি স্বামীকে তালাক দেয়ার অধিকার স্ত্রীকেও দেয়া হোক। শুধু তাই নয়, পরিহাসের ব্যাপার এই যে, যে স্ত্রী পাঁচ বছর কোনো স্বামীর ঘর করেছে, সে বিয়ের বন্ধনমুক্ত হওয়ার পরও তাকে সাবেক স্বামীর সম্পত্তিতে অংশীদার করারও প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই কমিটির আন্তরিক বাসনা এই যে, স্ত্রীর যখন মন চায়, স্বামীকে যেন তালাক

দিতে পারে এবং এ ব্যাপারে আইন যেন তাকে পুরোপুরি সাহায্য করে। তবে কমিটির সদস্যবৃন্দ নিজেদের মনের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে চাননা। কেননা তাঁরা জানেন যে, কোন খোদাভীরু ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম নারী এই আইনগত অনুমতি ভোগ করতে কখনো রাজী হবেনা, আর সামান্যতম ধর্মীয় চেতনা সম্পন্ন কোনো মুসলিম পুরুষ এমন নারীকে অবিবাহিত বা তালাকপ্রাপ্ত জেনে বিয়ে করতে কখনো সম্মত হবেনা। এ কারণে কমিটির সদস্যবৃন্দ এই তিক্ত, নোংরা ও অপবিত্র ট্যাবলেটটি মুসলমানদের গেলানোর জন্য এই তথাকথিত অধিকারটিকে কখনো খুলা এবং কখনো বিচার বিভাগীয় বিচ্ছেদ নামের মোড়কে লুকাবার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এর ফলে তাদের যুক্তিতর্কে আশ্চর্য রকমের বৈপরিত্য ও জড়তার সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে ৩৩ নং ধারায় তারা বলেন ঃ

"স্ত্রী যদি মুসলিম আইন অনুসারে খুলা লাভের অধিকারীও হয় এবং স্বামীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুতও হয়, তথাপি তাকে বিয়ে বিচ্ছেদের অনুমতি লাভের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়।"

এর অব্যবহিত পরই বলা হয়েছে ঃ

"মুসলিম আইন অনুসারে যে মহিলা খুলা'র বিধি মোতাবেক বিয়ে বিচ্ছেদের দাবী জানাবে এবং স্বামীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতেও প্রস্তুত থাকবে, তাকে "বিয়ে বিচ্ছেদের অধিকার" ব্যবহারের জন্য আদালত বা বিচারকের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।"

এই দুটো কথা এবং "মুসলিম আইনের" এই সব ব্যাখ্যা পরস্পরবিরোধী। এগুলোর মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য বিধানের একটা উপায়ই বোধগম্য। তাহলো এই যে, প্রথমত উদ্ধৃতিতে "মুসলিম আইনে"র অর্থ প্রচলিত আইন, আর দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে মুসলিম আইন অর্থ কমিটির সদস্যদের কাছে যে ইসলামী আইন মনোপুত এবং তাদের ধারণায় যা সঠিক ইসলামী আইন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই জটিলতা থেকে যাচ্ছে যে, রিপোর্ট প্রণয়নকারীগণ সচেতনভাবে হোক বা অচেতনভাবে হোক, খুলা ও বিচারবিভাগীয় বিচ্ছেদকে সর্বদিক দিয়ে সম্পূর্ণ এক জিনিস সাব্যস্ত করছেন এবং উভয়কে জগাখিচুড়ি করে ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শন করছেন এবং অন্যায় আপত্তি তুলছেন। অথচ ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেক বিচার বিভাগীয় বিচ্ছেদও খুলা'র আওতায় আসেনা, আর প্রত্যেক খুলা'তে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থারও প্রয়োজন হয়না। মুসলিম ফকীহগণের মতে খুলা'র সংজ্ঞা এই যে, মোহরানা কিংবা তার চেয়ে কম বা বেশী পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে স্বামী "খুলা" অথবা অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণপূর্বক বিয়ের অবসান ঘটাবে এবং অর্থের বিনিময়ে বিয়ে বিচ্ছেদের এই প্রস্তাব স্ত্রী মেনে নেবে। খুলা'র ব্যাপারে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী নয়। কেবল অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীর সম্মতি শর্ত। স্বামী স্ত্রী যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে খুলা করে নেয়, তাহলে শরীয়তের আইন ও প্রচলিত আইন-এর কোনোটিই তাদের পথে অন্তরায় নয়। স্বামী যদি খুলা' বা তালাকে সম্মত না হয় এবং স্ত্রী বিয়ের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর হয়, তবে সে আদালতের কাছ থেকে বিয়ে বিচ্ছেদ বা বিয়ে ভংগের রায় গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রেও শরীয়তের আইন বা প্রচলিত

আইন তার পথে বাধ সাধেনা। স্বামী যদি তালাক বা খুলার মাধ্যমে বিয়ে ভাংতে রাজী না হয়, তবে স্ত্রীর জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া প্রচলিত আইন ও শরীয়তের আইন উভয়ের আলোকে অপরিহার্য। কিন্তু কমিটির সদস্যবৃন্দ বলতে চান যে, এমতাবস্থায়ও আদালত বা বিচারকের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। এই বক্তব্যের সপক্ষে তারা ইমাম শা'রানীর গ্রন্থ "আল-মীযানুল কুবরার" নিম্নলিখিত উক্তি পেশ করেনঃ

"সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, স্ত্রী যদি স্বামীকে অপছন্দ করে তবে সে আর্থিক বিনিময় দিয়ে খুলা' লাভ করতে পারে।"

এ মুহূর্তে ইমাম শারানীর উক্ত গ্রন্থ আমাদের সামনে নেই। কিন্তু যদি ধরে নেয়া হয় যে, তিনি এ কথা লিখেছেন, তবে এ দ্বারা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে উভয়পক্ষের খুলা'য় সম্মতির অবস্থা বুঝতে হবে। এর অর্থ এটা কিভাবে হয় যে, স্বামী প্রস্তুত না হলেও আদালত থেকে বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটানোর দরকার হবেনা এবং স্ত্রী যে স্বামীকে পছন্দ করবেনা, তাকে নিজেই একতরফা বিয়ে অবসানের নোটিশ দিয়ে যেখানে খুশী চলে যাবে?

এরপর রিপোর্টে সূরা বাকারার ২২৯ নং আয়াতের বরাত দেয়া হয়েছে। আয়াতটি হলো ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ-

"তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা কিছু ইতিপূর্বে দিয়েছ, তা ফেরত নেবে। তবে দু'জনেই আল্লাহর সীমানার মধ্যে টিকে থাকতে পারবে না এরূপ আশংকা থাকলে সে আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রে স্ত্রী কিছু বিনিময় দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কোনো গুনাহ নেই।"

এ আয়াতেও বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই বা অপরিহার্য নয় এমন কথা বুঝা যায়না। বরং আয়াত থেকে এই ধারণাই পাওয়া যায় যে, দম্পতির মধ্যে যদি ঘরোয়াভাবেই কোনো সমঝোতা হয়ে যায়, তবে যে আর্থিক বিনিময় নির্ধারিত হবে, তাই কার্যকর হবে। কিন্তু ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়ালে আদালত তদন্ত চালাবে যে, সত্যিই স্ত্রী স্বামীর ওপর এতটা বিরূপ হয়েছে কিনা যে তাদের মধ্যে বনিবনা হতেই পারেনা এবং আল্লাহর সীমানা লংঘিত হবার আশংকা রয়েছে।'যদি তাই হয়ে থাকে, তবে আদালত যেমন ভালো মনে করে বিনিময় নির্ধারণ করে দিতে পারে এবং স্বামীর কাছ থেকে খুলা' আদায় অথবা বিয়ে ভংগের সিদ্ধান্ত দিতে পারে। আশ্চর্য ব্যাপার যে, কমিটি এই আয়াত থেকে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করতে চায়।

অথচ এখানে "যদি তোমরা আশংকা কর" কথাটায় স্বামী স্ত্রীকে নয় বরং তৃতীয় একটি পক্ষকে সম্বোধন করা হয়েছে। এটি আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার সুস্পষ্ট ইংগিত। আল্লামা আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ আলীর কৃত কুরআনের যে অনুবাদ রিপোর্টে উদ্ধৃত হয়েছে তাতেও "তোমরা" অর্থ ব্রাকেটে বিচারক বলা হয়েছে, "If ye (Judges) Do Fear" -এর পরেও আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে দেখে এবং বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য আদালতের মধ্যস্থতাকে নিষ্প্রয়োজন আখ্যায়িত করে নারীকে এক তরফাভাবে বিয়ে বিচ্ছেদ করার অধিকার দিতে দেখে স্তম্ভিত হচ্ছি।

এই আয়াতের পর রিপোর্টে হযরত সাবেত বিন কায়েসের ঘটনা হাদীস থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। কিন্তু এই হাদীসের সর্বশেষ যে কথাটা রিপোর্টেও উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হলো ঃ

রসূল (সঃ) সাবেত (রাঃ)কে বললেনঃ তোমার বাগিচা ফেরত নাও এবং স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দাও। এর পর সাবেত তাকে বিয়ের বন্ধনমুক্ত করলেন।"

এ হাদীস থেকে তো উল্টো এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিয়ের বন্ধন স্বামীর হাতেই থাকে এবং আদালত প্রথমে স্বামীকে তালাক বা খুলা'র আদেশ দেবে। ইচ্ছা করলে আদালত আর্থিক বিনিময়ও নির্ধারণ করে দেবে। স্বামী যদি মেনে নেয় তবে তো ভালো কথা। নচেৎ আদালত বিয়ের বিলুপ্তি ঘোষণা করবে। এ দ্বারা এ কথা কিভাবে বুঝা গেল যে, স্ত্রী-বিয়ের বিলুপ্তি ঘটাবে এবং আদালতের কাজ হবে শুধু তার ঘোষণাকে অনুমোদন করা ও আর্থিক বিনিময় নির্ধারণ করা?

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই বুঝা যায় যে, এই একটি আয়াত, একটি হাদীস এবং একটি ফিকাহ শাস্ত্রীয় উক্তি থেকে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে কমিটি কত বড় ভুল করেছে। এরপর ৩৫ নং ধারায় বর্ণিত এই দাবী কতখানি ন্যায়সংগত যে,

> "কমিটির অভিমত এই যে, একজন মুসলিম নারীকে এ কথা প্রমাণ করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য করার কোনো সংগত কারণ নেই যে, আল্লাহর সীমানায় বহাল থেকে তার ও তার স্বামীর বনিবনা সম্ভব নয় এবং আর্থিক বিনিময়ের মাধ্যমে বিয়ে বিচ্ছেদের পক্ষে আদালতের সিদ্ধান্ত দেয়া উচিত। মুসলিম আইনে স্ত্রী খুলা'র মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এখন এই অধিকারটি আইনতঃ মেনে নেয়ার সময় সমাগত।"

আমরা আগেই বলেছি, এটা একটা অনর্থক কূটতর্ক-যা স্ত্রীকে তথাকথিত তালাকের অধিকার দেয়ার জন্য অবলম্বন করা হয়েছে। আমরাও এ কথা স্বীকার করি যে, পারস্পরিক বুঝাপড়া ও সমঝোতার মাধ্যমে স্বামী যদি তালাক বা অর্থের বিনিময়ে খুলা করতে রাজী হয়ে যায়, তাহলে আদালতের কাছে না যেয়েও বিয়ের অবসান ঘটানো সম্ভব। বরঞ্চ ইসলাম এটাই অধিকতর পছন্দ করে যে, ঘরোয়া জীবনের পুঁতিগন্ধময় গোপন বিষয়গুলো আদালতে ফাঁস না হওয়াই ভালো। কিন্তু এ অধিকারকে

আইনানুগভাবে স্বীকার করার সময় এখন সমাগত হয়নি বরং চৌদ্দশ বছর আগে থেকে আইনগতভাবে ও শরীয়ত মোতাবেক এটা স্বীকৃত যে, তালাক, খুলা বা বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য কিংবা আর্থিক বিনিময়ের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। উভয়পক্ষ ইচ্ছা করলে পারস্পরিক বুঝাপড়া ও সমঝোতার মাধ্যমে এটা করতে পারে। কিন্তু স্বামী যদি তালাক বা খুলা' দিতে প্রস্তুত না হয়, তাহলেও আদালত থেকে বিয়ে বিচ্ছেদের রায় না নিয়ে স্ত্রী এক তরফাভাবে নিজেকে বা স্বামীকে তালাক দিয়ে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে-এটা এমন একটা ভিত্তিহীন ও বাজে কথা, যার সপক্ষে কুরআন হাদীস বা ফিকাহ গ্রন্থাবলীতে বিন্দুমাত্রও কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু কমিটির সদস্যগণ এই ভ্রান্ত অনৈসলামিক মতটির ওপর ক্রমাগত জিদ ধরে চলেছে। ৩৫ নং ধারার শেষে বলা হয়েছে ঃ

> "কমিটি এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, পরিবার আইন অর্ডিনান্সের ৮ নং ধারায় এভাবে সংশোধনী আনা হোক যে, স্ত্রী যখন খুলা'র মাধ্যমে নিজের স্বামীর কাছ থেকে অব্যাহতি লাভে আগ্রহী হবে, তখন সে চেয়ারম্যানকে (অথবা পারিবারিক আদালতের প্রেসিডেন্টকে) নোটিশ দেবে যে, তিনি যেন স্বামীকে দেয় আর্থিক বিনিময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন। চেয়ারম্যান এই বিনিময় নির্ধারণের পর ৭নং ধারার অধীন আপোষ রফার তৎপরতা শুরু করে দেবেন, আপোষ রফার চেষ্টা ব্যর্থ হলে স্ত্রীর নোটিশ দেয়ার অথবা সন্তান প্রসবের নব্বই দিন পর বিয়ে ভেংগে যাবে।"

এখানে "খুলার মাধ্যমে" শব্দটা নেহায়েৎ কৃত্রিমভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নচেৎ এ দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। নচেৎ কমিটির আসল উদ্দেশ্য তো এই যে, স্ত্রী যখনই চাইবে তখনই যেন নিজের স্বামীর ওপর তালাক চাপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সেই সাথে স্বামী যদি কিছু অর্থও আদায় করতে চায়, তবে তা নিছক স্বামীর ইচ্ছায় আদায় হতে পারেনা। বরং এ ব্যাপারে আদালতকে ব্যবহার করতে হবে। আদালত এ কাজটা করবে এবং তারপরে পুনরায় আপোষ মীমাংসার চেষ্টা চালাবে। প্রশ্ন এই যে, এ যাবত আপনারা জিদ ধরে এসেছেন যে, খুলা'র জন্য কোনো বিচারবিভাগীয় ব্যবস্থার দরকার নেই। আপনাদের বক্তব্য অনুসারে এটা যদি "খুলা'র মাধ্যমে অব্যাহতি" হয়ে থাকে, তবে এতে বিচার বিভাগীয় ও আপোশমূলক কার্যক্রম কোথা থেকে বেরুলো? তালাকের পর তা যদি রজয়ী তালাক হয়, তবে তো প্রত্যাহার ও আপোষের প্রশ্ন আসে। কিন্তু খুলা ও বিচার বিভাগীয় বিচ্ছেদ তো তালাকে বায়েনের পর্যায়ের। এরপর তো কোনো আপোষ রফা ও প্রত্যাহারের অবকাশ থাকেইনা। তাহলে এটা কি ধরনের আপোষমূলক কার্যক্রম এবং এর সফলতা বা ব্যর্থতার প্রশ্নই বা কোথা থেকে আসে? আপনারা আপনাদের মনের কথা স্পষ্ট করে বলুন যে, স্ত্রী যখন খুশী স্বামীকে তালাক দিতে পারে, কিন্তু স্বামী যদি তালাকের সাথে কোন আর্থিক বিনিময় দাবী করে, তাহলে এই বিনিময় তালাকের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

প্রকৃত ব্যাপার হলো, রিপোর্টের এই ৩৫ নং ধারাটিতে স্ত্রীকে একতরফাভাব বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাবার যে অধিকার দেয়া হচ্ছে, ইসলামের প্রস্তাবিত খুলা'র বিধির সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই। এটা এক ধরনের ধোঁকাবাজি যা আল্লাহর দ্বীন ও তার অনুসারীদের সাথে করা হচ্ছে। তবে এই ধাপ্পাবাজি-ইনশায়াল্লাহ নিস্ফল হবে। যেহেতু রিপোর্টে কুরআন, সুন্নাহ ও ফকীহদের ইজমা বা মতৈক্যের উল্লেখ আছে, তাই মনে হচ্ছে যে, হয়তো কিছু নেপথ্যচারী আলেম এসব সলাপরামর্শে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কিন্তু তাদের নাম প্রকাশ করা হচ্ছেনা। এ ধারণা ভ্রান্ত হলে আল্লাহ আমাদের মাফ করুন। আর যদি সত্য হয়, তবে এই পর্দানশীন আলেমদের নাম গোপন থাকা উচিত নয়। সমগ্র জাতি এই রিপোর্টের রচয়িতাদের চিনুক জানুক।

এ প্রসংগে আরো একটা কথা উল্লেখ করা সংগত মনে হচ্ছে যে, 'ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী' নামে সরকার একটা প্রতিষ্ঠান কায়েম করে রেখেছে। ডক্টর তানযীলুর রহমান পিএইচডি স্থায়ীভাবে এই প্রতিষ্ঠানের "আইনগত উপদেষ্টা" হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি "মাজমুয়ায়ে কাওয়ানীনে ইসলাম" নামে একটা বিশাল গ্রন্থ লিখেছেন। ইসলামী আইন সম্বলিত এই গ্রন্থের এ যাবত পাঁচ খন্ড এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে তালাক, খুলা' ও বিয়ে বিচ্ছেদ ইত্যাদি দাম্পত্য ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। খুলা সংক্রান্ত আলোচনা ৫৭০ পৃঃ ৬০৯ পৃঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ বিশেষত কমিটির সম্মানিত সভাপতি যদি আমাদের বক্তব্যের সাথে একমত হতে পারেন, তবে তাদের উক্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত। হয়তো এভাবে এরা নিজেদের ভ্রান্তি বুঝতে পারবেন এবং ভ্রান্তির ওপর জিদ না ধরে সত্যের পথে ফিরে আসতে সক্ষম হবেন।

আপাততঃ আমরা উক্ত গ্রন্থ থেকে একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। গ্রন্থের ৫৯২ পৃষ্ঠায় "খুলা ও আদালতের নির্দেশ" শিরোনামে বলা হয়েছে ঃ

> "ইমাম বুখারী লিখেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) খুলা'কে বৈধ করেছেন, যদিও তা শাসকের সামনে সংঘটিত না হয়। সাধারণ আলেমদের মতেও খুলা বৈধ হবার জন্য সমকালীন শাসকের উপস্থিতি শর্ত নয়। ইমাম কাসানীও এই মতকে সঠিক লিখেছেন। হানাফী আলেমগণ, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের একটি অভিমত অনুরূপ। বিচারপতি শুরাইহ, যুহরী ও ইসহাকের মতও অনুরূপ। ইবনে কুদামা মুকাদ্দিসী (রঃ) এর এই যুক্তি দিয়েছেন যে, যেহেতু খুলা একটা বিনিময় ভিত্তিক চুক্তি, তাই বিয়ে এবং চুক্তি বাতিল করা যেমন পারস্পরিক সম্মতিকালে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং এ ধরনের অন্যান্য চুক্তিতে যেমন সমকালীন শাসকের উপস্থিতি শর্ত নয়। তেমনি খুলাতেও শর্ত নয়।
>
> কিন্তু ফকীহগণের নিকট খুলার জন্য সমকালীন শাসকের উপস্থিতি জরুরী না হওয়ার অর্থ শুধু এতটুকু যে, উভয় পক্ষ যদি পরস্পরে খুলা করতে চায়, তবে বৈধতার জন্য শাসক বা বিচারকের নির্দেশ শর্ত নয়। এ জন্য দম্পতি যদি

পারস্পরিক সম্মতিক্রমে বিচ্ছিন্ন হতে চায় তবে ফিকহশাস্ত্রীয় পরিভাষায় তাকে "মুবারাত" বলা হয়। এটা খুলার মতই। কিন্তু যদি দম্পতির মধ্যে বনিবনা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তারা যে আল্লাহর সীমানা বজায় রাখতে পারবেনা এবং তাদের খুলা করা উচিত-এ সিদ্ধান্ত তৃতীয় কোনো ব্যক্তিই করতে পারে। আর এরূপ পরিস্থিতিতে আদালতের মাধ্যমে খুলা করানো যায়। তাই স্ত্রী যদি বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে চায় এবং স্বামীকে তার বিনিময় দিতে চায় তবে ইসলাম উল্লিখিত শর্তাবলী সহকারে স্ত্রীকে এই অধিকার প্রদান করে যে, সমকালীন শাসক কিংবা তার প্রতিষ্ঠিত আদালতে উপস্থিত হয়ে দরখাস্ত পেশ করতে পারে এবং আদালতের মাধ্যমে স্বামীর কাছ থেকে খুলা' আদায় করতে পারে। পবিত্র কুরআনের আয়াত فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ - এবং সাবেত বিন কায়েস (রাঃ)কে রসূল (সঃ) কর্তৃক এই আদেশ প্রদান করেন যে, তুমি নিজের বাগিচা (বা দুটি বাগিচা) ফিরিয়ে নাও এবং স্ত্রীকে তালাক দাও-এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবনিবনা হলে স্ত্রীর আবেদনক্রমে খুলা করিয়ে দেয়া ফরয-যখন এই মর্মে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, উভয়পক্ষের একত্রে বসবাসে আল্লাহর বিধান মেনে চলা সম্ভব নয়। সাবেত বিন কায়েসের ব্যাপারে রসূল (সঃ) নিশ্চিতভাবে ইসলামের প্রথম বিচারক হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।"

পূর্ববর্তী সমালোচনামূলক নিবন্ধ লেখার সময় আমাদের সামনে ডক্টর তানযীলুর রহমান সাহেবের এই লেখাটা ছিলনা। কিন্তু এখন ওটা পড়ে সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে, তার ও আমাদের কথায় মতের কত মিল ও ঐক্য বিরাজ করছে এবং খুলার নামে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার যে ক্ষমতা এই কমিটি স্ত্রীর হাতে দিতে চায়, তা কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী ফেকাহর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বেআইনী ও অবৈধ। অবশ্য পাশ্চাত্যবাসীর অন্ধ অনুকরণে তালাকের ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীকে সমানাধিকার দেয়া যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর আদালতের কাজ শুধু এতটুকু হয়ে থাকে যে, সে স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে দেয়া তালাকের শুধু ঘোষণা দেবে ও সত্যায়ন করবে এবং দম্পতির আর্থিক দেনা-পাওনার হিসাব করে দেবে, তাহলে সেটা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। [তরজুমানুল কুরআন, আগস্ট, ১৯৭৬]

নারী অধিকার কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা-(২)

"পাকিস্তান নারী অধিকার কমিটির" রিপোর্ট পর্যালোচনা করার সময় এ কথা ভালোভাবেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, রিপোর্টের ৩৫ নং ধারায় যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতে যখন ইচ্ছা স্বামীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার অবাধ অধিকার স্ত্রীকে দেয়া হয়েছে। এরপর সে যখন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বা পারিবারিক আদালতের সভাপতিকে নোটিশ দেবে, তখন শুধু এই উদ্দেশে দেবে যে, আদালতের

সভাপতি স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দেয় বিনিময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবেন। এ ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, আদালত স্ত্রীর এক পয়সাও দেয়া লাগবেনা বলে রায় দেবে। এরপর যে আপোষমূলক কার্যক্রমের কথা এই সুপারিশে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও আমরা বলেছি যে, ওটা একটা নিষ্প্রয়োজন প্রদর্শনী ও কৃত্রিম তৎপরতা। কেননা সে ক্ষেত্রে আদালতের হাত এমনভাবে বেঁধে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রী যাই করুক, চাই তাকে খুলা' অথবা বিয়ে বিচ্ছেদের দাবীই বলা হোকনা কেন, স্ত্রীর উক্ত কাজের কোনো আইনগত বা শরীয়তসম্মত বৈধতা আছে কিনা সে ব্যাপারে আদালত কোনো চিন্তাভাবনাই করতে পারবেনা। বরং আদালতের কাজ হবে শুধু বিয়ে ভেংগে দেয়ার পথ সুগম করা। আপোষরফার কার্যক্রম এখানে একেবারেই নিরর্থক ও শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। সকল মুসলিম আলেম ও পূর্বতন ফকীহগণ এই মতই অবলম্বন করেছেন যে, খুলা' ও বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে বিয়ে বিলোপের দাবী যেহেতু স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাই খুলা' মেনে নেয়া অথবা আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর তা প্রত্যাহার ও আপোষরফার আর কোনো অবকাশ থাকেনা এবং তালাকে বায়েন সংঘর্ষিক হয়ে যায়। এ জন্য রিপোর্টের ৩৫ নং ধারার আলোকে পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সের ৮ নং ধারায় যে সংশোধনী তৈরী করা হচ্ছে এবং তাতে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের যে অবকাশ রাখা হচ্ছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, স্ত্রী বিয়ে ভাংগার যে দাবী নোটিশের আকারে আদালতের নামে পাঠাবে, আদালত তাকে একতরফা সিদ্ধান্ত গণ্য করে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে।

আরো মজার ব্যাপার এই যে, এই সুপারিশে স্ত্রীর ওপর এতটুকু দায়িত্বও চাপানো হয়নি যে, তার অন্তরে যখন "নিজের স্বামীর কবল থেকে নিস্তার লাভের ইচ্ছা" জন্ম নেয়, তখন সে যেন সে ইচ্ছার কথা নিজের স্বামীকে জানায় অথবা যে নোটিশ চেয়ারম্যানকে পাঠানো হবে, তার একটা কপি যেন স্বামীর কাছে পৌঁছায়। স্ত্রী সরাসরি আদালতকে সম্বোধন করে স্বামীকে দেয় বিনিময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিতে বলবে। এরপর যখন আদালত তৎপর হবে, তখন স্বামী জানতে পারবে যে, তার স্ত্রীর নোটিশ অনুসারে আইন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আর আপোষমূলক কার্যক্রম ব্যর্থ হয়ে গেলে নোটিশ দেয়ার তারিখ থেকে ৯০ দিন পর অথবা সন্তান প্রসবের পর (যেটাই পরবর্তীতে ঘটুক তার সমাপ্তির পর) বিয়ে ভেংগে যাবে। স্ত্রীর নোটিশের ৯০ দিন পর অথবা সন্তান প্রসবের পর বিয়ে বাতিল হওয়ার অর্থ একমাত্র এটাই দাঁড়ায় যে, কমিটি এই নোটিশকে স্ত্রীর পক্ষ থেকে তালাকের স্থলাভিষিক্ত এমনকি তালাকের চেয়েও দ্রুত কার্যকর অভিহিত করছে। কেননা গর্ভবতী নয় এমন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতও তিন ঋতু শেষ হওয়া পর্যন্ত চালু থাকে, যার মেয়াদ অনেক সময় ৯০ দিনের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে।

আরো উল্লেখযোগ্য যে, এই বিয়ে বিচ্ছেদ কার্যকর হওয়ার পর একবার মাত্র আপীলের সুযোগ দেয়া হয়েছে। ৩৫ নং ধারার শেষ কথাটি এই ঃ

> "কমিটি আরো সুপারিশ করছে যে, খুলা'র জন্য বিনিময় নির্ধারণের ব্যাপারে একবার আপীলের সুযোগ দেয়া উচিত।"

উক্ত রেখাংকিত অংশ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ৩৫ নং ধারার অধীনে আদালতের আসল কাজ স্ত্রীর খুলা দাবী (বা খুলার সিদ্ধান্ত) ন্যায়সংগত কিনা তা খতিয়ে দেখা নয়।

বরঞ্চ আদালত বিয়ে বাতিল করার ঘোষণাকে অবশ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে সত্যায়িত করবে। তবে এরপর সে শুধু এতটুকু বিবেচনা করবে যে, স্বামীকে কিছু বিনিময় দেয়া হবে কিনা? আর দেয়া হলে তার পরিমাণ কি হবে। আপীল যদি হয় তবে এই পরিমাণ নির্ধারণের বিরুদ্ধেই হবে। বিচ্ছেদ বা খুলা বৈধ কিংবা সংগত কিনা সেটা নিম্ন আদালতেও বিবেচ্য হবেনা, উচ্চ আদালতেও নয়।

৩৫নং ধারা নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর এবার আমরা আরো কয়েকটি দফার পর্যালোচনা করবো। এসব ধারায় কমিটি নারীদের আর্থিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা চালিয়েছে বলে মনে করে। এর বাস্তব রূপ ৩৮ নং ধারায় নিম্নরূপ পেশ করা হয়েছে।[১]

> "কমিটি অনুভব করছে যে, আইনে যদি এ বিষয়ে কোনো নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে তা তালাকের পর দরিদ্র ও অসহায় হয়ে যাওয়া মহিলাদের অবস্থা উন্নয়নের সহায়ক হবে। চিন্তা করা হয়েছে যে, তালাকের পর স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান ও যৌতুক ফেরত দেয়ার ব্যাপারে দেওয়ানী মোকদ্দমার পাশাপাশি ফৌজদারী মোকদ্দমার মাধ্যমেও স্বামীকে বাধ্য করা উচিত, যদি সে মোহরানা প্রদান না করে ও যৌতুক ফেরত না দেয়। তাই কমিটি এই মর্মে সুপারিশ করছে যে, তালাক কার্যকর হওয়ার পর স্বামী যদি এক মাসের মধ্যে মোহরানা না দেয় এবং/ অথবা যৌতুক ফেরত না দেয়, তাহলে তাকে তিন মাস পর্যন্ত মেয়াদের জন্য শুধু কারাদন্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দন্ডের যোগ্য সাব্যস্ত করা হোক।"

এই ধারাটি সম্পর্কে মন্তব্য করার আগে আমরা এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই যে, স্ত্রীর মোহরানা প্রদানে গড়িমসি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অপছন্দনীয় কাজ। অনুরূপভাবে মোহরানাকে তালাক বা মৃত্যু পর্যন্ত বিলম্বিত করাও অন্যায়। তাছাড়া কোন শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া তালাক দেয়াকেও রসূল (সঃ) হালাল ও বৈধ কাজগুলোর ভেতর সবচেয়ে নিন্দিত ও অপছন্দনীয় কাজ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু তালাক রোধ করার জন্য কমিটি যে কর্মপন্থা উদ্ভাবন করেছে, তাতেও বেশ কিছু কুৎসিত ও জটিল দিক রয়েছে। মুসলমানদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে বহুসংখ্যক অনৈসলামী রসম রেওয়াজ শিকড় গেড়ে বসে আছে। সেই সবগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে কোনো প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ না নেয়া হলে কোনো একটি মাত্র আইন দ্বারা সংশোধন সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ মোহরানার বিষয়টাই ধরুন। এ ক্ষেত্রে এত চরমভাবাপন্ন ধ্যান-ধারণা বিরাজ করছে যে, কেউ কেউ ত্রিশ বত্রিশ টাকা শরয়ী

---

১. এখানে এ কথা বলে দেয়া প্রয়োজন যে, এ যাবত আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তা ইংরজিতে প্রকাশিত রিপোর্টের ভিত্তিতে করেছি। এখন সরকারের প্রকাশিত একটা উর্দু রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয়েছে। এর ভাষা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তবে পরবর্তী আলোচনায় যথাসম্ভব উর্দু রিপোর্ট থেকেই উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। পাঠকবর্গ যদি ঐসব উদ্ধৃতিতে কোন বৈশাদৃশ্য লক্ষ্য করেন তবে তার দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর চাপাবেননা।

মোহরানা মনে করে নির্ধারণ করে থাকে। কেউ কেউ স্বামী-স্ত্রীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার তোয়াক্কা না করে লাখ লাখ টাকা লোক দেখানো মোহরানা ধার্য করে। উভয়পক্ষের অভিভাবকরা বলেন, যত খুশী মোহরানা বাঁধ, মোহরানা দেয়ইবা কে, নেয়ই বা কে? এভাবে অসংখ্য বড় বড় দাগের মোহরানা রয়েছে, যা আজো দেয়া হয়নি এবং তা কেবল কাবিননামায় বা কাজীদের রেজিস্ট্রারে রয়েছে। আমাদের মতে এসব মোহরানা অবশ্যই আদায় হওয়া উচিত। কিন্তু তালাকের ক্ষেত্রে মোহরানা না দেয়াকে যদি ফৌজদারী অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়, যার সাজা তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে। তাহলে এর ফল হবে এই যে, অবনিবনা হওয়া সত্ত্বেও স্বামীরা তালাক না দিয়ে স্ত্রীকে ঝুলন্ত রেখে দেবে। এ জন্য আমাদের পরামর্শ এই যে, এ ব্যাপারে যে আইনই প্রণয়ন করা হোক, তা আইন কার্যকর হওয়ার আগে সম্পাদিত বিয়েগুলোতে যেন প্রয়োগ না করা হয়। ভবিষ্যতের জন্য যদি মোহরানা না দেয়াকে ফৌজদারী অপরাধে রূপান্তরিত করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে কাবিননামাগুলোতে ওটাকে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে এবং সেই সাথে তার শাস্তিও দর্শনীয়ভাবে লিখিত থাকা চাই। যারা বিয়ে পড়ায় তাদেরকে বিয়ে পড়ানোর আগে এই ফৌজদারী বিধি পড়ে শুনিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া উচিত। তারা যেন এ কথাও জানিয়ে দেয় যে, অবনিবনার কারণে বিচ্ছেদ ঘটার পর এক মাসের ভেতর মোহরানা না দিলে স্বামীকে জেলে যেতে হবে।

রিপোর্টের ৩৮ ধারায় কৃত সুপারিশের আরেকটি আপত্তিকর দিক এই যে, এতে শুধু মোহরানা না দেয়াকেই নয়, বরং যৌতুক ফেরত না দেয়াকেও দন্ডনীয় ফৌজদারী অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। মনে হয়, যৌতুক যে পরিমাণে ও যে আকারেই স্ত্রীকে দেয়া হোক, তা সব সময় স্বামীর দখলেই থাকবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে এবং তা হুবহু ফেরত দেয়া স্বামীর আইনগত দায়িত্ব হবে। আমরা মনে করি, নির্বিচারে এরূপ একটা ধারণা করে নেয়া এবং তার ভিত্তিতে যৌতুক ফেরত না দেয়াকে ফৌজদারী অপরাধে রূপান্তরিত করা স্বামীদের প্রতি সুস্পষ্ট যুলুম। মোহরানার ব্যাপারটা প্রশ্নাতীত। ওটা নিঃসন্দেহে স্ত্রীর একটা আর্থিক অধিকার এবং স্বামীর কাছে তার প্রাপ্য। মোহরানা বিয়ের সময়ই পুরোপুরি আদায় হয়ে যাওয়া উচিত। সে সময় আদায় না হয়ে থাকলে স্ত্রী যখন ইচ্ছা তা চাইতে পারে এবং আইনের সাহায্য নিয়েও আদায় করতে পারে। কিন্তু যৌতুক এমন কোনো জিনিস নয় যা সব সময় স্বামীর ব্যবহারে এবং দখলেই থাকবে এবং সে সমগ্র জীবনব্যাপী যৌতুকের জিনিস অবিকলভাবে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। যৌতুক সাধারণত অস্থাবর সম্পত্তি যথা নগদ টাকা, গয়না, পাত্র, কাপড় চোপড়, আসবাবপত্র ইত্যাদি হয়ে থাকে এবং সাধারণতঃ স্ত্রীর ব্যবহারে থাকে। এগুলো আসল অবস্থায় ও পরিমাণে বহাল থাকতে পারেনা। স্ত্রী এগুলো যেখানে ইচ্ছা সাথে করে নিয়ে যেতে পারে এবং যাকে খুশী দিতে পারে। অনেক সময় এ সব জিনিস সে বাপের বাড়ীও নিয়ে যেতে পারে। সকল যৌতুক স্বামীর কাছে সোপর্দ করে দেবে এমন স্ত্রী বিরল এবং এমন স্বামীও দুর্লভ যে, স্ত্রীর সকল যৌতুক সিন্ধুকে বা ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখে দেবে,

এবং স্ত্রীকে স্পর্শও করতে দেবেনা, নিজেও স্পর্শ করবেনা। এভাবে একদিন তালাকের পরিস্থিতি দেখা দিতেই জেল-জরিমানার ভয়ে তালার চাবি স্ত্রীর হাতে সঁপে দেবে।

যৌতুক সম্পর্কে একটা আইন সম্প্রতি জাতীয় পরিষদে পাশ হয়েছে। সে আইনেও এ ধরনের অযৌক্তিক ও অবাস্তব ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। যেমন বিয়ের সময় যৌতুকের সকল মালামাল বিয়ের মজলিশে দেখাতে হবে, যিনি বিয়ে পড়াবেন তিনি স্বামী ও স্ত্রীর স্বাক্ষরসহ ঐসব জিনিসের তালিকা তৈরী করবেন এবং তা জেলা প্রশাসকের দফতরে দাখিল করবেন। এর অন্যথা হলে এবং যৌতুক নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বেশী হলে পিতামাতাকে শাস্তি দেয়া হবে। এখন নারী অধিকার সমিতি যৌতুক সম্পর্কে যে সুপারিশ করছে, তারপর হয়তো এ কথাও সংযোজন করতে হবে যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর (যেমন তিন মাস বা ছয় মাস) একটা ফরম বিয়ের রেজিস্ট্রার বা অন্যান্য কর্মকর্তাদের কাছে পূরণ করবে এবং তাতে লেখা থাকবে যে, যৌতুকের কত অংশ স্বামীর দখলে আছে এবং কত অংশ স্ত্রী নিয়ে নিয়েছে বা ব্যবহার করেছে। তা না হলে কোনো পর্যায়ে যদি যৌতুকের বিবাদ মোকদ্দমার আকারে আদালতে গড়ায়, তাহলে কি পরিমাণ যৌতুক স্বামীর কাছে ছিল, যা সে স্ত্রীকে দেয়নি এবং এখন না দেয়ার কারণে সে জেল বা জরিমানার উপযুক্ত, তা আদালত কিভাবে নির্ণয় করবে? এ ধরনের কান্ডজ্ঞানহীন আইন রচনার ফল এটাই হয়ে থাকে যে, জনগণকে আইন ভংগ করতে, হিলাবাহানা করে আইনকে ফাঁকি দিতে এবং অনর্থক মামলাবাজি করতে প্ররোচিত ও অভ্যস্ত করা হবে। এভাবে মানুষের ঘরোয়া জীবনকে একটা চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়।

স্বামীর ঘাড়ে আইনত যৌতুক ফেরত দেয়ার দায়িত্ব চাপানোর পর কমিটি আরো এক ধাপ সামনে অগ্রসর হয়েছে এবং ৪০ নং ধারায় তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে তালাকদাতার ভূসম্পত্তিতেও অংশীদার বানানোর সুপারিশ করেছে। এই ধারাটি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলের অধিকারী, তাই আমরা সংশ্লিষ্ট ধারাটিকে হুবহু উদ্ধৃত করছি ঃ

> "তালাক দেয়ার যে আইনগত অধিকার স্বামীর রয়েছে, তার ওপর কিছু কড়াকড়ি আরোপ করা যায় কিনা, তা নিয়ে কমিটি অনেক ভেবেছে। কেননা বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, স্বামী কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই নিজের তালাকের অধিকারকে প্রয়োগ করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। কোনো কোনো সময় স্বামীর পক্ষ থেকে এ অধিকার (মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও) এই ভেবে প্রয়োগ করা হয় যে, তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে অংশ দাবী করার সুযোগ থেকে যেন স্ত্রীকে বঞ্চিত করা যায়, বিশেষতঃ যখন সন্তানহীনা হয়। কমিটির অভিমত হলো, স্বামীর পক্ষ থেকে প্রয়োগকৃত তালাকের অধিকারকে এরূপ বিধি প্রণয়ন করে বন্ধ করতে হবে যে, স্ত্রীকে মোহরানা প্রদান ও যৌতুক ফেরত দেয়া ছাড়াও স্বামীকে আদেশ দিতে হবে যে, স্ত্রী যদি পাঁচ বছর বা তার বেশী তার ঘর করে থাকে তবে তাকে

যেন ক্ষতিপূরণও দেয়। কমিটির সুপারিশ এই যে, "স্ত্রী যদি বিয়ের পর পাঁচ বছর বা তার বেশী স্বামীর সাথে বসবাস করে থাকে, তাহলে স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক কার্যকরী হওয়ার পর সে স্বামীর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ $\frac{১}{৮}$ আদায় করতে পারবে।"

এই ধারাটি উদ্ধৃত করার পর আমরা সর্বপ্রথম কমিটির সদস্যবর্গ, বিশেষতঃ তার সম্মানিত সভাপতির কাছে যে প্রশ্নটি রাখতে চাই তা এই যে, আপনার বক্তব্য অনুসারে আপনি যখন কুরআন ও সুন্নাহ্ বিরোধী কোনো আইন চালু করতে চাননা, তখন দয়া করে বলুন, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তার সাবেক স্বামীর সম্পত্তিতে অংশীদার বানানোর প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাহর কোথায় আছে? পূর্বে যখন আপনারা এই মর্মে সুপারিশ করলেন যে, স্ত্রী কলমের এক খোঁচায় একটা নোটিশ দিয়ে বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার পাবে, তখন আপনারা অন্ততঃ একটা আয়াত, একটা হাদীস ও একটা ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় উক্তি তার সপক্ষে পেশ করেছিলেন। কিন্তু যখন আপনারা তালাকের পরও তালাকপ্রাপ্তাকে তালাকদাতার সম্পত্তিতে অংশীদার বানাতে চাইলেন, তখন আপনারা ইসলামী শিক্ষা ও মূলনীতির আলোকে নামমাত্র একটি প্রমাণ দিতে পারেননি। শুধুমাত্র স্বামীর তালাকের অধিকারটা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলেন, আর তারপর এই সুপারিশ করে দিলেন। আপনাদের উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে তালাকের অধিকারের ওপর কড়াকড়ি আরোপ এবং তার অবৈধ প্রয়োগ রোধ, তাহলে প্রশ্ন এই যে, নোটিশের মাধ্যমে স্বামীকে তালাক দেয়ার যে অধিকার আপনারা স্ত্রীকে দিতে চান, তার কি ভুল প্রয়োগ হতে পারেনা? তার ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা কি জরুরী নয়? আর সে ক্ষেত্রে আপনারা স্বামীকে তালাক দেয়া স্ত্রীর সম্পত্তি, যৌতুক ইত্যাদিতে অংশীদার করার সুপারিশ কেন করলেননা?

আসল ব্যাপার হলো, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং পাশ্চাত্যবাসীর চালচলন ও রীতিনীতি কিছু লোকের কাছে একটা আদর্শের স্থান গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা মনে করে পাশ্চাত্যে যেহেতু এইসব রীতিপ্রথা ও আইন-কানুন চালু রয়েছে, স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেয়ার কিংবা স্বামীকে তালাক দেয়ার পরও তার কাছ থেকে খোরপোশ আদায় করে থাকে এবং জীবনের অবশিষ্ট অবকাশকে ভোগ করতে থাকে, তাই উন্নতি ও প্রগতির দাবী এই যে, সেই রীতিনীতিকে এখানেও চালু করতে হবে। অষ্টমাংশ $\frac{১}{৮}$ সম্পর্কে যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা থেকে মনে হয় যে, সন্তানধারী মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নীর জন্য কুরআনে যে অষ্টমাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ কিয়াস বা ইজতিহাদের মাধ্যমে সেখান থেকেই তালাকপ্রাপ্তাকেও সাবেক স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বানানোর বিধি গৃহীত হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মনে সত্যিই যদি এ ধরনের ধ্যান-ধারণা কাজ করে থাকে, তবে তা একেবারেই ভ্রান্ত ও বাতিল ধারণা। ইসলাম কোনো ব্যক্তিকে কোনো অবস্থায় কারো জীবদ্দশায় উত্তরাধিকারী বানায়না, চাই উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠই হোকনা কেন। তা যদি হতো, তাহলে বৃদ্ধ পিতামাতা, প্রাপ্তবয়স্ক অসহায় ছেলে মেয়ে যাদেরকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে,

তারা সম্পত্তিশালী পুত্র বা বাপের জীবদ্দশায় উত্তরাধিকার লাভের বেশী উপযুক্ত হতো। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে যেহেতু দুর্বল মাতাপিতা স্বচ্ছল সন্তানদের উপার্জন থেকে অংশ লাভের পরিবর্তে বৃদ্ধলোকদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ ধরনের বৃদ্ধ নিবাসে চরম অসহায়ের মত জীবন যাপন করছে সে জন্য তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আমাদের এখানেও কোনো কমিটি বসবেনা। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয় এবং তারপর খোঁজও নেয়া হয়নি যে তারা কোথায় কিভাবে আছে। কিন্তু সেখানে যেহেতু জীবিত পিতামাতার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে তাদেরকে অংশ দেয়া হয়না। তাই এখানেও এ ধরনের কোন প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। কিন্তু পাশ্চাত্যে তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীরা যেহেতু সাবেক স্বামীদের ব্যয়ে আয়েশী জীবন কাটাচ্ছে, তাই এখানেও তাদের জন্য কিছু না কিছু ব্যবস্থা হওয়া চাই। নচেৎ আমরা বিশেষ করে আমাদের "সংস্কৃতিমনা বেগমরা" আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে কিভাবে মুখ দেখাবে?

মোট কথা, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর জন্য অষ্টমাংশ $\frac{১}{৮}$ সম্পত্তি নির্ধারণের দূরতম সম্পর্কও ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সাথে নেই। উত্তরাধিকার শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে হয়ে থাকে। তাছাড়া এই উত্তরাধিকার কারো প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ণিত হয়না, হয় সম্পর্কের ভিত্তিতে। রক্তের সম্পর্ক (যথা পিতামাতা, ভাই-বোনের সম্পর্ক) চিরস্থায়ী, কিন্তু দাম্পত্য সম্পর্ক অস্থায়ী। তালাক, খুলা' বা বিচ্ছেদের মাধ্যমে এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এ সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর স্ত্রীও স্বামীর উত্তরাধিকারী হতে পারে না, স্বামীও স্ত্রীর উত্তরাধিকারী হতে পারেনা। তালাকপ্রাপ্তাকে সাবেক স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ দেয়ার অর্থ হচ্ছে প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের অধিকার নষ্ট করা। স্বামীর মৃত্যুর সময় তার সম্পত্তি নষ্টও হয়ে যেতে পারে অথবা যে সময় তালাক দিয়েছিল তখনকার চেয়ে কম হয়ে যেতে পার। এভাবে অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের ভাগে কিছুই থাকবেনা কিংবা খুবই কম থাকবে। অথচ তালাকপ্রাপ্তা-যার কোনো সম্পর্ক স্বামীর সাথে ছিলনা। সে অষ্টমাংশ ঠিকই নিয়ে যাবে। শুধু এ জন্য যে, সে পাঁচ বছর স্বামীর ঘর করেছিল। তাছাড়া সন্তানধারী স্বামীর যদি দুই স্ত্রী থেকে থাকে, তাহলে তারা তার মৃত্যুর পর $\frac{১}{১৬}$, $\frac{১}{১৬}$ নেবে, যদি কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট থেকে থাকে। কিন্তু কমিটির প্রস্তাব অনুসারে তালাক পাওয়া স্ত্রী স্বামীর জীবদ্দশাতেই $\frac{১}{৮}$ ভাগ পেয়ে যাবে। অধিকন্তু এ প্রশ্নও জাগে যে, উক্ত মহিলাকে তালাক দেয়ার পর স্বামী যদি অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করে এবং সে যদি মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার সাথে বসবাস করে, তাহলে সে উত্তরাধিকার হিসেবে কি পাবে? মানবীয় মস্তিষ্ক যখন আল্লার আইন সংশোধনের ধৃষ্টতা দেখায়, তখন তার ফল অবশ্যই বিকৃতি ও কারো হক নষ্ট করার আকারেই দেখা দেবে। চাই সংশোধনকারীদের উদ্দেশ্য ও দাবী যতই মহৎ ও কল্যাণধর্মী হোকনা কেন।

রিপোর্টের এই ৪০ নং ধারায় কমপক্ষে পাঁচ বছর স্বামীর ঘর করে থাকলে

তালাকপ্রাপ্তাকে তালাকদাতার সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ অংশের উত্তরাধিকারী বানানোর সুপারিশ করা হয়েছে। পাঁচ বছর এমন কোনো দীর্ঘ সময় নয় যে, কোনো বিবাহিত স্ত্রী-বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যেতে পারে এবং দ্বিতীয় বিয়ের যোগ্য থাকেনা। ইসলাম এটাও পছন্দ করেনা যে, কোনো তালাকপ্রাপ্তা বিধবা বা অবিবাহিত মহিলা অকারণে স্বামীবিহীন জীবন-যাপন করবে। তার জন্য বরং বিয়ে করাই উত্তম। তার অভিভাবকদেরকেও তাকে বিয়ে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখন পাঁচ বছর স্বামীর ঘর করার পর যে মহিলা কোনো কারণে তালাক পেয়ে যায়, সে যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে, তবে তার খোরপোশ তো দ্বিতীয় স্বামীর দায়িত্বেই থাকবে। এরপর তার সাবেক স্বামীর সম্পত্তি থেকেও অংশ পাওয়ার কি যৌক্তিকতা আছে? এটা পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আপত্তিকর না হলেও ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই অবৈধ এবং দাম্পত্য মর্যাদার ঘোরতর বিরোধী। এ পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় স্বামী এ স্ত্রীর কাছে দমিত ও পরাজিত হয়ে থাকবে। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীর আবার তালাক পেয়ে যাওয়ারও আশংকা আছে এবং সে হয়তো দ্বিতীয় স্বামীর কাছ থেকে সম্পত্তির অংশ পেয়ে তৃতীয় স্বামী গ্রহণ করবে। পাশ্চাত্য সমাজে এ পরিস্থিতি ব্যাপক এবং হরহামেশাই ঘটছে। নারী স্বাধীনতার মনোলোভা নামে বিয়ে, তালাক একেবারেই তামাসার বস্তু হয়ে গেছে। পারিবারিক জীবন একেবারেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সেখানে এমন স্ত্রীর পুরুষও প্রচুর পাওয়া যায়, যে এই অপেক্ষায় পথ চেয়ে থাকে যে, কবে কোন্ নারী নিজের স্বামীকে তালাক দিয়ে তার সম্পত্তি নিয়ে চলে আসবে, অমনি সে তাকে বিয়ে করে সুখের সাগরে ভাসবে। স্ত্রীর এ ধরনের সম্পত্তি বা পুঁজি যেই শেষ হয়ে যায়, অমনি তাকে উপার্জনের জন্য চাকরি করতে পাঠায়। নিজে খুব আরাম আয়েশে থাকে আর বলে বেড়ায় যে, আমার স্ত্রী পিএইচডি পাস করছে। ধরে নেয়া যাক, এ ধরনের পরিস্থিতি আমাদের সমাজে এখনই সৃষ্টি হবেনা। কিন্তু তবুও তালাকপ্রাপ্তাকে তালাকদাতা সাবেক স্বামীর সম্পত্তিতে অংশীদার করার এ দল অবশ্যই দেখা দেবে যে, তালাকের পর আর বিয়ে না করা এবং একাকিনী জীবন যাপনের প্রবণতা বাড়বে এবং এতে সমাজে যে অনাচারের বান ডাকবে, তা সহজেই অনুমান করা চলে। আমাদের জাতীয় নেতারা যদি গোটা জাতিকে এই পথেই চালিত করতে চান, তাহলে আমাদের মুসলিম ভাই বোন ও বৌঝিকে ভেবে দেখতে হবে যে, এ পথ আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে। নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতার শ্লোগান থেকে আমরা শেষ পর্যন্ত কি পাবো। আমাদের দুর্বল কলম ও ক্ষীণ কণ্ঠ দিয়ে যতদূর পারি, দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। আজ যদি এ আওয়াজ ফলবান না হয়, তাহলে অনাগত প্রজন্মের কাছে অন্ততঃ ইতিহাস বলবে যে, একদিন এই সর্বগ্রাসী ধ্বংসের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠেছিল, কিন্তু সে আওয়াজের কেউ তোয়াক্কা করেনি।

রিপোর্টের এই ধারাটির শুরুতে বলা হয়েছেঃ "বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, স্বামী

কোনো সংগত কারণ ছাড়াই তালাক দিয়ে ফেলে।" কিন্তু কমিটির সদস্যরা এর অপর দিকটি লক্ষ্য করলেননা যে, অনেক ক্ষেত্রে এমনও তো থাকা সম্ভব যেখানে তালাক সম্পূর্ণ সংগত কারণেই দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, স্ত্রী যদি আনুগত্যহীন ও চরিত্রহীন হয় কিংবা অন্য কোনো পুরুষের হাত ধরে পালিয়ে যায়, আর এ কারণে স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলেও কি স্ত্রী আপনাদের মতে স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির $\frac{১}{৮}$ -এর অংশীদার হবে? এখানে আপনি হয়তো বলবেন, সংগত কি অসংগত, তার ফয়সালা আদালত করবে এবং শুধুমাত্র সংগত ক্ষেত্রেই অংশীদার করবে। সেই সাথে আপনি সংগত ও অসংগত ক্ষেত্রেগুলোর একটা তালিকা তৈরী করবেন এবং অভিজ্ঞতার পর এই তালিকায় ক্রমাগত রদবদল হতে থাকবে। মোট কথা আপনি এ সমস্যার যত সমাধান খুঁজবেন তাতে আরো নতুন সমস্যার মুখোমুখী হতে থাকবেন। [তরজমানুল কুরআন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬]

নারী অধিকার কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা-(৩)

"পাকিস্তান নারী অধিকার কমিটি" নারীকে খুলা'র (স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা-যা ইসলাম বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীকে দিয়েছে) ছদ্মাবরণে যে ধরনের অবাধ, শর্তহীন ও স্বেচ্ছাচারমূলক 'তালাকের অধিকার' দিতে ইচ্ছুক এবং তালাকের পর যেভাবে তালাকপ্রাপ্তাকে সাবেক স্বামীর যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে অংশীদার করার প্রত্যাশী, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। সে আলোচনায় অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, উক্ত উভয় আবদার (অর্থাৎ খুলা'র নামে নারীর হাতে অবাধ ও শর্তহীন তালাকের ক্ষমতা প্রদান এবং ভূতপূর্ব স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব) কুরআন ও সুন্নাহর বিঘোষিত নীতি ও শিক্ষা এবং বিবেক-বুদ্ধি, যুক্তি ও ন্যায়নীতির দাবীর সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়। আসলে এ ধরনের আবদারের উৎপত্তি হয়েছে পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও সভ্যতার কাছে পরাজিত মানসিকতা থেকে। এ দ্বারা মুসলমানদের দাম্পত্য জীবনের সমস্যা ও জটিলতা নিরসন আদৌ সম্ভব হবেনা। অবশ্য ফিরিংগীদের চালচলন ও রীতিনীতি এ দেশে চালু করা সহজতর হবে। এ পর্যন্তকার আলোচনায় রিপোর্টের ৪০ নং ধারার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এবার আমরা ৪১, ৪২ ও ৪৩ নং ধারাগুলোতে যে সুপারিশ করা হয়েছে, তার পর্যালোচনা করবো। সুপারিশটি এরূপ ঃ

> "কমিটি মনে করে যে, স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়ার যে দায়িত্ব স্বামীর ওপর অর্পিত রয়েছে, তা তালাকের পর "ইদ্দতের" মেয়াদ শেষ হলেই, রহিত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। ইতিপূর্বে যেমন দেখা গেছে যে, এমন কিছু কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে সাবেক স্ত্রীর কাছে কোনো স্বতন্ত্র ও নিজস্ব উপার্জনের ব্যবস্থা থাকেনা, ফলে "ইদ্দত" শেষ হওয়ার পর তাকে অত্যন্ত জটিল আর্থিক ও বৈষয়িক সমস্যার

সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমান আইনের আওতায় স্ত্রী যত দীর্ঘকালই স্বামীর ঘর করে থাকনা কেন, স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অবাধ ক্ষমতা স্বামীর রয়েছে। স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগের ফল বর্ষীয়সী মহিলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। হয়তোবা এই বয়সে তার পক্ষে আর একটা বিয়ে করা সম্ভব হবেনা, আবার নিজের জীবিকা নিজে উপার্জন করাও হয়তো অসম্ভব হবে। কমিটি মনে করে যে, স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকের ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারমূলক প্রয়োগ কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব-যদি স্বামীকে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তার সাবেক স্ত্রীর আর্থিক দায়ভার বহন করার আদেশ দেয়া হয়। কমিটি তাই এই মর্মে সুপারিশ পেশ করছে যে, "স্বামীর পক্ষ থেকে যখন তালাক দেয়া হবে, তখন তাকে নির্দেশ দেয়া হোক যে, ইদ্দতের মেয়াদ ছাড়া তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতি বছরের জন্য এক মাস হিসাব যত বছরের দাম্পত্য জীবন কাটানো হয়েছে, তত মাসের খোরপোশ তার সাবেক স্ত্রীকে যেন দেয়।"

এই কমিটির রিপোর্টে একটা অদ্ভূত জিনিস পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেটি হলো, প্রথমে একটি বিরল ক্ষেত্র কল্পনা করে নেয়া হয়, যেখানে স্বামী ভীষণ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর আর স্ত্রী একেবারেই অসহায় ও নিষ্পাপ পরিদৃষ্ট হয়। পরক্ষণেই ওটাকে একটা নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা আখ্যায়িত করে একটা সাধারণ আইনগত সুপারিশ পেশ করা হয়। ৪০ নং ধারায় যেখানে তালাকপ্রাপ্তাকে তালাকদাতার সম্পত্তির অংশীদার করার দাবী জানানো হয়েছে, সেখানে এর যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে,

"স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী যাতে তার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের দাবী করার সুযোগ না পায়, সেই উদ্দেশ্যে কখনো কখনো স্বামীর মুমূর্ষ অবস্থায়ও তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।"

এখানে মুমূর্ষ অবস্থায় তালাক দেয়ার যে দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, তা একেবারেই বিরল ব্যাপার! আর এ দ্বারা যে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে, তা ইসলামী শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের এটা একটা সুবিদিত ও সর্বজন স্বীকৃত বিধি যে, মরণব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় কেউ যদি তালাকে বায়েনও দেয়, তথাপি তাতে ইদ্দত পালনকারিণী স্ত্রীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তি রহিত হয়না। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ স্বীয় স্ত্রীকে এ ধরনের তালাকই দিয়েছিলেন এবং স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) তালাকপ্রাপ্তাকে হযরত আবদুর রহমান বিন আওফের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন।[১] এ বিষয়টি সাহাবায়ে কিরামের সাধারণ অধিবেশনে পেশ

---

১. মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মদ ও অন্য কয়েকটি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, হযরত আবদুর রহমানের ইন্তিকাল ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়ার পরে হয়েছিল, কিন্তু ইমাম মালেক ও অন্য কতিপয় ফিকাহবিদ এরূপ পরিস্থিতিতেও স্ত্রীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির পক্ষপাতী।

করা হয় এবং সকলে এ সিদ্ধান্তে মতৈক্য প্রকাশ করেন। স্ত্রীর এই উত্তরাধিকার শুধুমাত্র মরণব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর তালাক দেয়ার ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ফিকাহবিদগণ পলাতক ব্যক্তির তালাকে এর সমতুল্য ধরে নিয়ে কিয়াসের রীতি অনুসরণপূর্বক সে ক্ষেত্রেও স্ত্রীর উত্তরাধিকারের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি হত্যা মামলায় আটক আছে, কিংবা শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত আছে, কিংবা কোনো ঝুঁকিপূর্ণ সফরে রওনা হচ্ছে, কিংবা অন্য কোনো ধ্বংসাত্মক ঘটনার সম্মুখীন। এমতাবস্থায় সে আপন স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছে। এ ধরনের তালাকও স্ত্রীর উত্তরাধিকার লাভকে বিঘ্নিত করবেনা।

এখন কমিটির সম্মানিত সদস্যবর্গের কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, মৃত্যুশয্যার তালাক যখন সাহাবায়ে কিরাম ও ফিকাহবিদগণের সর্বসম্মত মতানুসারে তালাকপ্রাপ্তার উত্তরাধিকার প্রাপ্তিকে ব্যাহত করতে পারেনা। তখন আপনারা স্বামীর মৃত্যুর আগেই তার সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারা করতে বসে গেলেন কেন?

যা হোক, পাকিস্তানের নারী সমাজের প্রতি উল্লেখিত কমিটির সহানুভূতি ও প্রীতি এমনই সীমাহীন যে, তার ফলে কমিটি তালাকপ্রাপ্তাকে সাবেক স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার বানিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয়নি। অধিকন্তু "তালাকের পর আপন স্ত্রীকে খোরপোশ দেয়ার দায়িত্ব থেকে স্বামীকে ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও অব্যাহতি দেয়া উচিত নয়" বলে মনে করে (ধারা নং ৪১)। এখানে পুনরায় সেই একই প্রশ্ন ওঠে। তালাক দেয়া ও ইদ্দতকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরও খোরপোশ দেয়ার এই বাধ্যবাধকতা তালাকদাতার ওপর শরীয়তের কোন্ দলিল বা কোন্ যুক্তির ভিত্তিতে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। কমিটির সুপারিশে "স্বামী" ও "আপন স্ত্রী" এই দুটি কথার ব্যবহার রহস্যজনক। এ দ্বারা এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে কিনা বুঝা গেলনা যে, ইদ্দতের পরও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি, তাই তালাকদাতার উচিত তালাকপ্রাপ্তার ভরণপোষণের একটা অংশ দিতে থাকা? সত্যিই যদি এই সুপারিশগুলোর পেছনে এ রকম ধ্যান-ধারণা সক্রিয় থেকে থাকে, তাহলে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলবো যে, এটা পুরোপুরি একটা হিন্দুয়ানি ও খৃস্টীয় চিন্তাধারা, যার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। হিন্দু ও খৃস্টানদের সমাজে শত শত বছর ধরে এ ধারণা চালু রয়েছে যে, বৈবাহিক সম্পর্ক চিরস্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য। এ ধারণার প্রভাব আজও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এ জন্য তালাক ও সম্পর্কচ্ছেদ সত্ত্বেও তালাক দেয়া স্ত্রীর জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে যাওয়া সাবেক স্বামীর দায়িত্ব বলে গণ্য করা হয়। তালাকপ্রাপ্তার জীবন-যাপনের এই সব ব্যয়ভারকে পাশ্চাত্য জগতে Alimony নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। নারী অধিকারী কমিটির সদস্যবৃন্দ সম্ভবতঃ হিতাহিত বিবেচনা করে তাদের মূল রিপোর্টে এই পাশ্চাত্য পরিভাষাটির ব্যবহার এড়িয়ে গেছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে তালাকপ্রাপ্তাকে তালাকদাতার সম্পত্তির অংশীদার করে এবং অংশীদার করার পর তার ওপর তালাকপ্রাপ্তার ভরণপোষণের বাড়তি বোঝা আরোপ করে ইসলামী সমাজে সেই অনৈসলামী ধারণার

গোড়াপত্তনেরই চেষ্টা করেছেন। একবার যদি এই প্রথার গোড়াপত্তন হয়ে যায় এবং তালাকের পর ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেলেও তালাকপ্রাপ্তার ভরণপোষণের ভার তালাকদাতার ঘাড়ে চাপানো যেতে পারে, তাহলে এর ফলে পাশ্চাত্যে যা কিছু ঘটে চলেছে এবং অধিকাংশ পরিবারের সুখ শান্তি যেমন ধ্বংস হয়ে গেছে, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

(ইদ্দতের পরও) তালাকপ্রাপ্তার ভরণপোষণের (Maintenance) এই যে প্রথাটি পাশ্চাত্য জগতে চালু রয়েছে এবং যাকে এ দেশেও ব্যাপকভাবে প্রবর্তনের চেষ্টা তদবীর চলছে, ইসলামের প্রচলিত ভরণপোষণের রীতির সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। স্ত্রী যতক্ষণ স্বামীর দাম্পত্য সম্পর্কের আওতায় থাকবে, ততক্ষণ তার ভরণপোষণ চালানো স্বামীর ওপর ফরয, চাই স্ত্রী বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হোকনা কেন। স্বামী যদি তা না দেয় তবে স্ত্রী আইনের সাহায্যে তা আদায় করতে পারে। স্ত্রী স্বামীর নামে ধার নিয়েও নিজের ব্যয় নির্বাহ করতে পারে এবং সেই ধার পরিশোধ করা স্বামীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ না করুক, স্ত্রী যদি তালাকপ্রাপ্তা হয়ে যায় তাহলে সে ইদ্দত চলাকালে স্বামীর কাছ থেকেই ভরণপোষণ আদায় করবে। যদি সে গর্ভবতী হয়ে থাকে এবং তালাক প্রদত্ত হয়, তবে শুধু গর্ভকালের নয় বরং শিশুর দুধ খাওয়ার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত শিশু ও তার মায়ের যাবতীয় ব্যয়ভার শিশুর পিতার দায়ভুক্ত হবে। এই শিশুর দুধ ছাড়ার পরও মা ইচ্ছা করলে তাকে নিজের কাছে রাখতে পারে- ছেলে হলে ৭ বছর এবং মেয়ে হলে ৯ বছর পর্যন্ত। কারো মতে কন্যাকে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত মা নিজের কাছে রাখতে পারে। আর এই শিশুর যাবতীয় ব্যয় তার পিতাই বহন করবে। স্ত্রী কেবল তখনই নিজের সন্তান পালনের এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, যখন সে এমন কোনো পুরুষকে বিয়ে করবে, যে ঐ সন্তানের জন্য অপরিচিত ও গায়রে মাহ্‌রাম হবে এবং সাবেক স্বামী তার সন্তানকে ফেরত চাইবে। এরপরও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে সাবেক স্বামীর সম্পদ ও জীবিকায় আরো অংশীদার করা কোন্ নীতি অনুসারে বৈধ হতে পারে, তা দুর্বোধ্য।

কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'ধরে নেয়া যাক, স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে গেছে এবং তার কোনো সন্তানও নেই। এই বার্ধক্যে তাকে তালাক দিলে তাকে কে দেখবে?' এর একটা জবাব এই যে, স্ত্রী যদি সন্তানহীনা হয়, তবে (যদিও আপনারা নারী ও পুরুষকে বন্ধ্যা করার চেষ্টা আগে থেকেই করে যাচ্ছেন) এমন স্ত্রীর বার্ধক্যকাল পর্যন্ত একই স্বামীর ঘর করতে থাকা খুবই দুষ্কর। তার প্রথম বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করা মোটেই বিচিত্র নয়। আর যদি স্বামী স্ত্রী ধৈর্যধারণ করে যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত এক সাথেই কাটিয়ে দেন, তাহলে যে স্বামী আপন সন্তানহীনা স্ত্রীকে যৌবনে তালাক দিলনা, সে তাকে বার্ধক্যে তালাক দেবে- এটা খুবই বিরল ও অস্বাভাবিক ব্যাপার। তথাপি আমরা মেনে নিচ্ছি যে, আমাদের দেশের এহেন বিকারগ্রস্ত সমাজে এমন ব্যাপার ঘটা হয়তো সম্ভব। আর সে ক্ষেত্রে এমন অসহায় মহিলাদের বাঁচার অবলম্বন কি হবে, সে প্রশ্নও

ওঠে। তবে এ প্রশ্ন শুধু সন্তানহীনা বৃদ্ধা তালাক প্রাপ্তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ প্রশ্ন সমাজের সকল অসহায়, সর্বহারা, বেকার, পংগু ও দুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য- চাই তারা শিশু, যুবক, বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা মেয়ে- যাই হোকনা কেন। ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় যে, এ ধরনের লোকদের যদি স্বচ্ছল কোনো আত্মীয়স্বজন থেকে থাকে, তাহলে "আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার" নীতি অনুসারে এই আত্মীয়দের জীবিকার ভার গ্রহণ করা তাদের কর্তব্য। যদি তারা এ কর্তব্য পালন না করে তাহলে সংশ্লিষ্ট পাড়া বা অঞ্চলের লোকেরা সাধ্যমত তাদের সাহায্য করবে। আর তাও যদি সম্ভব না হয় তবে ইসলামী রাষ্ট্রের এটা অপরিহার্য কর্তব্য, যেন এ ধরনের সফল অক্ষম নাগরিকদেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সাহায্য করে। কেননা কোনো যুক্তিসংগত কারণে আপন জীবিকা উপার্জনে অক্ষম- এমন প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সাহায্য পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু একজন তালাকপ্রাপ্তা ও তার সাবেক স্বামীর কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর তারা পরস্পরের জন্য সম্পূর্ণ বেগানা ও গায়রে মাহরাম। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাদের পরস্পরের আর্থিক দায়দায়িত্ব ও অধিকার কোনোভাবেই নতুন করে সৃষ্টি হতে পারেনা। ভরণপোষণের দায়িত্বের প্রশ্নে শরীয়তের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট বিধি রয়েছে। যেমন পিতামাতার দায়িত্ব। বিশেষতঃ তারা যদি অক্ষম ও পরনির্ভরশীল হন তাহলে সাবালক পুরুষ সন্তানদের ওপর তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। সন্তান যতদিন নাবালক ও অবিবাহিত থাকে, তার জীবন ধারণের যাবতীয় ব্যয়ভার পিতার ওপর অর্পিত। সাবালকত্ব প্রাপ্তি ও বিয়ের পর যদিও সন্তানের সাথে পিতৃত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয়না, কিন্তু পিতার ওপর সন্তানের ভরণপোষণের আইনগত অধিকার শেষ হয়ে যায়। তালাকপ্রাপ্তা যদি সাবেক স্বামীর কাছ থেকে খোরপোশ বা সম্পত্তি লাভের হকদার হতো, তাহলে দরিদ্র সাবালক সন্তান ও ভাইবোন খোরপোশ ও সম্পত্তির আরো বেশী হকদার হতো।

কমিটি যদি মনে করে যে, তালাক প্রাপ্তার জন্য এই নতুন আর্থিক সুবিধা আবিষ্কার দ্বারা তালাকের সংখ্যা কমে যাবে, তবে এ ধারণাও একেবারেই ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। আগেই বলেছি, পাশ্চাত্য জগতে সাধারণভাবে তালাক প্রাপ্তার খোরপোশ আদায় করা হয়ে থাকে। আর তালাক যে ধরনেরই হোক, তা আদালতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও ঐ সব দেশে ভুরি ভুরি তালাক হচ্ছে। আর কমিটির সদস্যরা আমাদের চেয়েও ভালো জানেন যে, সেখানে দাম্পত্য সম্পর্ক নিছক মাকড়সার জালে পরিণত হয়েছে।

লাহোর থেকে প্রকাশিত দৈনিক "সিন"-এর ২৯শে আগস্ট সংখ্যা এই মুহূর্তে আমার সামনে রয়েছে। এর ৯ম পৃষ্ঠায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত তালাকের সংখ্যা শতকরা ৮৬ ভাগ বেড়েছে। এই সংস্থার হিসাব অনুসারে এ বছরের শেষ নাগাদ আদালতের মাধ্যমে পঞ্চাশ হাজার তালাক সংঘটিত হবে। এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, বিয়ের সংখ্যা

বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পাচ্ছে। তথাপি তালাকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। অনেক দম্পতি বিয়েকে একটা প্রাচীন প্রথা মনে করে। তারা যখন খুশী স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়। আবার যখন খুশী আলাদা হয়ে যায়। বিয়ে তালাকের ঝামেলায় পড়েইনা। এটা সবার জানা যে, অস্ট্রেলিয়া এতটা 'প্রগতিশীল' নয় যতটা আমেরিকা, ফ্রান্স বা রাশিয়া। কাজেই ঐ সব দেশের অবস্থা অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ভালো তো নয়ই, বরং খারাপই হবে। আমেরিকার Awake নামক পত্রিকার ৮ই জুন, ১৯৭৬ সংখ্যায় বলা হয়েছে যে, গত বছর মোট বিয়ে হয়েছে বিশ লাখ দশ হাজার যা কিনা পূর্ববর্তী বছরগুলোর দ্বিগুণ। এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, প্রতি দুটো বিয়ের মধ্যে একটা খতম হয়েছে তালাকের মাধ্যমে। প্রবন্ধকার নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এ পরিস্থিতি পারিবারিক জীবনে সর্বব্যাপী ধ্বস নামার (general Break down of family life) সুস্পষ্ট প্রমাণ। এ থেকে প্রত্যেক পাকিস্তানী মুসলমান অনায়াসে বুঝে নিতে পারবে যে, "নারী অধিকারের" নামে এই কমিটি আমাদের মহিলাদের ঘাড়ে যে জিনিস চড়াতে চায় তার পরিণাম কি দাঁড়াবে।

"ঘাড়ে চড়াতে চায়" শব্দটা আমরা খুব বুঝে সুজে দায়িত্ব নিয়ে প্রয়োগ করছি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ থেকে সাড়ে ৯৯ ভাগ মহিলা শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত কিংবা কুরআন হাদীস থেকে মুসলিম ফকীহগণের গৃহীত অধিকার ছাড়া আর কিছু চায়না। যে কমিটি আলোচ্য রিপোর্টটি তৈরী করেছে তার সদস্যরা কখনো পাকিস্তানী নারীদের প্রতিনিধি নয়। এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা সরকারী কর্মচারী, কতক পুরুষ সাংসদদের ভোটে নির্বাচিত, আর কতক ইংরেজী সাংবাদিক অথবা ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষিকা। পাকিস্তানের কোনো মুসলিম নারী যদি বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার বা সন্তান পালন সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবে তারা তার সমাধানের জন্য এই কমিটির কোনো সদস্যের কাছে কখনোই যাবেনা। এমন অযোগ্য ও অপ্রতিনিধিত্বশীল কমিটিকে মুসলিম নারীদের দাম্পত্য সমস্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করার এবং তারা যে পথে যেতে প্রস্তুত নয় সে পথে টেনে নিয়ে যাবার অধিকার কিভাবে দেয়া যেতে পারে? এ ধরনের একটা ব্যর্থ ও অযৌক্তিক চেষ্টা আইয়ুব খানও করেছিলেন। ১৯৬১ সালে আইয়ুব খানের জারী করা পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্সে যা কিছু করতে বাকী ছিল। বর্তমান সরকারের নিযুক্ত এই কমিটি তা সম্পন্ন করতে চাইছে।

মুসলিম ফকীহগণ তালাকের বিধান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রাসংগিকভাবে এ কথাও লিখেছেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে এবং বলে যে, তুমি যখন ইচ্ছা আমার পক্ষ থেকে নিজের ওপর তালাক প্রয়োগ করতে পার আর স্ত্রী যদি এই অর্পিত ক্ষমতা গ্রহণ করে তাহলে সে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। মনে হয়, আইয়ুব খানের সামরিক আইনের অধীন যারা পারিবারিক আইন রচনা করেছিল, তারা অর্পিত তালাকের (তালাকে তাফওয়ীয) এই তত্ত্বটা কোথাও থেকে হস্তগত করে ফেলেছিল। তাই তারা বিয়ে রেজিস্ট্রীর যে ফরম তৈরী করে, তাতে যথারীতি এ প্রশ্নটি

উদ্ধৃত করে যে, স্ত্রীকে বিয়ের সময় তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে কিনা। মূলতঃ এর মাধ্যমে প্রত্যেক নারীকে এ কথা শিখানো হচ্ছিল যে, তোমরা বিয়ের সময় এই অধিকারের দাবী জানাও এবং তা আদায় করার পর যখন ইচ্ছা নির্দিধায় প্রয়োগ কর। আল্লাহর শোকর যে, আমাদের মুসলিম সমাজ এখনো বিকৃতির চরম সীমায় পৌঁছেনি। এ আইন যথারীতি চালু থাকলেও বিয়ের ফরম পুরণ করার সময় সচরাচর তালাকের এই ঘর শূন্য রাখা হয়। কেননা কোনো কনে বা তার অভিভাবক তালাকের ক্ষমতা স্বামীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্ত্রীর হাতে অর্পণ করার এই বিদয়াত পছন্দ করেনা। পাকিস্তানী নারী সমাজ কর্তৃক অর্পিত তালাকের ক্ষমতা না চাওয়া থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মেহেরবানীতে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি তাদের ভক্তি এখনো অটল রয়েছে। শরীয়ত তাদের পারিবারিক জীবনে অধিকার ও কর্তব্যের যে সীমা ও ধারাক্রম নির্ধারণ করেছে, সেটা তারা লংঘন করতে চায়না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, "নারী স্বাধীনতা"র প্রবক্তারা এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। তারা অব্যাহতভাবে এই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে যাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শ্রেণীসংঘাত ও বিদ্বেষের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন দ্বারা আইয়ুব খান স্বামীর তালাককে বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল করে দিতে চেয়েছিল। অধিকন্তু এই পারিবারিক আইনের ৮ম ধারায় শুধুমাত্র এতটুকু সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, যে স্ত্রীকে স্বামী তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করে দেয়, সে স্ত্রী এই অর্ডিন্যান্সের ৭ম ধারা অনুসারে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। কিন্তু এখন যে প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে, তাতে কোনো স্ত্রীকে তার স্বামী তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করুক বা না করুক, বিনা শর্তে ও বিনা বাধায় তথাকথিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে। স্ত্রী যখন আদালতের নামে বিয়ে বাতিল করার নোটিশ পাঠাবে, তখন বিয়ে বাতিল হয়ে গেছে বলে রায় দিতে আদালত বাধ্য। স্ত্রী যে সময় এই নোটিশ লিখেছে ও পাঠিয়েছে, আদালতকে ঠিক সেই সময় থেকেই বিয়ে বাতিল হয়ে গেছে বলে রায় দিতে হবে। এ জিনিসটার নাম নারীর অধিকার সংরক্ষণ করা নয় বরং আইনের মাধ্যমে নারীকে উচ্ছৃংখলতা ও বখাটেপনার পথে ঠেলে দেয়া। আইয়ুব খান সাহেব স্বীয় সামরিক শাসনামলে মুসলমানদের পারিবারিক আইনকে বিকৃত করার যে চেষ্টা চালান, তাতে যেটুকু বাকী ছিল, আমাদের বর্তমান "গণতান্ত্রিক সরকার" এবং তার নিযুক্ত কমিটি সেটুকু পূর্ণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ চেষ্টার ফল ব্যাপক সামাজিক অরাজকতা ও উচ্ছৃংখলতা ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা।

রিপোর্টের ৫০ থেকে ৫৫ ধারায় যেসব সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে, সেসবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই যে, কমিটি যেমন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অনৈসলামিক ভিত্তিতে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে খোরপোশ, যৌতুক ও উত্তরাধিকারে অংশীদার করতে স্বামীকে বাধ্য করতে চায়, তেমনি এই অপরাধী মানুষটিকে একের পর এক আইনের রশীতে এমনভাবে কষে বাঁধতে চায়, যাতে সে সারা জীবনেও আর সে বাঁধা থেকে মুক্ত না হতে

পারে। এ জন্য সুপারিশ করা হয়েছে যে, পারিবারিক আদালতগুলোকে এত ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হোক, যাতে তালাকপ্রাপ্তা যখন নিজের সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে যৌতুক ও খোরপোশ ইত্যাদি দেয়ার জন্য মামলা ঠুকবে। তখন আদালত রায় দেয়ার আগে এই মর্মে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশ জারি করবে যে, সে নিজের ভূসম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনো পন্থায় অন্যের নামে হস্তান্তর করতে পারবেনা। আদালত ইচ্ছা করলে অন্তর্বর্তীকালীন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্বামীর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার নির্দেশও জারি করতে পারবে। স্বামীকে এই মর্মেও আদেশ দেয়া যাবে যে, স্ত্রী খোরপোশ প্রাপ্য কি না, তার ফায়সালা হবার আগেই প্রতি মাসে সে আদালতের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রায় প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত জমা দিতে থাকুক। আদালতে রায়ের পর এ অর্থ খোরপোশ হিসেবে স্ত্রীকে দেয়া হবে। স্বামী যদি এই জরিমানা দিতে অক্ষম হয়, তাহলে মামলায় তার আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার রহিত করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে একতরফা ব্যবস্থা নেয়া হবে। পুরুষের ওপর এমন উদ্ভট ধরনের আইনগত অত্যাচার ও ধাপ্পাবাজীর বৈধতা সৃষ্টির জন্য ৫৫ ধারায় ১৯৫৯ সালের একটি আইনের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, যা পাকিস্তানের শরহগুলোতে ভাড়ায় বসবাসকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য চালু রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, নারী অধিকারের প্রবক্তাদের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটের সম্পর্কের মত। সুবহানাল্লাহ! কি চমৎকার উদাহরণ খুঁজে বের করা হয়েছে। উক্ত আইনে যখন বাড়ীওয়ালার সাথে ভাড়াটের বিবাদ হয় এবং ভাড়াটে ভাড়া দিতে কিংবা বাড়ীওয়ালা ভাড়া নিতে চায়না, অধিকন্তু বাড়ীওয়ালা ভাড়াটেকে উৎখাত করতে চায় বা ভাড়া বাড়াতে চায়, তখন এক পক্ষ বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে দাবী পেশ করে। এরপর আদালত ভাড়াটেকে রায় প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ভাড়া হিসেবে আদালতে জমা দিতে বাধ্য করতে পারে। এখন বিয়ে তালাকের ব্যাপারটাকে বাড়ী ভাড়ার পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ন্ত্রণের জন্য একই ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হচ্ছে।

আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, সুপারিশের এই অংশ চরম যুল্‌ম ও বেইনসাফীর নামান্তর। একে তো তালাকের পর তালাকপ্রাপ্তার জন্য এমন অধিকার আবিষ্কার করা হচ্ছে, যা শরীয়ত ও নৈতিকতা-কোনোটার দৃষ্টিতেই বৈধ নয়। তদুপরি এই তথাকথিত অধিকারগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য যে কর্মপন্থা নির্দেশ করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত অধিকারমূলক ও প্রতিশোধমূলক। তালাকের ক্ষেত্রে সবসময় পুরুষেরই দোষ থাকেনা, স্ত্রীরও থাকে। কিন্তু যদি ধরেও নিই যে, পুরুষই দোষী, তাহলেও দোষ ও তার শাস্তির মধ্যে একটা অনুপাত তো থাকা চাই। তালাক দেয়া এত বড় অপরাধ তো নয় যে, তা প্রমাণিত হওয়ার আগেই পুরুষকে তার সম্পত্তিতে যে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখতে হবে, তার সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ জারি করা হবে অথবা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাকে একটা নির্দিষ্ট হারে 'বিয়ের ভাড়া' আদালতে জমা দিতে বাধ্য করা হবে, আর এই ভাড়া সংশ্লিষ্ট 'বাড়ীওয়ালী'কে দেয়া হবে। কিন্তু ভাড়াটে

যখন বাড়ী থেকে বেদখল হয়, তখন তার পর দুই পক্ষের এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে কোনো আর্থিক সুবিধা লাভের অধিকারী হতে পারেনা, যা আদায় করার জন্য এক পক্ষের বিরুদ্ধে মাল ক্রোকের আদেশ বা সম্পত্তি হস্তান্তরের নিষেধাজ্ঞা জারি করা যেতে পারে। তাহলে প্রশ্ন জগে যে, একমাত্র তালাকই কি এত বড় মারাত্মক অপরাধ হয়ে গেল যে তাতে এত সব শাস্তি প্রযোজ্য হবে? ইসলামের প্রাথমিক যুগে কি কোনো তালাকদাতার জন্য এ ধরনের দেওয়ানী বা ফৌজদারী শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল? রসূল (সাঃ)-এর বাড়ীতে লালিত পালিত সাহাবী হযরত যায়েদ রসূল (সাঃ)-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া হযরত যয়নবকে (রাঃ) তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ রসূল (সাঃ) বলেছিলেন যে, নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করোনা এবং আল্লাহকে ভয় কর। সেক্ষেত্রে কি আল্লাহ ও তার রসূল আদেশ দিয়েছিলেন যে, যয়নবকে আপন সম্পত্তির ১/৬ দিয়ে দাও অথবা বিয়ের যত বছর হয়েছে তত মাসের খোরপোশ দাও? হযরত যয়নবও কি রসূল (সাঃ)-এর আদালতে নিজের প্রাপ্য যৌতুক বা খোরপোশ আদায়ের জন্য বা হযরত যায়েদের সম্পত্তি ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত করার জন্য কোনো দাবী পেশ করেছিলেন? কোনো মুসলিম নারী কি মহিলা সাহাবীদের চেয়েও বেশী দাম্পত্য অধিকার লাভের যোগ্য হতে পারে, যা চিহ্নিত করা ও আদায় করার জন্য আজ দাবী করা হচ্ছে?

এরপর রিপোর্টের ৬২ নং ধারাটি পর্যালোচনা করা যাক। এতে পারিবারিক আদালতের শরণাপন্ন হবার পর বিবদমান পক্ষদ্বয়ের জন্য আদালতের বাইরে বিবাদ মেটাবার একটা উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ করা অনুবাদের মূলানুগ কপি নিম্নে দেয়া যাচ্ছে, যদিও এমন অশালীন ভাষায় লেখা কোনো বক্তব্য উদ্ধৃত করা বা পড়া যে কোনো রুচিবান মানুষের পক্ষে দুরূহঃ

> "কমিটি মনে করে যে, দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির সম্ভাবনা আদালতের ভেতরে যতটুকু তার চেয়ে আদালতের বাইরে বেশী, যদি সংশ্লিষ্ট এলাকার কতিপয় ঈমানদার সৎ ও নিরপেক্ষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে চেষ্টা চালানো হয়। প্রত্যেক জেলার জেলা জজের পক্ষে এ ধরনের লোকদের একটা তালিকা তৈরী করা কঠিন নয়। এইসব ব্যক্তিকে "কল্যাণ কর্মকর্তা" নামে অভিহিত করা যেতে পারে এবং পারিবারিক আদালতের নির্দেশক্রমে তাদেরকে আপোষরফাকারী হিসাবে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করা উচিত। এ ব্যাপারে কমিটির সুপারিশ এই যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আদালতের বাইরে আপোষ রফা করানোর জন্য পারিবারিক আদালত আইনে প্রয়োজনীয় ধারা সংযোজন করা উচিত। উভয়পক্ষের যৌথ আবেদন পাওয়ার পর পারিবারিক আদালত জেলা জজ প্রণীত কল্যাণ কর্মকর্তাকে তালিকা থেকে যে কোনো একজনকে আপোষকারী হিসাবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করবে। এভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এক মাসের মধ্যে নিজের আপোষ প্রচেষ্টার সফলতা বা ব্যর্থতা সম্পর্কে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেয়া হবে।"

রিপোর্টের এই ধারায় আদালতের বাইরে স্বামী স্ত্রীর যে সমঝোতার উল্লেখ করা হয়েছে, নীতিগতভাবে আমরা তার সাথে একমত। স্বয়ং কুরআন শরীফে সূরা নিসার ৩৫নং আয়াতেও দাম্পত্য বিবাদ মীমাংসার জন্য দুইজন সালিস নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য রিপোর্টে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা পবিত্র কুরআনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা থেকে একেবারেই ভিন্ন। পবিত্র কুরআনের আদেশ হলো, যেখানে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অবনিবনা দেখা দেবে, সেখানে বিয়ে বিচ্ছেদের পর্যায়ে কিংবা মামলা আদালতে গড়ানোর আগে ঘরোয়াভাবেই বিবাদ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা উচিত। এটা করতে হবে এভাবে যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে এক এক ব্যক্তি নিযুক্ত হবেন এবং তারা বিবাদের কারণ অনুসন্ধান করবেন। তার চিন্তাভাবনা করে মীমাংসার উপায় খুঁজে বের করবেন। স্বামী স্ত্রী ইচ্ছা করলে নিজেরাই নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকে এক একজনকে নিজেদের বিরোধ মীমাংসার জন্য নিযুক্ত করতে পারে। তা না হলে উভয় পরিচয়ের মুরব্বীরা হস্তক্ষেপ করে সালিস নিযুক্ত করবেন। আর যদি মামলা আদালতেই গড়ায়, তাহলে আদালত নিজে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের আগে পারিবারিক সালিশ নিযুক্ত করে মীমাংসার চেষ্টা করবে।

পক্ষান্তরে রিপোর্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা হলো, প্রত্যেক জেলা জজ নিজ এলাকার কতিপয় গণ্যমান্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির একটা আলাদা তালিকা প্রণয়ন করবে এবং পারিবারিক আদালত যখনই মীমাংসা করতে চাইবে, দম্পতিকে উক্ত তালিকা থেকে যে কোনো একজনকে সালিসীর জন্য মনোনীত করার আদেশ দেবে। এই তালিকা থেকেই সালিস নিয়োগ করতে হবে এই বাধ্যবাধকতা কুরআনের নির্দেশের পরিপন্থী। কুরআন যে মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এ আদেশ দিয়েছে, উক্ত বাধ্যবাধকতা দ্বারা তা নস্যাৎ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা চান যে, স্বামী স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার ও দাম্পত্য বিবাদ শুধুমাত্র এমন দুই ব্যক্তির সামনেই প্রকাশ করা উচিত, যাদের প্রত্যেকেই স্বামী বা স্ত্রীর সাথে আত্মীয়তা ও সহানুভূতির সম্পর্ক রাখেন এবং তার কাছ থেকে যুক্তিসংগতভাবে এ আশা করা যেতে পারে যে, তিনি স্পর্শকাতর বিতর্কিত বিষয়গুলোর নিষ্পত্তি করতে পারবেন, আর তা যদি নাও পারেন, তথাপি অন্ততপক্ষে সংশ্লিষ্ট উভয়পক্ষ নিজ নিজ বক্তব্য স্বাধীনভাবে ও অসংকোচে তার কাছে খুলে বলতে পারবে। এরূপ ব্যবস্থাধীনে বিবাদের মীমাংসা হোক বা না হোক, ঘরোয়া গোপন বিষয় বাইরে ফাঁস হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। নচেৎ জেলা জজ জেলা ভিত্তিক যে স্থায়ী তালিকা তৈরী করে দেবে, তাতে বিবদমান স্বামী স্ত্রী উভয়ের পরিবারের কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত থাকবেই-এমন কোনো কথা নেই। হতে পারে যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্য থেকে কোনো একজন অথবা উভয়ের পরিবারের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোনো ব্যক্তি ঐ তালিকায় একেবারেই নেই? অথবা থাকলেও কোনো পক্ষের তাকে সালিস নিয়োগে আপত্তি বা দ্বিমত আছে। এও অসম্ভব নয় যে, যে জেলায় এই বিবাদ বিচারাধীন স্বামী বা স্ত্রীর পরিবারের কোন ব্যক্তি সেই এলাকায় বাসই করেনা, বরং তাদের আত্মীয় স্বজন

ও পরিবার-পরিজন অন্য জেলায় বসবাস করে। মোট কথা, এমন বহু অবস্থা দেখা দিতে পারে, যাতে কমিটির প্রস্তাবিত কর্মপদ্ধতি এবং কল্যাণ কর্মকর্তাদের স্বামী ও আগাম তৈরী করা তালিকা দ্বারা কুরআনী নির্দেশ স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস পাঠাও" এর উদ্দেশ্য সফল হবেনা। বরঞ্চ তা ছাড়া আরো সমস্যা ও জটিলতা বাড়বে। আদালতের সামনে বলা যায়না এমন কোনো বিষয় স্বামী স্ত্রী এই কল্যাণ কর্মকর্তাদের সামনে নিঃসন্দেহে ও নির্ভয়ে খুলে বলতে পারবে না। এ ধরনের কল্যাণ কর্মকর্তারা হয়তো সরকার বা আদালতের অন্য কোনো উপকার সাধন করতে পারেন। কিন্তু বিবদমান দম্পতির কোনো একজনের সাথে তাদের কোনো পারিবারিক আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে কিনা তা না দেখে তাদেরকে সকল দাম্পত্য বিরোধে নাক গলানোর স্থায়ী অধিকার দিয়ে দেয়া ইসলামী মূলনীতি ও কুরআনের নির্দেশের বিপরীত। এতে সমস্যার সমাধান হওয়ার পরিবর্তে তা আরো গভীর হয়ে যেতে পারে। সালিসীর প্রস্তাবকে আইনগতরূপ দেয়া যদি জরুরী মনে হয়, তাহলে সে জন্য প্রত্যেক বিরোধে বা মামলায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে সালিস নিয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য এবং এ জন্য যেসব শর্ত ও বিধি ব্যবস্থা কুরআন, হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে সে অনুসারে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

নিবন্ধটি এ পর্যন্ত লেখার পর মাসিক তুলুয়ে ইসলাম পত্রিকার ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি চোখে পড়লো। ঐ পত্রিকাটিতে উল্লিখিত নারী অধিকার কমিটির সুপারিশগুলোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। ৫৯ পৃষ্ঠায় জনৈক প্রবন্ধকার লিখেছেনঃ

> "বিয়ের চুক্তি বাতিল করার অধিকার স্বামীর যেমন আছে, স্ত্রীর তেমনি আছে। নিজের বিয়ে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার যেমন পুরুষের আছে এবং তাতে আদালতের হস্তক্ষেপের কোনো প্রয়োজন নেই, তেমনি নারীর বিয়ের চুক্তি বাতিল করার সিদ্ধান্ত এককভাবে নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে আদালতের হস্তক্ষেপের কোনোই দরকার নেই।"

এরপর ৬১ পৃষ্ঠায় তুলুয়ে ইসলাম পত্রিকার প্রবন্ধকার বলেনঃ

> "এই প্রস্তাবগুলোতে দেশের প্রচলিত আইনগত ব্যবস্থায় বিরাজমান অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং নারীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারেও সন্তোষজনক সুপারিশ রয়েছে। তবে বিয়ে ও তালাকের ব্যাপারে উপরে যে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ স্ত্রীর জন্য তালাকের সমান অধিকার ওটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ। এ জন্য আমরা কমিটির কর্মকর্তাদেরকে মুবারকবাদের যোগ্য মনে করি। মনে হয় এতে একাধিক বিয়ের ব্যাপারে কোনো প্রস্তাব পেশ করলে মন্দ হতোনা। এ ধরনের অন্যান্য সুপারিশ রিপোর্টের পরবর্তী অংশে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায়।"

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও মুবারকবাদের পর এ কথা অনুমান করা মোটেই কষ্টকর নয় যে, এই রিপোর্ট কাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে এবং এতে কাদের

খুশী হওয়ার কথাঃ

এবার আমরা ৬৫ নং এবং তার পরবর্তী ধারাগুলো পর্যালোচনা করবো। ৬৫, ৬৬ ও ৬৭ নং ধারা অনুসারে কমিটির সদস্যগণ আরো একটা নিষ্ঠুরতার উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছেন, যা তাদের মতে স্বামী স্ত্রীর ওপর প্রয়োগ করে থাকে। সেই নিষ্ঠুরতা এই যে স্বামী নিজের স্ত্রীকে তার পিতামাতা ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করতে না দিয়ে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ বানিয়ে দেয়। কমিটি এই যুলুমের প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছে তা হলো, এই অপরাধ করার জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। উপরন্তু এমন নিষ্ঠুর ও পাষন্ড স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে আদালত থেকে বিয়ে বাতিল করার ক্ষমতা অর্জনেরও অধিকার দেয়া হোক। ৬৭নং ধারায় কমিটি এই মর্মে সুপারিশ করেছে ঃ

> "যখন স্বামী কিংবা তার আত্মীয়রা সকলে স্ত্রীকে তার পিতামাতা, সন্তান, ভাই কিংবা বোনদের সাথে দেখা করতে বাধা দেয়, তখন এ কাজটিকে তিন মাসের জেল অথবা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার শাস্তির যোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হোক। উপরোক্ত অপরাধের জন্য স্বামী যদি শাস্তি পায় তাহলে স্ত্রী এটিকে বিয়ে বাতিল করার যুক্তি হিসাবে পেশ করতে পারবে।"

নীতিগতভাবে আমরা এ কথা স্বীকার করি এবং এর সাথে আমরা একমত যে, স্ত্রীকে যুক্তিসংগত সীমার মধ্যে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাত করতে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। সামাজিক সদাচার ও আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নীতি ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, এটি তারই অংগীভূত একটি দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্ব বাস্তবায়িত করা বা না করার জন্য কোনো আইনগত ও ফৌজদারী বিধি ব্যবস্থার প্রণয়নের ক্ষেত্রে আরো প্রচুর চিন্তা-ভাবনা করা জরুরী। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক এবং তাদের দাম্পত্য অধিকার ও দায়-দায়িত্ব এমন ধরনের নয় যে, তা চিহ্নিত করা ও তার নিষ্পত্তি করার জন্য তাদের উভয়ের কাছে সর্বক্ষণ আইনগত বিধি ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটা পুস্তিকা থাকতে হবে। আর যখনই কোনো জটিল বা বিতর্কিত ঘরোয়া সমস্যা সামনে এলো, অমনি দুজনে পুস্তিকার পাতা উল্টানো শুরু করে দিল এবং নিজের যে অধিকারটা আইন অনুযায়ী আদায়যোগ্য মনে হলো তা আদায়ের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হলো। এবার এই স্ত্রী ও তার আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারটা ভেবে দেখুন এর বেশ কয়েকটা অবস্থা দেখা দেয়া সম্ভব। স্ত্রী বলতে পারে যে, আমি প্রতি দিন বা প্রতি দুদিন বা তিন দিন পর পর নিজের মা বাবা বা ভাইবোনের সাথে দেখা করতে চাই, কিংবা আমার এসব আত্মীয়কে অনুরূপ ঘন ঘন আমার কাছে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করতে দিতে হবে। স্ত্রী এরূপ আব্দারও করতে পারে যে, আমি আমার আপন জনদের সাথে সাক্ষাত করতে গেলে স্বামীকে আমার সাথে যেতে হবে। অথবা আমাকে একা যেতে দিতে হবে। এমনও হতে পারে যে, স্ত্রীর আত্মীয়রা অন্য কোনো শহরে বা ভিন্ন দেশে বসবাস করে এবং সে দাবী জানাতে পারে যে, আমাকে

গাড়ীতে বা জাহাজে উঠিয়ে দাও, আমি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে যাবো। এখন কমিটির সদস্যরা নিজেরাই ভাবুন যে, এসব পরিস্থিতিতে বা এর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি স্বামী বেচারা অন্যান্যোপায় হয়ে কিছুটা ইতস্তত করে, তাহলে সে কি এতই অপরাধী হয়ে যাবে যে, তাকে তিন মাসের জেল, জরিমানা বা উভয় শাস্তি ভুগতে হবে। অতঃপর দন্ড প্রাপ্ত হবার কারণে বিয়ে বাতিলের মামলা এবং স্ত্রীর বিদায় মাথা পেতে নিতেও প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে।

আমার এ সব যুক্তিতর্কের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে স্ত্রী ও তার আত্মীয় স্বজনদের সাক্ষাতের অধিকারটা সম্পূর্ণরূপে স্বামীর দয়ার ওপর নির্ভরশীল এবং তিনি যেমন খুশী, তার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম ও সাধারণ বিবেক বুদ্ধির আলোকে এটাও গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা যে, স্ত্রী যখন খুশী স্বামীকে জানিয়ে বা না জানিয়ে বাড়ী থেকে সফরে বেরুবে চাই তার উদ্দেশ্য আপন জনদের সাথে মিলিত হওয়াই হোকনা কেন। অনৈসলামিক সমাজে চাল-চলনের যে ঐতিহ্য ও মানদন্ড চালু থাকে, তাত নারী বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত যাই হোকনা কেন, একাকিনী বা বেগানা পুরুষদের সাথে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। এতে আদৌ দুষণীয় মনে করা হয়না। কিন্তু ইসলাম নারীকে এভাবে ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয় না। ইসলামের শিক্ষা হলো, নারী তিনদিন তিনরাতের সফরে স্বামী বা মাহরাম পুরুষের সাথে ছাড়া যেতে পারবেনা এমনকি হজের সফরে হলেও নয়।[১] এ দ্বারা ফকীহগণ তিন দিনের পথ বুঝিয়েছেন। এখন ধরুন, স্বামী স্ত্রী লাহোরে এবং তার আত্মীয় স্বজন পেশাওয়ার বা করাচীতে থাকে, তাহলে আপন জনের সাথে মিলিত হবার অধিকার ভোগ করতে হলে স্ত্রীর এই সফরে স্বামী বা কোনো মাহরাম পুরুষের সাথে থাকতে হবে। নচেৎ স্বামী স্ত্রী উভয়ের গুনাহ হবে। অনুরুপভাবে যদি স্ত্রীর কোনো আত্মীয় স্বজনের নৈতিক অবস্থা ও পারিবারিক পরিবেশ এত নোংরা ও চরিত্রবিনাশী হয় যে, স্ত্রী ও সন্তানদের সেখানে যাওয়া ও থাকা তাদের আদত অভ্যাস বিগড়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। তাহলে স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিকে সেখানে যেতে না দেয়ার অধিকার স্বামীর রয়েছে। বড়জোর এতটুকু বলা যায় যে, স্বামী তার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে বিয়েশাদী ও বিপদজনিত ঘটনাবলীর সময় যেতে বাধা দেবেনা। রোগ ব্যাধি বা দুঃখ-দুর্দশার সময় খোঁজ খবর নিতে ও দেখতে যেতে দেয়া উচিত। আর শ্বশুরালয়ের লোকেরা এলে তাদের আগমন ও দেখা সাক্ষাতে বাধা দেয়া অনুচিত। এটা হচ্ছে আত্মীয়তার শরীয়ত সম্মত দিক। এ ছাড়া এর কিছু বাস্তব দিকও আছে, যার দিকে লক্ষ্য করা বাঞ্ছনীয়। যেমন একটি দিক এই যে, স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা বহু দূরে থাকলে স্বামীর পক্ষে এটা

---

১ বুখারী শরীফ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূল (সা) বলেছেনঃ যে নারী আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তার জন্য তিন দিনের সফর মাহরাম পুরুষ ছাড়া যাওয়া উচিত নয়। বুখারীর অপর এক হাদীসে তিন দিনের পরিবর্তে এক দিনের উল্লেখ আছে।

সম্ভব নয় যে, যখন তখন নিছক সাক্ষাতের জন্যও সব কাজ ফেলে স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে যাবে এবং নিয়েও আসবে। আসা যাওয়ার পথ খরচ বহন করবে, নচেৎ জেলে যাবে। এ জন্য নারী অধিকার কমিটির বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের কাছে আমাদের আবেদন যে, আপন আত্মীয়স্বজনদের সাথে স্ত্রীর দেখা সাক্ষাতের অধিকার তো মেনে নেয়া যায়, তবে এ জন্য শাস্তিমূলক ও ফৌজদারী রচনা না করাই বাঞ্ছনীয়। আপাততঃ ওটাকে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সৌজন্যবোধের (Good Sense) ওপর ছেড়ে দিলেই চলে। আর নিতান্ত যদি আইনগত বিধিব্যবস্থা তৈরী করাই জরুরী মনে হয়, তবে আমাদের উপরোল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখেই তা করা উচিত। এতে দুই পক্ষের কারো কোন জটিলতার শিকার হতে হবেনা। স্বামীর জন্য শাস্তি হিসাবে তিন মাসের জেল নির্ধারণ করে তাকে সীমার মধ্যে নিয়ে আসা যদি আপনারা বৈধ মনে করেন তাহলে স্ত্রীর জন্য আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাতের একটা সীমা নির্ধারিত হওয়া উচিত। ফকীহগণ সাক্ষাতে বাধা দানকে কোনো দন্ডনীয় অপরাধ বলে গন্য করেননি। তবে তারা স্ত্রীর সাক্ষাতের অধিকারকে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করার পাশাপাশি যুক্তিসঙ্গভাবে তার সীমাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন তারা বলেছেন যে, স্বামী স্ত্রীকে মাতাপিতা ও ভাইবোনের কাছে যেতে চেষ্টা এবং তার বাড়ীতে তাদের আগমনে বাধা দেবে না। তবে এই আসা যাওয়া একটা নিয়ম অনুসারে হওয়া উচিত। সবাই যদি একই এলাকার অধিবাসী হয়, তাহলে সপ্তাহে একবার এবং ভিন্ন ভিন্ন শহরের অধিবাসী হলে বছরে একবার বা দুবার সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া উচিত।

যাই হোক, নারী অধিকার কমিটি যদি সাক্ষাতের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আইন রচনার ব্যাপারে নাছোড়বান্দা হয়ে থাকে, তাহলে শরীয়ত ও যুক্তির ভিত্তিতে তার জন্য কিছু শর্ত ও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা জরুরী হবে। এরপর যদি সাক্ষাতে বাধা দানের কারণে স্বামীকে তিন মাসের শাস্তি দেয়া অপরিহার্য মনে করা হয়, তাহলে আমাদের অনুরোধ এই যে, স্বামীকে কারাগারে না পাঠিয়ে নিজের ঘরেই গৃহবন্দী করে রাখার শাস্তি দেয়া হোক, আর স্ত্রী এবং যে আত্মীয়ের সাক্ষাতে সে বাধা দিয়েছে, তাদেরকে স্বামীর ওপর কড়া পাহারা দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হোক, যাতে সে বাড়ীর বাইরে যেতে না পারে। আর যদি বেরোয়, তাহলে পলাতক কয়েদীর মত তার শাস্তির মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া উচিত। আমার মতে, এভাবে ইনসাফের দাবী ও উদ্দেশ্য আরো সুষ্ঠুভাবে পূর্ণ হবে। স্বামীর জন্য কারাদন্ডের বিকল্প বা অতিরিক্ত হিসাবে অর্থদন্ডের প্রস্তাব করা হয়েছে। আমাদের পরামর্শ হলো, ওটা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়ার পরিবর্তে স্ত্রী ও তার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। এরপর কমিটির এ কথাও ভাবা উচিত যে, স্ত্রী যদি আলাদা ঘর বানানোর দাবী জানায় বরং সেই ঘরে স্বামীর পিতামাতা ও ভাইবোন এলে যদি হৈ চৈ করে পাড়া মাতিয়ে তোলে, তাহলে সে জন্যও কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আইনত সমীচীন হবে কিনা?

৬৭নং ধারার পর রিপোর্টের ৬৮ ও ৬৯ নং ধারায় তালাকের পর অপ্রাপ্ত বয়স্ক

সন্তানদের লালন পালনের অধিকারের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। রিপোর্টের বক্তব্য হলো ঃ

"অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের লালন পালনের অধিকারের ব্যাপারে মায়ের দাবীকে নাকচ করা যাবে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে নৈতিকতা বিরোধী জীবন যাপন করছে বা সে চরিত্রহীন ও নষ্টা নারী। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যে সব মামলায় সন্তানদের লালন পালনের অধিকার নিয়ে বিতর্ক থাকে, শুধুমাত্র সেই সব মামলায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে এই সব ওজর ক্রমাগতভাবে পেশ করা হয়। চরিত্রহীনতা ও অসতীপনার অভিযোগ কদাচিৎ প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব অভিযোগ মিথ্যা সাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং নারীর সম্ভ্রমের অপুরণীয় ক্ষতি হয়ে থাকে।। এ ধরনের মামলায় আদালত সচরাচর কোনো পদক্ষেপ নেয়না, যদিও ইসলামে নারীর ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘোরতর নিন্দা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা নূরের ৪নং আয়াতের বরাত দেয়া হয়ে থাকে।"

এসব মামলায় মহিলাদের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপকে নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কমিটি এই মর্মে সুপারিশ করেছে যেঃ

"সন্তান লালন পালনের অধিকার সংক্রান্ত মামলায় যদি কোনো মহিলার চরিত্র সম্পর্কে অভিযোগ তোলা হয় এবং তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে আদালত ইচ্ছা করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে কারণ দর্শানোর সুযোগ দানের পর ছয় মাসের কারাদন্ড, শুধু জরিমানা অথবা উভয় রকমের দন্ড দিতে পারবে।"

একথা অস্বীকার করার কোনো অবকাশই নেই যে, কোনো মুসলিম নারী বা পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ রটানো কবিরা গুনাহ। কিন্তু আদালতে এ ধরনের অপবাদ আরোপের কারণ এবং এর প্রতিবিধানের জন্য কমিটি যে সুপারিশ করেছে, এই দুটো জিনিসের কোনোটির সাথেই আমরা একমত নই। মামলার দুই পক্ষ কর্তৃক পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন ঘৃন্য অপবাদ আরোপ করা বিচিত্র কিছু নয়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি আজ পর্যন্ত চালু হতে না পারার কারণেই একে অপরের বিরুদ্ধে অতি সহজে এ ধরনের অপবাদ আরোপ করে থাকে। যতদিন পর্যন্ত ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু (রজম) কিংবা একশো বেত্রাঘাত এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপের জন্য আশিটি বেত্রাঘাতের শাস্তি এ দেশে চালু না হবে, এতদিন পর্যন্ত কমিটির আকাংখা মোতাবেক এ পরিস্থিতির পুরোপুরি সংশোধন সম্ভব হবেনা। শরীয়তের দন্ডবিধি প্রবর্তনে আমাদের এই শোচনীয় ব্যর্থতা ও এই চরম দুর্ভাগ্যের যুগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তালাক দাতা ও তালাকপ্রাপ্তার ওপর এই মর্মে আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করাই আমার মতে সংগত যে, শিশু সন্তানের লালন পালনের অধিকার সংক্রান্ত মামলায় তারা যেন একে অপরের ওপর চরিত্রহীনতা ও লাম্পট্যের এমন অভিযোগ আরোপ করতে না পারে, যার সাথে অপর পক্ষেরও সতিত্ব জড়িত। অন্যথায় এ ধরনের

অভিযোগকে আদালতে শুনানীর অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত। আমাদের মতে এ অবস্থাটা চরম পরিতাপজনক ও দুঃখজনক যে, আদালতে ব্যভিচারের অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হোক কিংবা মিথ্যা প্রমাণিত হোক উভয় ক্ষেত্রে তার ওপর শরীয়তের পরিবর্তে অন্য কোনো দন্ড দেয়া হবে কিংবা কোনোই দন্ড দেয়া হবেনা। পারস্পরিক সম্মতিক্রমে ব্যাভিচার করাকে আমাদের দেশে আদৌ কোনো অপরাধই মনে করা হয়না। সম্প্রতি একটি কলেজের কতিপয় অধ্যাপক ব্যভিচারের দায়ে গ্রেফতার হবার পর তাদের কারো কারো পক্ষ থেকে এই সাফাই দেয়া হয়েছে যে, উভয়পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এ কাজ করে থাকলে আইনের দৃষ্টিতে তা অপরাধ নয়। আমরা মনে করি, শরীয়তের সাথে এমন নির্মম পরিহাস আর যেখানেই হয় হোক, অন্তত পক্ষে আদালতের ত্রিসীমানায় হওয়া উচিৎ হয়। (তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর-১৯৭৬)

নারী অধিকার কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা-(৪)

নারী অধিকার কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে আমরা ৬৯ নং ধারা পর্যন্ত পর্যালোচনা পেশ করেছি। আমাদের সর্বশেষ আবেদন ছিল এই যে, তালাক বা চিরস্থায়ী বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ছোট শিশুদের লালন পালনের অধিকার সংক্রান্ত মামলায় ব্যভিচারের যে মিথ্যা অপবাদ একপক্ষ অপরপক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে, তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রতিরোধের সর্বপ্রথম উপায় ছিল অপবাদগুলো সত্য কি মিথ্যা তা প্রমাণিত হবার পর শরীয়ত সম্মত শাস্তি আদালতের মাধ্যমে কার্যকর হওয়া। কিন্তু পাকিস্তানে সেই সৌভাগ্যের দিকটি না আসা পর্যন্ত আমাদের মতে যে সমীচীন, তা হচ্ছে এই যে, সন্তান পালন সংক্রান্ত মামলায় কোনো পক্ষকেই অপর পক্ষের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করার অনুমতি দেয়া চলবেনা। এ সম্পর্কে কমিটির আলোচনা পড়ে এরূপ ধারণা জন্মে যে, কমিটির সদস্যরা হয়তো ভাবেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদেরকে নিজের কাছে রেখে লালনপালন করার যে অধিকার মায়ের থাকে, তা রহিত করার জন্য স্ত্রীকে চরিত্রহীনা ও ব্যভিচারিণী প্রমাণ করা এবং তার সতিত্বের ওপর কলংক লেপন করা জরুরী। কমিটি এ প্রসঙ্গে "১৮৯০ সালের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু ও অভিভাবকগণ শীর্ষক আইনের বরাত দিয়েছে। আমরা ঐ আইনটি মনোযোগ সহকারে পড়ে দেখেছি। আমাদের অভিমত এই যে, ঐ আইন এমন কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনা যে, নারীকে সন্তান পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য তাকে অসতী প্রমাণ করতেই হবে। এই আইনের ৩৯ নং ধারার যেসব কারণে স্ত্রীর এই অধিকার রহিত হতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণগুলো হলো ঃ ১-স্ত্রী কর্তৃক সন্তানদের সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাদের উপযুক্ত তদারকী ও লালন পালনে উদাসিনতা প্রর্দশন করা।

২-স্ত্রীর এমন নৈতিক দোষজনিত অপরাধের জন্য দন্ড লাভ, যা আদালতের দৃষ্টিতে তাকে শিশু সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক অযোগ্য ধরে নেয়।

৩-আর এমন সব কাজে আগ্রহী ও ব্যস্ত থাকা, যার কারণে এ শিশু সন্তানদের

যথোচিতভাবে দেখা শুনা করা তার পক্ষে সম্ভব না হওয়া।

এই আইনের ৪১ নং ধারায় সন্তান পালনের অধিকার রহিত হওয়ার আরো একটা কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। সেটা হলো ঃ স্ত্রী কর্তৃক কোনো পুরুষকে পুনর্বিবাহ করা, যে অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার অভিভাবক হতে পারেনা কিংবা আদালতের মতে সে অভিভাবকত্বের জন্য বেমানান।"

আমাদের ফকীহগণ কুরআন ও হাদীসের আলোকে মায়ের সন্তান পালনের অধিকার রহিত হওয়ার যেসব কারণ বর্ণনা করেছেন তা সংক্ষেপে এই যে, মায়ের এমন কোনো পুরুষকে বিয়ে করা যে, সন্তানদের জন্য গায়রে মাহরাম হবে বা মা এমন অনৈসলামিক কার্যকলাপে লিপ্ত হবে যা সন্তানের চরিত্র ও আদত অভ্যাসের ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। অনৈসলামিক কার্যকলাপ বলতে কোনো বিশেষ ধরনের মারাত্মক চরিত্রহীনতা বা ব্যাভিচারই শুধু বুঝায়না, বরং শরীয়তের যে কোনো বিধান লংঘন বা অমান্য করাকেই অনৈসলামিক কার্যকলাপ বলা হয়। যেমন নামাজ রোযা না করা। বেপর্দা চলা ইত্যাদি। ফকীহগণ এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সন্তানরা যদি এত ছোট হয় যে, মায়ের খারাপ চালচলন ও আদত অভ্যাস দ্বারা প্রভাবিত হবার মত বুঝই তাদের জন্মেনি। তাহলে মায়ের অনৈসলামিক কার্যকলাপ তার সন্তানপালনের অধিকার রহিত করবেনা। অনুরূপভাবে পিতার চারিত্রিক অবস্থাও যদি মায়ের চেয়ে ভাল না হয়ে থাকে, যেমন সে নামাজ রোযা নিয়মিত করেনা, তাহলে মাতার ওপর পিতার কোন অগ্রাধিকার সৃষ্টি হবেনা। মা যদি সন্তানদেরকে এত দূরের কোথাও নিয়ে যায় যেখানে পিতার যখন তখন গিয়ে ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করা ও খোঁজ খবর নেয়া সম্ভব নয়, তাহলেও মায়ের সন্তান পালনের অধিকার রহিত হয়ে যাবে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সন্তান পালনের অধিকার থাকা বা না থাকার একাধিক কারণ বর্তমান আইন এবং শরীয়তের আইন উভয়টিতে রয়েছে। সেই সব কারণকে ভিত্তি করে উভয় পক্ষ নিজ নিজ অধিকারের অগ্রগণ্যতা প্রদান করতে সচেষ্ট হতে পারে। আর আদালত এই অধিকার ও কারণগুলিকে সামনে রেখে কোনো একটি পক্ষের অনুকূলে বা প্রতিকূলে রায় দিতে পারে। এ জন্য আমাদের আন্তরিক পরামর্শ এই যে, এ ধরনের মোকদ্দমায় জঘণ্য নৈতিক অভিযোগ আরোপ করা থেকে উভয় পক্ষকে বিরত করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেয়া বাঞ্ছনীয়।

রিপোর্টের ৭০ থেকে ৮৩নং ধারা পর্যন্ত খৃষ্টান ও অমুসলিমদের বিয়ে ও তালাক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধারাগুলো সম্পর্কে ঐ সব ধর্মের অনুসারীরাই ভালো বলতে পারবেন। তবে আমরা একথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, বিয়ে, তালাক, ভরণপোষণ সন্তান পালন ইত্যাদি বিষয়ে কোনো বিরোধ যদি মুসলিম স্বামী ও কিতাবী (ইহুদী বা খৃষ্টান) স্ত্রীর মধ্যে দেখা দেয় তবে তার ফায়সালা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেকই হতে হবে। আর মুসলিম নারী কোনো অবস্থাতেই কোনো অমুসলিম পুরুষের বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারেনা।

৮৪, ৮৫ ও ৮৬নং ধারায় এই মর্মে সুপারিশ করা হয়েছে যে, বলপূর্বক যে স্ত্রীর সম্ভ্রম হানি করা হয়, তাকে অপরাধীর কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত। প্রস্তাবটি ৮৬নং ধারায় এভাবে উদ্ধৃত হয়েছেঃ

"ফৌজদারী দন্ড বিধির ৫৪৪(ক) ধারায় কিছু সংশোধন করা উচিত, যাতে নারীর ওপর বলাৎকার ও সম্ভ্রম হানির অপরাধের জন্য কাউকে শাস্তি দেয়ার আগে শাস্তি দানকারী আদালত উক্ত নারীকে যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়।"

আমরা একথা আগেই বলেছি এবং এখন তার পুনরাবৃত্তি করছি যে, ব্যভিচার চাই বলপূর্বক করা হোক কিংবা পারস্পরিক সম্মতিক্রমে হোক উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম তার শাস্তি একশো বেত্রাঘাত অথবা পাথরের আঘাতে মৃত্যু নির্ধারণ করে দিয়েছে।[১] ইসলাম হত্যা ও কিসাসের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থিক দন্ডও নির্ধারণ করেছে বটে। কিন্তু নারীর সম্ভ্রম ও সতীত্বের কোনো আর্থিক বা বস্তুগত বিকল্প ও বিনিময় হতে পারেনা। ইসলামে তেমন কোনো ধারণার অস্তিত্ব নেই। যে যালেম ও নির্লজ্জ পুরুষ নারীর সতিত্ব হরণ করেছে আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন কোনো মুসলিম নারী কি তার কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিতে রাজি হতে পারে? এটা আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম বিকারগ্রস্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে পাশ্চাত্য সমাজে স্বামীকেও স্ত্রীর সতিত্ব হরণকারীর কাছ থেকে জরিমানা আদায় করে দেয়া হয়। এটা আসলে লম্পট ও দেহপসারিনীদের দালালদের জীবিকা উপার্জনের পথ। এখন মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদেরকে একই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং তার আইনগত উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে, যাতে তারাও ইচ্ছা করলে সতিত্বের মূল্য আদালতের মাধ্যমে আদায় করতে পারে। ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের ধ্যান-ধারণা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে সর্বসম্মত হাদীস রয়েছে যে, এক ব্যক্তির ছেলে অন্য এক ব্যক্তির বাড়ীতে গৃহভৃত্য হিসাবে কর্মরত থাকা কালে তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে। ছেলেটির পিতা শেষোক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে একশো ছাগল ও একটি দাসী দান করে। এরপর সেই পিতা রাসূল (সঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। রসূল (সঃ) বললেন ঃ "যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ তার শপথ, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করবো। তোমার দেয়া একশো ছাগল ও একটি দাসী তোমাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তোমার ছেলেকে একশ' বেত্রাঘাত করা হবে।"

এই একশ' বকরী ও দাসী তো সেই একই "আর্থিক বিনিময়" যা, ব্যভিচারী বা তার পিতার পক্ষ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রসূল (সঃ) তা প্রত্যাখ্যান করে ফেরত দিয়েছিলেন। এখন "নারী অধিকার কমিটির" পক্ষ থেকে পুনরায় এই "আর্থিক বিনিময়ের" প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, যে মহিলা ধর্ষণের শিকার হবে, আদালত যেনো তাকে "উপযুক্ত বিনিময়" আদায় করে দেয়।

এরপর ৮৭ থেকে ৯২নং ধারা পর্যন্ত রিপোর্টে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার

---

১ ধর্ষিতার উপর কোনো দন্ড নেই, দন্ডিত হবে ধর্ষণকারী।

উদ্দেশ্য, পাকিস্তানে সর্বতোভাবে অবাধ ও শর্তহীন গর্ভপাতের আইনগত অনুমতি দেয়া। রিপোর্টের ৮৯ ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহিত মহিলারা সর্ব প্রকারের জন্ম নিরোধক ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও গর্ভবতী হওয়ার কবল থেকে রেহাই পায়না। আমাদের আইনগত ব্যবস্থায় গর্ভপাত শুধুমাত্র প্রাণ রক্ষার খাতিরে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করা ছাড়া বৈধ নয়। অনেকেই অনুভব করছে যে, গর্ভপাতকে আইনানুগভাবে বৈধ করে দেয়া হোক। কেননা সারা দুনিয়ায় মহিলাদের পক্ষ থেকে এটাই দাবী করা হচ্ছে।"

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ মনোনিবেশ সহকারে পড়ুন এবং বারবার পড়ুন আর দেখুন যে, এতে কিরূপ ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতার সাথে অবাস্তব, অনৈতিক ও অনৈসলামিক দাবী দাওয়া ও ধ্যান-ধারণা পেশ করা হয়েছে। এই কমিটি সর্ব প্রথম এই মনগড়া ধারণা পোষণ করেছে যে, মহিলাদের ঘরের বাইরে বেরুনো ও আয়-রোজগার করার পথে যে জিনিসটি সবচেয়ে বড় বাধা, তা হচ্ছে সন্তান ধারণ ও জন্ম দান। এই সন্তানের বিপদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য নারী সব রকমের চেষ্টা চালায়। বিয়ে করেনা, করলেও দেরীতে করে এবং বিয়ের পর সন্তান ধারণ এড়িয়ে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। জন্ম নিরোধক ওষুধ ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে এবং স্বামীর ভ্যাসেকটমি করায়। এতসব বাধা বিপত্তি দাড় কারানো সত্ত্বেও সন্তান চলে আসছে অনাহুত অতিথির মত। তাই কমিটির দৃষ্টিতে সর্বশেষ যে ব্যবস্থাটি অবশিষ্ট রয়েছে, সেটি হলো, সন্তান ভূমিষ্ট হবার আগেই গর্ভপাত করিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু এই পথে যে জটিলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা হলো, দেশে যে আইন চালু রয়েছে, তাতে গর্ভবতীর প্রাণ রক্ষার্থে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করা ছাড়া গর্ভপাত অবৈধ। তাই তখন অবাধে ও শর্তহীনভাবে গর্ভপাত বৈধ হওয়া উচিত। কারণ সারা দুনিয়ার মহিলারা এই দাবী তুলছে! এর অর্থ এছাড়া আর কি দাঁড়ায় যে, সারা দুনিয়ায় যা যা হচ্ছে, তা সবই এখানে আমদানি করা হবে আর সেজন্য যুক্তি দেয়া হবে এই যে, সারা দুনিয়ায় এসবই চলছে।

কমিটির সদস্যরা এ ধরনের প্রস্তাব পেশ করার আগে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করে নিলে বড়ই ভালো করতো। আমরা বলতে চাই এব্যাপারে অনেক কিছুই বলতে পারতাম, কিন্তু তাতে কেবল কথার বহরই বাড়বে। তাই আমরা শুধু জিজ্ঞাসা করতে চাই, সারা দুনিয়ার কথা বাদ দিন, আপনারা শুধু নিজেদের এই দেশ কিংবা দুনিয়ার অন্য কোনো একটি দেশের সম্পর্কেই বলুন যে, সেখানকার নারী সমাজ কবে ও কোথায় এ দাবী করেছে যে, গর্ভপাতকে শর্তহীনভাবে ও সর্বতোভাবে বৈধ করে দেয়া হোক? আর দুনিয়াতে কোনো একটা দেশও কি এমন আছে, যে খোলাখুলিভাবে এ কাজকে আইনগতভাবে বৈধ করে রেখেছে? আমাদের জানা মতে তো সারা বিশ্বে এমন একটি দেশও নেই। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, আপনারা কি পাকিস্তানকে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, যা গর্ভপাত সম্পর্কে সকল ইসলামী ও নৈতিক সীমা পদদলিত করবে? ধরে নিচ্ছি যে, কোনো দেশে এমন একটা আইন পাস হয়েই গেল

কিংবা কোনো দেশের কিছু মহিলা এ ধরনের দাবী তুললোই। তাই বলে কি তা মুসলিম নারী পুরুষদের জন্যও অনুসরণযোগ্য হয়ে যাবে? এই কিছুদিন আগের ঘটনা। পত্র-পত্রিকায় এই মর্মে খবর দেখলাম যে, আমেরিকায় কিছু বেহায়া মহিলা জারজ সন্তানদের জন্য বৈধ সন্তানদের সমান অধিকার দাবী করেছে। আমাদের নারী অধিকার সমিতি এই দাবীর সাথেও একমত কিনা জানতে ইচ্ছে করে? এই সমিতি সংবাদপত্রে রিপোর্ট পাঠানোর সময় তো বলেছিল যে, তারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সব কিছু করবে। কিন্তু এখন তাদের অবস্থা এই পর্যায়ে এসেছে যে, দুনিয়ার মহিলারা গর্ভপাতকে আইনতঃ অবাধ ও শর্তহীনভাবে বৈধ করার দাবী জানাচ্ছে বিধায় এখানেও সেই রকম হওয়া উচিত বলে তাদের ধারণা।

কমিটির দাবীটা যে একেবারেই অচল সে কথা কমিটি নিজেও উপলব্ধি করেছে। তাই ৯০নং ধারায় এ বিষয়টার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এই বলে যে ঃ

> "কমিটি এ সমস্যা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, যদিও পাকিস্তানের মত দেশে এ দাবী মেনে নেয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও অবৈধ গর্ভপাতের ব্যাপকতা কমানোর পক্ষে বহু যুক্তি রয়েছে। দেখা গেছে যে, কার্যতঃ হাতুড়ে ডাক্তার এবং স্বল্প প্রশিক্ষিত ধাত্রীদেরকে অনেক টাকা দিয়ে বেআইনী গর্ভপাত করানো হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে গর্ভপাত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে করানো হয়ে থাকে, যা মহিলার প্রাণনাশের অথবা স্বাস্থ্যের নিদারুণ ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।"

অন্য কথায় বুঝে নিন যে, কমিটির সদস্যরা মন দিয়ে ও মুখ দিয়ে স্বীকার করে নিচ্ছেন, "পাকিস্তানের মত দেশে" তাদের দাবী গৃহীত হবার আশা নেই। কমিটির কাছে জিজ্ঞাসা এই যে, আপনাদের কথা অনুসারে এই দাবী যদি সারা দুনিয়ার মহিলাদের অবিকল মনের কথা হয়ে থাকে, আর আমাদের দেশও তো এই দুনিয়ারই অন্তর্ভুক্ত-তাহলে দাবী গৃহীত হওয়া কেন সম্ভব হবেনা? আর যদি পাকিস্তান সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো চরম অনুন্নত ও অসভ্য দেশ হয়ে থাকে, যেখানে আপনাদের দাবী গ্রহণযোগ্য নয়-তাহলে আপনারা অবাধে এই ব্যর্থ ও অপ্রশংসনীয় চেষ্টা কেন চালাচ্ছেন? এই শর্তহীন গর্ভপাতের প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করতে আপনারা কেন এত আদাপানি খেয়ে নেমেছেন? উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে রেখাংকিত কথাগুলো পড়ে পাঠকগণ ভাববেননা যে, "অবৈধ গর্ভপাতের ব্যাপকতাকে কমানো দ্বারা এই নিন্দিত কাজের প্রতিরোধ বুঝানো হচ্ছে। না, তা নয়। বরং এই অপরাধের ব্যাপক প্রসার কমানোর অর্থ হলো, এই গর্ভপাতের কাজটাকে এখন আর অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হবেনা। অপরাধকে যখন অপরাধই মনে করা হবেনা এবং আইন তাকে বৈধ করে দেবে, তখন অপরাধের ব্যাপক প্রসার আর কোথায়? অপরাধের তো অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কমিটির সদস্যরা এর আগে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে, এরপর গর্ভপাতের কাজটা আর আনাড়ী লোকেরা লুকিয়ে লুকিয়ে অন্ধকার কোঠায় বসে করবেনা। বরং যথাযথ ডিগ্রীধারী ডাক্তারগণ ও

নার্সগণ এ কাজ হাসপাতালে ও ক্লিনিকে প্রকাশ্য দিবালোকে করবেন এবং মহিলাদের স্বাস্থ্য খুব ভালো হয়ে যাবে। এরূপ বলিহারি চিন্তা ও যুক্তি সম্পর্কে আর কিইবা বলার থাকতে পারে?

নারী অধিকার সমিতি পাকিস্তানের মুসলিম নারীদের শারীরিক সুস্বাস্থ্য ছাড়াও তাদের মানসিক সুস্বাস্থ্যও কামনা করে। এ বিষয়টা রিপোর্টের ৯১নং ধারার নিম্নোক্ত অংশে লক্ষ্যণীয় ঃ

> "অনেক ক্ষেত্রে গর্ভবতী মহিলার শুধু যে শারীরিক স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতির আশংকা দূর করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাই নয়, বরং তার মানসিক স্বাস্থ্যও সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করা জরুরী হয়ে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে গর্ভপাত একেবারেই অপরিহার্য হয়ে দেখা দিতে পারে।"

এখানে আরো আলোচনা করার আগে একটা বিশেষ সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। ৮৭ নং ধারা থেকে কমিটি গর্ভপাত সংক্রান্ত সুপারিশের সূচনা করেছেন এবং সেখানে 'বিবাহিত মহিলা'র কলা বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে ৮৯নং ধারা পর্যন্তও "বিবাহিত মহিলার" কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু শেষের ৯১নও ৯২ ধারায় এসে হঠাৎ 'বিবাহিতা' শব্দটি বাদ দিয়ে কেবল "গর্ভবতী মহিলা" রাখা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এ সত্য কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয় যে, গর্ভনিরোধ বা গর্ভপাতের কোনো আন্দোলন, কোনো চেষ্টা, কোনো সুপারিশ বা প্রস্তাব শুধুমাত্র বিবাহিত মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা, থাকতে পারেওনা। শেষ পর্যন্ত এসব চেষ্টা কুমারী ও স্বামীহীনা মহিলাদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবেই। বরঞ্চ সত্য কথা এই যে, এ জাতীয় প্রত্যেক আন্দোলন ও প্রস্তাবের মূল কেন্দ্রবিন্দু ও মূল লক্ষ্য অবিবাহিতা, বিধবা ও নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রীরাই হয়ে থাকে। এটা বিবেক বুদ্ধি, প্রকৃতি ও মানবীয় স্বভাবের একটা অনিবার্য দাবী যা রোধ করা মানুষের তৈরী যুক্তি প্রমাণ ও বিধিব্যবস্থার সাধ্যাতীত। একবার যখন আপনি আইনগতভাবে ও বাস্তবে গর্ভপাতের বৈধতার পথ খুলে দেবেন, তখন তাকে আর সীমাবদ্ধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা যাবেনা।

তখন এ কথা বলা একেবারেই নিরর্থক ও বোকামীর নামান্তর হবে যে, এই অনুমতি শুধুমাত্র সেই সব বিবাহিত মহিলাদের জন্য, যাদের একটা বা দুটো সন্তান রয়েছে এবং আরো বেশী সন্তান হলে তা তাদের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই পরিবার পরিকল্পনা বা গর্ভপাত তাদের জন্য একান্ত জরুরী।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ, পরিবার পরিকল্পনা, বন্ধ্যাকরণ ও দুই সন্তানের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি প্রভৃতির পক্ষে যত যুক্তি প্রমাণ দেয়া হয়ে থাকে, তার সবই আমরা পড়েছি এবং শুনেছি। গর্ভপাতের পক্ষে আপনারা যা কিছু বলেছেন বা বলতে পারেন, তা আমাদের সুবিদিত। আমরা আপাতত তার জবাবে শুধু একটা কথাই বলবো। তাহলো, মুসলিম নারীর সতিত্বের কোনো মূল্য ও মর্যাদা যদি আপনাদের দৃষ্টিতে থেকে থাকে এবং আপনারা যদি চান যে, মুসলিম নারী নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার থেকে নিরাপদ ও নিষ্কলুষ

থাকুক, তাহলে আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের জবাবদিহীর পর একজন কুমারী বা স্বামীহীনা মহিলা যে জিনিসের বলে এই অনাচারের কবল থেকে রেহাই পেতে পারে তা অবৈধ গর্ভসঞ্চার এবং সন্তান প্রসবের আশংকা ও খট্‌কা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনি যখন এই আশংকা ও খট্‌কা দূর করে দেবেন এবং গর্ভসঞ্চার রোধ ও গর্ভপাতের সফল সুযোগ-সুবিধা আইন সম্মতভাবে সরবরাহ করে দেবেন, তাহলে অচিরেই ইসলামী সম্ভ্রমবোধ ও সতিত্বের মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠবে। আপনারা কি অস্বীকার করতে পারেন যে, পাশ্চাত্য সমাজে নারীর সতিত্ব একটা দুর্লভ জিনিস এবং বাস্তবিক পক্ষে কুমারীত্ব ও সতিত্ব নামের কোনো বস্তুর অস্তিত্ব সেখানে নেই। আমাদের দেশে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আপনারা এখন এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে চাইছেন। কিছুদিন আগের কথা। সংবাদপত্রে এ খবর বেরিয়েছিল যে, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মহিলা কর্মচারীরা তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে ফরিয়াদ করেছিল যে, ঐ বিভাগের পুরুষ কর্মচারীদের হাতে তাদের সম্ভ্রম নিরাপদ নয়। মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ব্যাপারটা ভেবে দেখা হবে। আসলে ঐ বেকুফ মহিলাদের মাথা থেকে সতিত্বের ধারণাটা কিভাবে দূর করা যায়, সেটাই হয়তো ভেবে দেখার ইচ্ছা ছিল।

আমাদের দুঃখ ও মর্ম বেদনার অবধি থাকেনা, যখন এই বিস্ময়কর শিক্ষণীয় দৃশ্যটি দেখতে পাই যে, যে ইহুদী জাতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত দুনিয়ার সব জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে পালাচ্ছিল এবং যে জাতিকে ফেরাউন পাইকারী শিশু হত্যার ন্যায় লোমহর্ষক শাস্তি দিয়েছিল, সেই ইহুদী জাতি আজ পর্যন্ত নিজ দেশে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী কার্যকরী করেনি। তার পরিবারগুলো সব সময় বিপুল জনবলে বলিয়ান। ইসরাঈলের ইহুদী লোক সংখ্যা ১৯৪৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিনগুণ হয়ে গেছে। মুসলমানদের দেশ ও ঘরবাড়ী জবর দখল করার পর এখন তারা দুনিয়ার চতুর্দিক থেকে এসে জড় হচ্ছে। প্রতিবছর প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজার ইহুদী ইসরাঈলে আসে এবং বৃহত্তর ইসরাঈল গড়ার স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যে মুসলিম জাতিকে আল্লাহ সব রকমের সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন, তাদেরকে একদিকে সমাজতন্ত্রীরা ভাত-কাপড়-বাসস্থানের আশ্বাস দিচ্ছে, অপর দিকে পুঁজিবাদীরা দেখাচ্ছে যে, সন্তানের সংখ্যা কমাও, নচেৎ না খেয়ে মারা যাবে।

অথচ আল্লাহ বলেছেন,

لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ج

"তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করোনা। আমি তোমাদেরকেও জীবিকা দেবো, ওদেরকেও দেবো।"

যহোক, সকল আলোচনা-পর্যালোচনার পর এবার দেখুন ৯২ নং ধারায় কমিটি

নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করছেঃ

"কমিটি মনে করে যে, পাকিস্তান দন্ডবিধির ৩১২ ধারায় নিম্নরূপ সংশোধন প্রয়োজন ঃ

ক. ৩১২নং ধারায় দ্বিতীয় বার উল্লিখিত "মহিলা" শব্দটির পর "অথবা তার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য গুরুতর ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য" কথাটা যোগ করা হোক, এবং

খ. ৩১২নং ধারায় এই মর্মে আর একটা ব্যাখ্যা সংযোজন করা উচিত যে, "এই ধারার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ১২০দিনের কম বয়সের কোনো ভ্রূণকে সন্তান বলে গণ্য করা হবেনা।"

আলোচ্য সংশোধনী পাকিস্তান দন্ডবিধির যে ধারার সাথে সংযোজনের প্রস্তাব করা হচ্ছে, সেই ৩১২নং ধারাটি কি, তা না জানলে কমিটির এই সংশোধনীগুলো কেমন এবং তার পরিণাম ও ফলাফল কি হতে পারে, তা বুঝা যাবেনা। একটি বিদেশী অমুসলিম সরকারের রচিত এ ধারাটি নিম্নরূপ ঃ

> "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাতের কারণ হবে, তার এই গর্ভপাতের কাজটি যদি মহিলাটির প্রাণরক্ষার্থে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করা না হয়ে থাকে, তবে সেই ব্যক্তিকে তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড (যা সকল ধরনের হতে পারে) অথবা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি দেয়া হবে। আর যে মহিলা নিজেই তাড়াহুড়ো করে সন্তান প্রসব করাবে, তাকে সাত বছর পর্যন্ত সর্বপ্রকারের কারাদন্ড দেয়া হবে এবং সে জরিমানা দিতেও বাধ্য থাকবে।
>
> ব্যাখ্যা ঃ যে মহিলা নিজের গর্ভ নিজেই ফেলবে, তার ওপরও এ ধারা প্রযুক্ত হবে।"
>
> কমিটির প্রস্তাবিত সংশোধনীর পর উপরোক্ত ধারাটি এ রকম দাঁড়াবে ঃ
>
> "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা কার্যকরভাবে কোনো গর্ভবতীর গর্ভপাতের কারণ হবে, এই গর্ভপাত যদি শুভাকাংখার বশে মহিলার প্রাণ রক্ষার্থে অথবা তার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্ভাব্য গুরুতর ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য না হয়ে থাকে তাহলে তাকে তিন বছরের ...."

যে কোনো চিন্তাশীল ও বিবেকবান মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, অমুসলিম ইংরেজ আইন-প্রণেতাদের রচিত ধারাটির প্রাচীন রূপ অনুসারে গর্ভপাত করা শুধুমাত্র সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে গর্ভবতী মহিলার প্রাণ রক্ষার জন্য কোনো ব্যক্তি বা স্বয়ং গর্ভবতী মহিলার পক্ষে বৈধ হতে পারতো, নচেৎ তার ওপর তিন বা সাত বছরের কারাদন্ড বলবৎ হতো। এটা সুস্পষ্ট যে, গর্ভবতীর প্রাণ রক্ষা করা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং তার বৈধ রূপ নির্ণয় করাও কঠিন নয় কিন্তু মহিলার দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর ক্ষতির আশংকা এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর ক্ষতির আশংকা এমন এক অদ্ভুত, অস্পষ্ট ও কাল্পনিক ব্যাপার যে, তা সব রকমের গর্ভের ক্ষেত্রে সহজেই প্রযোজ্য।

কোনো পুরুষ, নারী, ধাত্রী, বা ডাক্তারের কাছে এমন কোনো পরিমাপ যন্ত্র আছে কি যা দ্বারা সে কোনো গর্ভধারিণীর মানসিক স্বাস্থ্য এবং তার আসন্ন গুরুতর ক্ষতিকে মেপে দিতে পারবে? কোনো আইনজীবী ও বিচারকের কাছেই বা এমন কোন্ দাড়িপাল্লা থাকবে যা দ্বারা তিনি স্থির করতে পারবেন যে, কোনো গর্ভপাতের ঘটনা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের আসন্ন গুরুতর ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য হয়েছে কিনা? গর্ভপাতের অপরাধ প্রতিরোধের জন্য যে ভালো বা মন্দ আইন এ যাবত চালু ছিল, কমিটির এই প্রস্তাবিত সংশোধনী তাকে একেবারেই নিষ্প্রাণ ও নিরর্থক জানিয়ে দিয়েছে। এখন যে কোনো ব্যক্তির জন্য এটা সম্পূর্ণ সহজ হয়ে যাবে যে, সে অমুসলিমদের নয়, খোদ মুসলমানদের প্রস্তাবিত এই আইনের আলোকে যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো গর্ভপাত ঘটাতে পারবে। এটা একটা আশ্চর্য পরিহাস যে, এই কমিটি একদিকে বলছে, পাকিস্তানের মত দেশে গর্ভপাতের দাবী মেনে নেয়া সম্ভব নয়, অপর দিকে সে কার্যতঃ সেই একই প্রস্তাব তুলে ধরছে, যার দ্বারা গর্ভপাতের পথের সকল বাধা দূর হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও যখন কমিটির সদস্যদের মনের শংকা দূর হলোনা তখন তারা এই ধারাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এ কথাও যোগ করা জরুরী মনে করলো যে, "এই ধারাটির উদ্দেশ্য সফল করার জন্য একশ বিশ দিনের কম বয়সের কোনো ভ্রূণকে সন্তান গণ্য করা হবেনা।" ভাবখানা এই যে, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝগড়া বিবাদ ও চার মাস অতিবাহিত হবার পরই সৃষ্টি হবে। তার আগ পর্যন্ত যে সন্তান মায়ের গর্ভে জন্ম নেবে, তা সন্তান নয়-কোনো ফোড়া বা অনুরূপ কিছু হবে, যা বের করে ফেলে দেয়া আইনতঃ বৈধ হবে এবং তা নিয়ে কোনো জবাবদিহী করতে হবেনা। কমিটির কাছে আমরা কি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে, তারা চার মাসের কম বয়সের গর্ভপাত ঘটানোর বৈধতা কোথা থেকে পেলেন ঃ কুরআন হাদীসে কি এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ আছে? আমাদের মতে, গর্ভ বৈধ হোক বা অবৈধ হোক, এক মাসের হোক বা বেশী হোক, তা ফেলে দেয়া ইসলামে কখনো জায়েয নয়। এটা একটা নরহত্যা, যা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে বৈধ নয়।

সহীহ্ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (সঃ) এর কাছে গামেদ গোত্রের এক মহিলা এসে বললোঃ হে রসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন। অর্থাৎ আমাকে ব্যভিচারের শাস্তি দিন। রসূল (সঃ) বললেন ঃ তুমি চলে যাও, ফিরে যাও, নিজ প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও এবং তওবা কর। মহিলা বললো! আপনি মাগের বিন মালেককে যেভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আমাকেও বুঝি সেইভাবে ফিরিয়ে দিতে চাইছেন? (মাগেরও ব্যভিচার করে ফেলেছিলেন এবং তাকেও তিনি প্রথমবার ফেরত দিয়ে বলেছিলেন যে, হয়তো তুমি নেশাগ্রস্ত অথবা পাগল অবস্থায় এ কাজ করেছ।) মহিলা আরো বললো ঃ আমি ব্যভিচার করেছি এবং ব্যাভিচারের কারণে আমার পেটে সন্তান এসেছে। রসূল (সঃ) বললেনঃ সত্যিই কি তোমার অবস্থা এ রকম? সে বললো জ্বি হ্যাঁ। তখন তিনি আবার বললেন ঃ তোমার সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে শাস্তি

দেয়া যাবেনা। এই সময় জনৈক আনসারী সাহাবী সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত মহিলার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সন্তান প্রসবের পর সাহাবী রসূল (সঃ)কে জানালেন যে, সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে। রসূল (সঃ) বললেন ঃ এখনো আমি ওকে পাথর মেরে হত্যা করবোনা কেননা, ওর সন্তান দুধ খাওয়া শিশু। ওকে দুধ খাওয়াবে কে? কাজেই সে এখন চলে যাক। নিজের সন্তানকে দুধ খাওয়াক এবং দুধ ছাড়ার পর আসুক। সেই মহিলা সন্তানের দুধ ছাড়ানোর পরে আবার এলো। শিশুটি যে দুধ ছেড়েছে তা দেখানোর জন্য তাকে সাথে নিয়ে এলো। শিশুর হাতে এক টুকুরো রুটি ছিল এবং সে খাচ্ছিল। এবার শিশুটিকে জনৈক মুসলমানের হাতে সোপর্দ করে মহিলাকে রজম (প্রস্তারাঘাতে মৃত্যু দন্ড কার্যকর) করা হলো। হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ) এই মহিলার ব্যাপারে একটা বিরূপ মন্তব্য করলে রসূল (সঃ) বললেন ঃ খালেদ! তুমি চুপ কর। আল্লাহর কসম, এই মহিলা এমন তওবা করেছে যে, দুর্নীতিপরায়ণ খাজনা বা কর আদায়কারীও যদি এভাবে তওবা করে, তবে তাকে মাফ করে দেয়া হবে। এরপর রসূল (সঃ) তার জানাযা পড়লেন ও দাফনের ব্যবস্থা করলেন।

নারী অধিকার কমিটির সদস্যদের এবং সাধারণ পাঠকদের এ হাদীসটি মনোযোগ দিয়ে পড়া উচিত। এই শিক্ষাপ্রদ ও উপদেশমূলক হাদীসটি থেকে একটি বিষয় জানা গেলো, সেটি হলো রসূল (সঃ) ঐ মহিলার কাছে জানতে চাননি যে, তোমার সাথে ব্যভিচার কে করেছে? এর কারণ এই যে, এই ব্যভিচারের ঘটনায় কোনো সাক্ষী উপস্থিত হয়নি। কেবল অপরাধিনীর স্বীকারোক্তি দ্বারা তার নিজের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এতে অন্য কারো বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়না। তাই ব্যভিচারী পুরুষটির ব্যাপার আখেরাতের জন্য রেখে দেয়া হয়েছে। এই মহিলার তীব্র অনুশোচনা বোধ ও ঈমানী সাহস থেকে বুঝা যায় যে, সে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পর অথবা যত শীঘ্র সম্ভব ঘটনা সম্পর্কে রসূল (সঃ)কে অবহিত করেছিল। কাজেই এই (অবৈধ) গর্ভধারণের পর একশো বিশ দিন যে অতিবাহিত হয়নি, তা সুনিশ্চিত। এই মহিলার ওপর শরীয়তের নির্ধারিত দন্ড কার্যকর না করে উপায়ান্তর ছিলনা। এই খোদাভীরু মহিলার যে দিনটিই কেটেছে তা নিশ্চয়ই আত্মিক ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই কেটেছে। কিন্তু রসূল (সঃ) আলোচ্য কমিটির সদস্যদের মত বলেননি যে, এই মহিলার গর্ভস্থ ভ্রূণের বয়স যেহেতু ১২০ দিন হয়নি, তাই আইনগত উদ্দেশ্যে তাকে সন্তান ধরা হবেনা। তাছাড়া এখানে সন্তানও তো ব্যভিচারজাত সন্তান। অথচ তার জন্ম ও দুধ খাওয়ানোর জন্য তিনি শাস্তিকে বিলম্বিত করেছেন। এখানে এই মহিলার প্রাণ রক্ষারও প্রশ্ন ছিলনা। বরঞ্চ সে নিজেই নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে নিজের নশ্বর দেহকে পবিত্র করা ও অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিজেকে পেশ করেছিল। তাকে যে পাথর মেরে হত্যা করা হবে, তা সেও জানতো, রসূল (সঃ)ও জানতেন এবং অন্য লোকেরাও জানতো। কিন্তু রসূল (সঃ) ঐ শিশুর জীবন রক্ষার্থে দুই আড়াই বছর পর্যন্ত শাস্তি মুলবতী রাখেন। কেননা ব্যাভিচারের অপরাধ সংঘটন ও পেটে সন্তান আসার ব্যাপারে

এই শিশুর তো কোন দোষ ছিলনা। দোষ যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা ছিল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারীণীর। এই একটি ঘটনা থেকেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষের প্রাণের গুরুত্ব ও মর্যাদা ইসলামে কতখানি, চাই সে মায়ের পেটেই থাকুকনা কেন। যারা রসূল (সঃ) এর উম্মাতের সদস্য হয়েও মুসলিম সমাজে গর্ভপাতেও আইনগত বৈধতা দিতে চেষ্টা করছে, তারা নিজেরাই কত বড় জুলুম ও কত বড় অপরাধ করছেন?

আমরা জানি এবং আমাদের পোড়া কপাল যে, স্বচক্ষেও দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের সমাজে মদ খুরি বেশ্যাবৃত্তি, গর্ভপাত ও নগ্ন নৃত্য চলছে। আবার রাত দিন হত্যা, লুটতরাজ এবং জানমালের ওপর হস্তক্ষেপও চলছে। এ সবের মধ্যে অনেকগুলো অপরাধ ইতিপূর্বেই আইনের আশ্রয় লাভ করেছে অথবা আইন তাদেরকে দেখেও না দেখার ভান করছে। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সমস্ত অপরাধের ব্যাপক প্রসার রোধ করার একমাত্র সর্বশেষ উপায় কি এটাই অবশিষ্ট রয়েছে যে, দন্ডবিধির ধারাগুলিতে ঐসব অপরাধের বৈধতার বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করা। চাই সংবাপত্রের খবরে জানা গেছে যে, ইসলামী পরামর্শ পরিষদ জনৈক বিজ্ঞ সাবেক প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে পাকিস্তান দন্ডবিধি এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রভৃতির ধারাগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরে যাচাই করে বিকল্প ধারাসমূহ তৈরী করছে। এই পরিষদের সুপারিশগুলিও যদি জনসাধারণ অথবা আইনসভাগুলোর গোচরে আসতো এবং নারী অধিকার কমিটির প্রস্তাব ও সুপারিশমালা সম্পর্কেও যদি উক্ত ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের মতামত জানা যেতো তাহলে খুবই ভালো হতো। (তরজমানুল কুরআন নভেম্বর, ১৯৭৬)

নারী অধিকার কমিটির সভাপতির ব্যাখ্যা ও তার পর্যালোচনা-(৫)

পাকিস্তানের এটর্নি জেনারেল ও নারী অধিকার সমিতির চেয়ারম্যান জনাব ইয়াহিয়া বখতিয়ারের একটা বিস্তারিত বিবৃতি ২৪/১০/৭৬ তারিখের পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এই বিবৃতির বেশীর ভাগ অংশে আমাদের বক্তব্যের সমালোচনা করা হয়েছে। নারী অধিকার কমিটির রিপোর্টের পর্যালোচনা করে লেখা আমার একটি নিবন্ধ মাসিক তরজমানুল কুরআনের আগস্ট সংখ্যায় ছাপা হয়। ঐ নিবন্ধের সমালোচনা করা হয়েছে উল্লিখিত বিবৃতিতে। এটা মুখের বিষয় যে, কমিটির সম্মানিত সভাপতি আমাদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অবশ্য এর সাথে দ্বিমতই পোষণ করেছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, তার সুপারিশগুলোর ওপর যাদের আপত্তি রয়েছে, তাদের উচিত আরো একটু বুঝবার চেষ্টা চালানো। কমিটি এ কথা কল্পনাও করতে পারেনা যে, সে ইসলামী বিধিমালার বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রণয়নের পরামর্শ দেবে। তিনি অনুযোগ করেছেন যে, আমার নিবন্ধে অন্য কতিপয় লেখকের উদ্ধৃতি দিলেও মাওলানা মওদূদীর লেখা "স্বামী স্ত্রীর অধিকার" গ্রন্থটির কোনো উদ্ধৃতি দেয়া হয়নি। বিবৃতিতে একথাও বলা হয়েছে যে,

"একজন মুসলিম নারী যদি নিজের স্বামীর কাছ থেকে খুলা করতে চায়, তাহলে তার জন্য এ কথা প্রমাণ করা জরুরী নয় যে, সে ও তার স্বামী আল্লাহর সীমার ভেতরে থেকে একত্রে জীবন যাপন করতে অক্ষম। এটি এত স্পর্শ কাতর ব্যাপার যে, আদালতের পক্ষে এ ব্যাপারে তদন্ত চালিয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভবই নয়।"

এটর্নী জেনারেল সাহেব আরো বলেন যে, মাওলানা মওদূদীর অভিমতও অনুরূপ। কেননা তিনি স্বামী স্ত্রীর অধিকার গ্রন্থে লিখেছেন যে ঃ

"খুলার জন্য আসলে বিচারকের কাছে এটা কোনো বিবেচ্য বিষয়ই নয় যে, স্ত্রী কোন বৈধ প্রয়োজনের খাতিরে খুলা করতে চাইছেনা কেবল প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী অনুসারেই বিচ্ছেদ কামনা করছে। এ জন্য রসূল (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন যখন খুলার মোকদ্দামাগুলোর শূনানী গ্রহণ করেছেন, তখন এ প্রশ্নের কোনো গুরুত্বই দেননি। কেননা এ প্রশ্নের যথোপযুক্ত তদন্ত অনুষ্ঠান কোন বিচারকের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া মহিলাদের জন্য খুলার অধিকার স্বামীকে দেয়া তালাকের অধিকারের সমপর্যায়ের। নিছক বৈচিত্রের আনন্দ উপভোগ করার উদ্দেশ্য উভয় ক্ষেত্রেই থাকতে পারে। তবে পুরুষের তালাকের অধিকারকে আইনত এই শর্তের সাথে আবদ্ধ করা হয়নি যে, তা কেবল বৈচিত্র স্বাদ উপভোগের জন্য ব্যবহৃত না হওয়া চাই। সুতরাং আইনগত অধিকার হিসাবে নারীর খুলার অধিকার কোনো নৈতিক শর্তযুক্ত হওয়া উচিত নয়।"

এরপর বিবৃতিতে আমার নিবন্ধের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে (যা কমিটির সভাপতির মতে, মাওলানা মওদূদীর মতের বিপরীতে

"তবে মামলা আদালতে যাওয়ার পর আদালত তদন্ত করবে যে, সত্যই কি স্বামীর ওপর স্ত্রীর এত ঘৃণা ও বিরক্তি জন্মে গেছে যে, তার সাথে বনিবনা হবার সম্ভাবনা নেই এবং আল্লাহর সীমা লংঘিত হবার আশংকা আছে? যদি তাই হয়, তাহলে আদালত যেরূপ বিনিময় স্থির করতে চায় করতে পারে এবং স্বামীর সাথে খুলা কিংবা বিয়ে বাতিলের রায় দিতে পারে।"

নিবন্ধের উপরোক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করার পর মাওলানা মওদূদীর আরো একটা উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে ঃ

"খুলা সংক্রান্ত এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী আইনে নারী ও পুরুষের অধিকারের মধ্যে কতখানি নিখুঁত ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। এটা আমাদেরই ভুল যে, আমরা আমাদের স্ত্রীদের খুলার অধিকারকে কার্যত ছিনিয়ে নিয়েছি এবং ইসলামী শরীয়তের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত, খুলা দেয়া না দেয়াকে পুরুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল বানিয়ে রেখেছি। এতে নারীদের কত অধিকার যে ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং হচ্ছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তবে এর দায়-দায়িত্ব আল্লাহ ও রসূলের বিধানের ওপর মোটেই নেই। এখনও যদি মহিলাদের এ অধিকারটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা আমাদের অনেকেরেই দাম্পত্য জীবনের

অনেক জটিল সমস্যা নিরসনের সহায়ক হবে, এমনকি সমস্যার সৃষ্টি হওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে"।

অতঃপর মাওলানার আরো একটা উদ্ধৃতি তুলে দেয়া হয়েছে ঃ

"সুতরাং রসূল (সঃ)-এর বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে এই বিধি পাওয়া যাচ্ছে যে, খুলার বিধি বাস্তবায়িত করতে শুধু এতটুকু নিশ্চিত হওয়াই যথেষ্ট যে, স্ত্রী তার স্বামীকে একেবারেই অপছন্দ করে এবং তার সাথে থাকতে চায়না। হযরত ওমরের জীবন থেকেও আমরা পাই যে, ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ অনুসন্ধান করা জরুরী নয়। বস্তুত এ কথাটা যুক্তিসংগতও বটে।"

সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেবের অনুযোগের জবাবে আমরা বলতে চাই যে, তরজুমানুল কুরআনে প্রকাশিত আমার নিবন্ধের সাথে মাওলানা মওদূদীর মতামতের কোনোই বিরোধ নেই। খুলার ব্যাপারটা যদি ঘরোয়াভাবে মীমাংসা করা সম্ভব না হয়, তাহলে তা আদালতে যাবে। আদালতকে তিনটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবেঃ

১. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও অবনিবনা কি এত মারাত্মক, অসহনীয় ও অসংশোধনীয় পর্যায়ে চলে গেছে যে, এখন আর তাদের এক সাথে থাকা সম্ভব নয়, অধিকন্তু একত্রে থাকলে আল্লাহ নির্দেশিত সীমা লংঘিত হবার আশংকা রয়েছে এবং দাম্পত্য সম্পর্কের বিকৃতি ও অবনতি গুনাহর কাজ সংঘটিত হবার কারণ হয়ে দাঁড়াবে?

২. এই পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য কোনো বৈধ ও যুক্তিসংগত কারণ বা ভিত্তি আছে, না শুধু কোনো এক পক্ষ অথবা উভয় পক্ষের অমনোযোগ, অহংকার অথবা রুচি বদলের কামনা এর কারণ?

৩. বনিবনা যদি অসম্ভব হয় এবং খুলা বা বিচ্ছেদ জরুরী হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীর দেয় আর্থিক বিনিময়ের পরিমাণ কি হবে?

তরজমানুল কুরআনের নিবন্ধটিতে যে কথা বলা হয়েছিল তা অবিকল মাওলানা মওদূদীর অনুসৃত নীতি ও অভিমতের অনুসারী। সে কথাটা এই যে, উপরোক্ত তিনটে প্রশ্নের মধ্যে দ্বিতীয়টি বিচারকের জন্য মোটেই বিবেচ্য বিষয় নয়। তাঁকে শুধু প্রথম প্রশ্নটির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, বাস্তবিক পক্ষে এখন দাম্পত্য সম্পর্কের এতদূর অবনতি ঘটেছে যে, এখন আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করা ছাড়া বজায় রাখা সম্ভব নয়। এরূপ নিশ্চিত হবার পর তিনি খুলা বা বিয়ে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন। অধিকন্তু তৃতীয় প্রশ্নের ব্যাপারেও আর্থিক বিনিময়ের পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন। নারী অধিকার সমিতির সাথে আমাদের মতবিরোধ এখানেই যে, তারা উপরোল্লিখিত তিনটে প্রশ্নের মধ্যে শুধুমাত্র তৃতীয় প্রশ্নের ব্যাপারে অর্থাৎ কেবল মাত্র বিনিময়ের পরিমাণ নির্ধারণের অধিকারই আদালতকে দিতে চান। এর উর্দ্ধে তারা আদালতকে এতটুকু তথ্য অনুসন্ধান করার অঙ্গীকার দিতে চাননা যে, বাস্তবিকই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঘৃণা-বিদ্বেষের এমন দুর্লংঘ্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেছে কিনা যার জন্য আল্লাহর সীমা বহাল রেখে উভয়ের স্বামী-স্ত্রী

হিসেবে একত্র জীবন যাপন করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। এই ঘৃণা-বিদ্বেষের কারণ নৈতিকতা ও শরীয়তের বিধির আলোকে সংগত ও বৈধ হোক বা না হোক, আদালতের অন্ততঃ এতটুকু তো খতিয়ে দেখা উচিত যে, ঘৃণা বিদ্বেষ আদৌ বিদ্যমান আছে কি না? এটা একটা বিস্ময়কর কাকতালীয় ব্যাপার যে, তরজুমানুল কুরআনের আলোচ্য নিবন্ধের যে দুটো লাইনকে মাওলানা মওদূদীর নীতি, আদর্শ ও মতামতের বিপরীত বলে উল্লেখ করা হয়েছে, মাওলানা মওদূদীর অপর একটি লেখার সাথে ঐ দুটি লাইনের হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায়। এমনকি দুটি বক্তব্য পাশাপাশি রেখে পড়লে মনে হয়, দুটো ভিন্ন ভিন্ন লেখনী থেকে নিসৃত হলেও ঘটনাক্রমে কথা দুটো একেবারেই এক ও অভিন্ন। সূরা বাকারার ২২৯নং আয়াতের তাফসীর প্রসংগে মাওলানা মওদূদী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ তাফহীমুল কুরআনে যা লিখেছেন, এখানে তারই উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, চলতি আলোচনা প্রসংগে এ আয়াতটি নারী অধিকার কমিটিও স্বীয় রিপোর্টে উদ্ধৃত করেছে। মাওলানা মওদূদীর সেই বক্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

> "শরীয়তের পরিভাষায় এ জিনিসটাকে খুলা বলা হয়। অর্থাৎ কোনো স্ত্রী কর্তৃক স্বীয় স্বামীকে কিছু দিয়ে তার কাছ থেকে তালাক গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি ঘরোয়াভাবেই কোনো রকম আপোষ রফা হয়ে যায়, তাহলে উভয়ের মধ্যে যা স্থির হয়েছে, তাই কার্যকর হবে। কিন্তু ব্যাপারটা যদি আদালত পর্যন্ত গড়ায় তা হলে আদালত শুধু এই বিষয়ে তদন্ত চালাবে যে, বাস্তবিক পক্ষেই কি স্ত্রী স্বামীর প্রতি এতদূর বিরূপ হয়ে গেছে যে, উভয়ের মধ্যে আর বনিবনা হওয়া সম্ভব নয়?
>
> এ ব্যাপারে তদন্ত হয়ে যাওয়ার পর আদালত বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে যা বিনিময় নির্ধারণ করতে চায়, করতে পারবে। আদালতের নির্ধারিত এই বিমিনয় গ্রহণ করে স্ত্রীকে তালাক দেয়া স্বামীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে।"

আর বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল সাহেব এবং সুধী পাঠক উপরোক্ত বক্তব্য এবং তরজমানুল কুরআনের নিবন্ধের উদ্ধৃত বক্তব্যের তুলনা করে দেখতে পারেন যে, এই দুটি বক্তব্য পরস্পরের বিরোধিতা করছে, না সমর্থন করছে। এটর্নী জেনারেল সাহেব আরো যে আপত্তিকর কাজটি করেছেন, তা হলো এই যে, তিনি মাওলানা মওদূদী রচিত "স্বামী স্ত্রীর অধিকার" বইটির যে বক্তব্যটুকু তার মতের অনুকূলে মনে হয়েছে সেটুকু উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ঐ একই আলোচনার জন্য যেসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাঁর মতের বিরুদ্ধে যায় এবং মাওলানা মওদূদীর নীতি ও দৃষ্টিভংগীর পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়, তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি ঃ

'স্বামী স্ত্রীর অধিকার' নামক বইটি থেকে একটি উদ্ধৃতি তিনি সবার শেষে দিয়েছেন। এই উদ্ধৃতি শুরু হয়েছে এভাবে ঃ "সুতরাং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজ থেকে এই বিধির উৎপত্তি হয়।"

এটি স্বামী-স্ত্রীর অধিকার নামক বই-এর একাদশ সংস্করণের ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায়

(এখানে মূল উর্দু-এর পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রদত্ত হয়েছে।) "খুলার বিধি" শিরোনামে বিদ্যমান। এতে মাওলানার বক্তব্য হলো ঃ "খুলার আদেশ কার্যকর হওয়ার জন্য শুধু এ বিষয়ের তদন্ত হওয়াই যথেষ্ট যে, স্ত্রী স্বামীকে অপছন্দ করে।" এখানে "তদন্ত" শব্দটি থেকেই জানা যাচ্ছে যে, এই চূড়ান্ত অবনিবনার তদন্ত আদালতই করবে। 'তদন্ত' ও অনুসন্ধান ছাড়া নিছক স্ত্রীর নোটিশ (অথবা কমিটির প্রস্তাবিত শপথমূলক বিবৃতি) তদন্ত বলে গণ্য হতে পারেনা যে, তার ভিত্তিতে খুলার বিধি কার্যকর হয়ে যাবে। মাওলানার বর্ণিত খুলার বিধিমালার মধ্যে এটি প্রথম এবং এটি ১নং হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর ২নং বিধি বর্ণিত হয়েছে। অথচ এটর্নী জেনারেল সাহেব সেটি একেবারেই উধাও করে দিয়েছেন এবং এরপরে ৩নং উল্লেখ করেছেন। ২নং বিধিটি স্বামী-স্ত্রীর অধিকার বইতে নিম্নরূপ ঃ

(২) "হযরত ওমরের বাস্তব দৃষ্টান্ত থেকে জানা যায় যে, অপছন্দ ও অবনিবনার তদন্তের জন্য শরীয়ত ভিত্তিক বিচারক কোনো মানানসই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, যাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে এবং নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এই দম্পতির এখন আর একত্রে থাকার কোনো আশা নেই।"

যেহেতু উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঘৃণা আছে কি নেই, তার তদন্তের জন্য আদালত যে কোনো যুক্তিসংগত পন্থা অবলম্বন করতে পারে এবং এটা নারী অধিকার কমিটির মনঃপুত নয়, তাই এ অংশটুকু উধাও করে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে ৬৬ পৃষ্ঠায় মাওলানা মওদূদী এই কর্মপন্থার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যা হযরত ওমর অবলম্বন করেছিলেন। সেই কর্মপন্থাটি হলো ঃ

"তিনি স্ত্রীকে স্বামীর সাথে থাকার উপদেশ দিলেন। স্ত্রী তা মানলোনা। অতঃপর তিনি তাকে একটি আবর্জনায় ভরা কক্ষে আটক করে রাখলেন। তিন দিন আটকে রাখার পর তিনি তাকে বের করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার অবস্থা কী? সে বললো ঃ "আল্লাহর কসম, আমার জীবনে এই কটি রাতই শান্তিতে কেটেছে। এ কথা শুনে হযরত ওমর তার স্বামীকে আদেশ দিলেন যে, ওকে খুলা দিয়ে দাও, আর এর বিনিময়ে সে যদি কেবল তার কানের বালিটাই দিতে সমর্থ হয়, তবে তাই গ্রহণ কর।"

এখন একদিকে হযরত ওমরের অনুসৃত এই তদন্ত পদ্ধতি দেখুন। মাওলানা মওদূদী ইমাম শারানীর লেখা কাশফুল গুম্মাহ আন জামিয়িল উম্মাহ" নামক গ্রন্থ থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন। অপরদিকে মজার ব্যাপার দেখুন যে, কমিটির সদস্যরা ইমাম শারানীর অপর একখানি গ্রন্থ "আল মীযানুল কুবরা"র একটা অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি বার বার দিচ্ছেন, যাতে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী-স্বামীর কদাকার চেহারার প্রতি ঘৃণাবশতঃ খুলা নিতে পারে। (এটা মূল রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে, আবার সাম্প্রতিক বিবৃতিতেও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।) কিন্তু ঘৃণা যথার্থই রয়েছে কিনা, তা জানবার যে পন্থা হযরত

ওমর গ্রহণ করলেন, এটর্নী জেনারেল সাহেব তার কোনো উল্লেখ করলেননা। হযরত ওমর তাকে তিন দিন আটকে রেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তার ঘৃণার মনোভাব বহাল আছে, না কি সেটা কিছু হ্রাস পেয়েছে। আসলে এটর্নী জেনারেল সাহেবের দৃষ্টিভংগী হলো, স্ত্রী যখনই লিখে দেবে বা বিবৃতি দেবে যে, সে এবং তার স্বামী আল্লাহর সীমানার মধ্যে থেকে জীবন যাপন করতে সক্ষম নয়, অমনি আদালত বিনা বাক্যব্যয়ে সে কথা মেনে নেবে এবং কথাটা যথার্থ কিনা তা যাচাই করার জন্য বিন্দুমাত্রও কোনো পদক্ষেপ নিতে পারবেনা, এমন কি স্বামীর বক্তব্যও শুনতে পারবেনা। আদালতের কাজ হবে ঝটপট বিয়ে বাতিল মনে করে অথবা বাতিল সাব্যস্ত করে আর্থিক বিনিময় নির্ধারণের বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দেবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইমাম শারানীর গ্রন্থ আল মীযানের বক্তব্য কমিটির রিপোর্টে এবং সাম্প্রতিক বিবৃতিতে উভয় জায়গায় অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। ইমাম শারানী যেখানে বলেছেন যে, আর্থিক বিনিময় দিয়ে খুলা নেয়া স্ত্রীর সর্ববাদীসম্মত অধিকার। সেখানে তিনি এ কথাও লিখেছেন যে,

> "স্বামী স্ত্রী যদি বিনা কারণে খুলা করতে রাজি হয়ে যায় তবে তা জায়েজ, মকরূহ নয়। কিন্তু ইমাম যুহরী, ইমাম আতা বিন আবি রাবাহ মাক্কী এবং ইমাম দাউদ যাহেরী এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের বক্তব্য হলো, এরূপ পরিস্থিতিতে খুলা একটা বেহুদা ও উদ্দেশ্যহীন কাজ। উদ্দেশ্যহীন ও বেহুদা কাজ ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী এবং সে কারণে তা বর্জনীয়।"

অনুরূপভাবে 'স্বামী স্ত্রীর অধিকার' নামক গ্রন্থে যে বলা হয়েছে, "হযরত ওমরের এই কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ অনুসন্ধান করা জরুরী নয়" এরও অর্থ এটা নয় যে, আদালত আদৌ ঘৃণা ও বিদ্বেষের অস্তিত্বের সন্ধান নেয়ারও চেষ্টা করবেনা, বরং এর অর্থ শুধু এই যে, ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ খোঁজার চেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। ঘৃণা-বিদ্বেষ আছে কি না তা জানা এক কথা, আর ঘৃণা-বিদ্বেষের কারণ কী, তা জানা আর এক কথা। মাওলানা মওদূদীর যে প্যারাটি উপরোক্ত বাক্য দিয়ে শুরু করা হয়েছে, তাতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এ কথাও বলা হয়েছে যে, "বিচারকের কাজ হলো স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মেছে কি না তা নিশ্চিতভাবে জানা। এটা জানা বিচারকের কাজ নয় যে, স্ত্রী যেসব কারণ বর্ণনা করছে তা বিদ্বেষের জন্য যথেষ্ট কি না।" আমাদের দেয়া এই বিশদ বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, নারী অধিকার কমিটি নিজের মনগড়া মতবাদগুলোকে যে কোনো মূল্যে সঠিক প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর এবং এ উদ্দেশ্যে অন্যদের লেখাকে অন্যায়ভাবে কাটছাঁট করাও বৈধ মনে করে।

কমিটির সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যগণকে আমরা বলতে চাই যে, সূরা বাকারার যে ২২৯নং আয়াতের বরাত তারা দিচ্ছেন, তাতে "যদি তোমাদের আশংকা হয়" এ কথাটা তো শুধু স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলা সম্ভব নয়। কারণ ওটা দ্বিবচন মূলক ক্রিয়া নয়, যা কেবল দুজনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বরং এটা বহুবচনমূলক ক্রিয়া,

যা আরবী ভাষায় দুই এর অধিক ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই এ সম্বোধনে স্বামী-স্ত্রী ছাড়া পরিবারের সদস্যবর্গ এবং আদালতের কাযীও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তাদের সকলকেই বলা হচ্ছে যে, "তোমাদের যদি আশংকা হয় যে, ওরা দু'জন আল্লাহর সীমানা বজায় রাখতে পারবেনা....."। এমতাবস্থায় কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, স্ত্রী শুধু যদি এই মর্মে নোটিশ দেয় এবং শপথ করে যে, এখন আমাদের দু'জনের পক্ষে আল্লাহর সীমানা সংরক্ষণ করা আর সম্ভব নয় এবং খুলা করা ও বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটানো অপরিহার্য হয়ে গেছে, তাহলেই কি আদালতের মনে উক্ত আশংকা সৃষ্টি হয়ে যাবে? এরচেয়ে বেশী কোনো সামান্যতম তদন্ত করারও কি প্রয়োজন নেই, অথবা স্ত্রীর বক্তব্যের জবাব দেয়ার অধিকারও কি স্বামীর নেই! আবু দাউদ শরীফ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ইসলামের বিচার ব্যবস্থার একটা মূলনীতি নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছেঃ

> "মামলার উভয় পক্ষ আদালতের সামনে বসবে এবং আদালত যেভাবে বাদীর বক্তব্য শুনেছে, সেইভাবে বিবাদীর বক্তব্যও না শুনে কোন ফয়সালা করবেনা।"

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাও এই মূলনীতি স্বীকৃত যে, কোনো ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ না দিয়ে ও তার বক্তব্য না শুনে তার বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবেনা। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এটর্নী জেনারেলের ন্যায় বিজ্ঞ আইনবিদ এই মূলনীতিকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করছেন। তা ছাড়া এ কথাও বলা দরকার যে, এ ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই- এই মর্মে মাওলানা মওদূদী যে কথা বলেছেন, তার সাথে আমরাও পুরোপুরি একমত। তবে তার অর্থ শুধু এই যে, আদালত খুলার দাবীর যাবতীয় কারণ পুংখানুপুংখ অনুসন্ধান করা এবং ঐ দাবীর যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা যাচাই করা ছাড়া খুলা বা বিচ্ছেদ ঘটানোর পক্ষে রায় দেয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য নয়। অন্য কাথায়, খুলা বা বিয়ে বিচ্ছেদ দাবীর নিষ্পত্তি এর কারণসমূহের পুংখানুপংখ তদন্ত ও চুলচেরা বিশ্লেষণের ওপর নির্ভরশীল নয়। কেননা এই যাচাই বাছাই করতে গিয়ে স্বামী-স্ত্রীর এমন সব গোপন তথ্য উদঘাটিত হয়ে যেতে পারে, যা উদঘাটিত হওয়া ইসলামী শরীয়তে ঘোরতর অপছন্দনীয়। তবে আদালত ইচ্ছা করলে কোনো না কোনো পর্যায়ে কারণ অনুসন্ধানও করতে পারে এবং তার সামনে কারণগুলো বর্ণনা করা হলে সে এগুলোর খোঁজ খবর নিতে চাইলে নিতে পারে। স্বামীকে দেয় বিনিময় নির্ধারণ করতে হলেও কখনো কখনো অবনিবনা ও ঘৃণা বিদ্বেষের কারণ কিছু না কিছু জানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কমিটি যদিও আদালতের এই ক্ষমতাও সীমিত করতে চায়, তথাপি এই ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। ফকীহদের সাধারণ ফতোয়া এই যে, স্বামীর অত্যাচার যদি খুলা দাবী করার কারণ হয়ে থাকে, তাহলে স্বামীর পক্ষে বিনিময় গ্রহণ করা মাকরূহ তথা অনুচিত। আর যদি স্ত্রী কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়াই খুলা প্রার্থনা করে, তাহলে স্বামী তাকে যা কিছু মোহরানা বা উপহার হিসেবে দিয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে অথবা তার চেয়ে বেশী কিছু দিতে স্ত্রীকে বাধ্য করার ক্ষমতা

আদালতের রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, আদালত নিছক স্ত্রীর জবানবন্দী গ্রহণ করা পর্যন্ত নিজের ক্ষমতা সীমিত করতে বাধ্য নয়, বরং প্রয়োজন মোতাবেক এবং যুক্তিসংগতভাবে আরো বেশী অনুসন্ধান চালাতে পারে।

নারী অধিকার কমিটির সম্মানিত সভাপতি অনেক আলোচনা ও পর্যালোচনার পর বিবৃতির উপসংহারে বলেছেন যে, কমিটি নিজের ভূমিকা আরো স্পষ্ট করা এবং সকল সন্দেহ সংশয় দূর করার জন্য ১৯৬৪ সালের পশ্চিম পাকিস্তান পারিবারিক আদালত আইনে নিম্নোক্ত সংশোধনীসমূহের প্রস্তাব করছে ঃ

১. যে কোনো বিবাহিতা মুসলিম মহিলা পারিবারিক আদালতে আবেদন পেশ করে নিজের বিয়ের বিচ্ছেদ ঘটানোর সিদ্ধান্ত আদায় করতে পারে। এই আবেদনে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

ক. এই মর্মে একটি শপথনামা যে, সে এবং তার স্বামী আল্লাহর নির্ধারিত সীমার ভেতরে জীবন যাপন করতে অক্ষম,

খ. সে খুলার বিনিময়ে দেয় অর্থ দিতে এবং স্বামী তাকে বিয়ের সময় যা কিছু দিয়েছিল তা ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত।

গ. শপথযুক্ত বিবৃতির সত্যাসত্য শুদ্ধাশুদ্ধ যাচাই না করেই আদালত খুলার জন্য স্ত্রীর পক্ষ থেকে দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।

ঘ. স্বামী যদি বিয়ের সময় কোনো ভূসম্পত্তি পেয়ে থাকে, অথবা স্ত্রীর অন্য কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি স্বামীর দখলে থেকে থাকে, তাহলে সেই সম্পত্তি স্ত্রীকে ফেরত দিতে হবে, অথবা তাকে উক্ত বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত করবে, যা স্বামীকে দেয়া স্ত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক।

এটর্নী জেনারেল সাহেব নিজের বিবৃতির শুরুতে বলেছিলেন যে, তিনি ইসলামী আইন লংঘনের কথা কল্পনাও করতে পারেননা। তথাপি কারো দৃষ্টিতে যদি আমাদের প্রস্তাবগুলো ইসলামের পরিপন্থী বলে মনে হয়, তবে তারা যেন আমাদেরকে বুঝিয়ে দেন। আমাদের মন খোলা ও উদার। কিন্তু এর উপসংহারে তিনি বললেন যে, স্ত্রী শুধু একটা শপথযুক্ত বিবৃতি দিলেই চলবে। এই বিবৃতি ভুল না সঠিক, তার ফায়সালা করা আদালতের কাজ নয়। আদালত শুধু খুলার বিনিময় নির্ধারণ করবে এবং স্বামীর কাছে স্ত্রীর যা কিছু প্রাপ্য তা আদায় করবে। সম্ভবতঃ এ ধরনের পরিস্থিতির জন্যই এই প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল যে, "বিচার সালিস সবই মানি তবে তালগাছটা আমার।"

খুলার যেসব মামলা আমাদের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার একটি হচ্ছে খোরশেদ বিবি বনাম মুহাম্মদ আমীনের প্রসিদ্ধ মামলা। ১৯৬৬ সালের ১২ই অক্টোবর সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ বিচারপতিগণ এ মামলার যে রায় প্রদান করেন তা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া যাচ্ছে ঃ

"স্ত্রীর খুলার অধিকার রয়েছে। তবে শর্ত শুধু এই যে, তাকে এই মর্মে আদালতের বিবেককে নিশ্চিত করতে হবে যে, খুলা না হলে তার এমন দাম্পত্য জীবন যাপনে বাধ্য

হতে হবে যার প্রতি তার ঘৃণা জন্মে গেছে।"

"কুরআন শরীফের এই শর্তটি অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে যে, স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সাথে এবং নিজেদের ফরজ ও ওয়াজেব করণীয় কাজসমূহ করে একত্রে জীবন যাপন করা এখন আর সম্ভব নয়।

"সূরা বাকারার ২২৯ নং আয়াতে এবং সূরা নিসার ৩৫নেং আয়াতে একটা সাধারণ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, "বিচারকের মনে যদি আশংকা জন্মে....." এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর পক্ষে খুলার পণ নেয়া কতখানি সংগত, সেটা আদালত যাচাই করে দেখবে। বিচারকের এই ক্ষমতা দ্বারা এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, বিয়ে বিচ্ছেদের সংখ্যা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাবেনা এবং নারীরাও নির্যাতিত ও প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত হবেনা।"

"খুলার অধিকার স্ত্রীর জন্য সীমাহীন ও শর্তহীন নয় বরং একটা সীমাবদ্ধ ও শর্তযুক্ত অধিকার। বিচারক যখন নিশ্চিত হবে যে, স্বামী স্ত্রীর পক্ষে আল্লাহর সীমানা মেনে চলে একত্রে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়, কেবল তখনই এ অধিকার পাওয়া যাবে। বিচারকের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য এটা একটা পথ নির্দেশক মূলনীতি।"

"সূরা বাকারার উল্লিখিত আয়াত নারীদেরকে বিয়ে বাতিল করার দাবী জানাতে অনুমতি দেয়, বিচারককে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অঙ্গীকার দেয় এবং এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সরবরাহ করে। অনুরূপভাবে যেসব কারণে বিয়ে বাতিল করা যেতে পারে, তার একটা অতিরিক্ত কারণ ও ভিত্তি এ আয়াতে পাওয়া যায়। এ আয়াত বিচারককে ক্ষমতা দেয় যে, তিনি যেসব মামলায় সংগত মনে করবেন, স্বামীর সম্মতি ছাড়াই বিয়ে বাতিল করতে পারবেন।"

"পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের একটি ফুল বেঞ্চ বিলকীস ফাতেমা বনাম নাজমুল ইকরাম মামলার রায় দিয়েছেন যে, স্ত্রী যদি স্বামীকে তার বিয়ের সময় দেয়া অর্থ-সম্পদ ফিরিয়ে দেয়, তাহলে সে বিয়ে বাতিল করার অনুমতি পেতে পারবে। তবে সেটা এই শর্তে যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লাহর সীমা বজায় রাখতে পারবেনা বলে বিচারক আশংকা অনুভব করবেন। এই সর্বশেষ শর্তটি অত্যন্ত জরুরী। খুলার অনুমতি কেবল তখনই দেয়া হবে যখন ইসলামের নির্ধারিত দাম্পত্য সম্প্রীতির সাথে জীবন যাপন করা স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।"

"স্বামী যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের এত অবনতি ঘটেছে যে, এখন ইসলামী বিধান অনুসারে তাদের বনিবনার সম্ভাবনা আর নেই, আপোষ রফারও প্রশ্ন ওঠেনা এবং স্বামীর বিয়ের বন্ধনের আওতায় জীবন যাপন করা স্ত্রীর জন্য ক্ষতিকর, তাহলে রসূল (সঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিচারকের বিয়ে ভেংগে দেয়ার ক্ষমতা রয়েছে।"

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের এই কয়টি উদ্ধৃতিও একথাই প্রমাণ করে যে, খুলার মামলায় আদালত এত অসহায় ও অক্ষম নয় যে, সে স্ত্রীর শপথযুক্ত বিবৃতির সত্যতা নিয়ে প্রশ্নই

তুলতে পারবেনা এবং প্রয়োজনীয় ও ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে এটা তদন্তই করতে পারবেনা যে, বাস্তবিক পক্ষে কোনো বিশেষ মোকদ্দমায় বিয়ে বহাল থাকলে আল্লাহর সীমা সংরক্ষিত থাকবে কি থাকবেনা এবং এ ক্ষেত্রে বিয়ে বাতিল করার পক্ষে রায় দেয়া উচিত কি অনুচিত? বস্তুতঃ প্রত্যেক শপথযুক্ত বিবৃতির ফলে আদালতকে বিয়ে ভেংগে দিতে বাধ্য করা ইসলামী শিক্ষা, সুবিচার ও বিবেক বুদ্ধির দাবীর সাথে মোটেই সংগতিপূর্ণ নয়। এই সমস্ত আলোচনার পরও যদি কমিটি নিজের অভিমতকেই সঠিক ও বিশুদ্ধ মনে করতে থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে ও মানুষের কাছে কমিটি কি জবাবদিহী করবে, তা কমিটির সভাপতি ও সদস্যরাই স্থির করবে, যদিও এর ফলাফল গোটা জাতিকেই ভুগতে হবে। আমরা এখনো পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি যে, খুলার জন্য একটা আলাদা ও নতুন আইনের প্রয়োজনটা কি। মুসলমানদের জন্য ১৯৩৯ সালের সংশোধিত বিয়ে বিচ্ছেদ আইনে এই অবকাশ বিদ্যমান যে, শরীয়তের বিধি অনুসারে যেসব বৈধ কারণে বিয়ে বাতিল হওয়া সম্ভব, তার মধ্য থেকে কোনো কারণে স্ত্রী বিয়ে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত আদায় করতে পারে। এরপর পশ্চিম পাকিস্তান মুসলিম পরিবার আইন (১৯৬২ সালের শরীয়ত বাস্তবায়ন আইন) বিদ্যমান। এ আইন অনুসারে মুসলমানদের বিয়ে তালাক ও অন্যান্য ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয় সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা ইসলামী শরীয়তের বিধি মোতাবেক হওয়া অপরিহার্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই দুটো আইন মহিলাদের জন্য আদালতের মাধ্যমে বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট ছিল। পাকিস্তান একটা মুসলিম রাষ্ট্র এবং তার মুসলিম বিচারপতি এ ধরনের বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত। এই বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাবলে পাকিস্তানের নিম্ন ও উচ্চ আদালতসমূহ সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমাগুলোতে খুলা ও বিচ্ছেদের পক্ষে রায় দিয়ে আসছিল। এর পরে ১৯৬১ সালে বিনা প্রয়োজনে একটা মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স জারি করা হলো। সে আইনের অধিকাংশ ধারা শরীয়তের পরিপন্থী ছিল। অনুরূপভাবে ১৯৬৪ সালে পশ্চিম পাকিস্তান পরিবার আদালত আইন প্রবর্তন করা হলো। এই আইন বলে প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলোকে তালাক, দেনমোহর, ভরণ-পোষণ, শিশু সন্তান পালন ও দাম্পত্য অধিকার প্রাপ্তি সংক্রান্ত মামলার বিশেষ শুনানি গ্রহণের অনুমতি দেয়া হলো। অথচ এ সব আদালতের ক্ষমতা এত সীমিত যে, ১৯৬৪ সালের আইনের অধীন তারা কোনো বিয়ে বাতিল করার পক্ষে রায় দিলেও যতক্ষণ ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইনের অধীন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অথবা তার সমমানের ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি বা আদালতের কর্মকর্তা সেই রায়কে বলবত ও কার্যকরী করার জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ তা কার্যকরী হবেনা। এরপর খুলার অধিকার এবং অন্যান্য নারী অধিকার নিয়ে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়েছে। নারী অধিকার কমিটির সভাপতি সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইনে যে ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে দেয়া হয়েছে, তা ১৯৬৪ সালের আইন বলে প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলোকেই দেয়া হবে। আর খুলার অধিকার ১৯৬৪

সালের পারিবারিক আইনের অধীন সংশোধনীর মাধ্যমে দেয়া হবে। এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, ১৯৬১ সালের আইনটি তার সকল অনৈসলামিক ধারাসমূহসহ যথারীতি চালু থাকবে। মুসলিম সমাজ তা থেকে আর পরিত্রাণ পাবেনা।

পরিশেষে এ কথা ব্যক্ত করা সমীচিন মনে হচ্ছে যে, "নারী অঙ্গীকার কমিটির" রিপোর্ট সম্পর্কে এ যাবত যে পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, তা যদিও অন্য এক ব্যক্তির লেখা, তবে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর নজরে পড়েছে। তাঁরই পত্রিকায় এটা ছাপা হয়েছে এবং তিনি এর সাথে পূর্ণ মতৈক্যই শুধু প্রকাশ করেননি বরং খুবই পছন্দ করেছেন। পাকিস্তানের এটর্নী জেনারেলের বিবৃতির জবাবে লেখা আমার বর্তমান আলোচনাও তিনি পড়ে দেখেছেন এবং এটিকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন ও সত্যায়ন করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল ও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গও পুরো আলোচনা পড়ে দেখেছেন এবং এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। নারী অধিকার কমিটির বিজ্ঞ সভাপতি এখন পর্যন্ত শুধু ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসের তরজমানুল কুরআনে প্রকাশিত নিবন্ধেরই পর্যালোচনা করেছেন। এরপর সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যায় যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করেননি। তাঁকে অনুরোধ করি যে, এ যাবত প্রকাশিত ও আগামীতে প্রকাশিতব্য সমগ্র আলোচনা মনোযোগ সহকারে পড়ার পর সে সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করবেন। শুধুমাত্র খুলার অধিকার অর্থাৎ মহিলাদের দাম্পত্য বন্ধন থেকে মুক্তির অধিকার তো এমন কোনো মৌলিক ও প্রিয় অধিকার নয় যে, সকল মুসলিম নারী পুরুষের দৃষ্টি কেবল তার ওপরই কেন্দ্রীভূত থাকবে এবং কেবল ঐ বিষয় নিয়েই সকল আলোচনা চলতে থাকবে। [তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর, ১৯৭৬]

নারী অধিকার কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা- (৬)

নারী অধিকার কমিটির রিপোর্টের ৯২ নং ধারা পর্যন্ত পর্যালোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এবার আমরা পরবর্তী ধারাগুলো নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। ৯৩ থেকে ১০৮ নং পর্যন্ত ধারাগুলোতে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড় করানো হবে এবং তাদেরকে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা উপভোগ করার পূর্ণ সুযোগ দেয়া হবে। কমিটি স্বীয় রিপোর্টের ভূমিকাতেই এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তার ওপর ন্যস্ত বিষয়গুলো হচ্ছেঃ

> "পাকিস্তানী মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আইনগত সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হবে। কেননা এ যুগে উচ্চ শিক্ষিত কর্মকাংখী মহিলাদের পক্ষে সরকারী ও বেসরকারী চাকুরী ক্ষেত্রের পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া দুরূহ বলে মনে হয়।"

কমিটি এবং তার কর্মক্ষেত্র নির্ণয়কারী কর্তৃপক্ষ যে উচ্চ লক্ষ্য ও অভিলাষ প্রকাশ করেছেন, তার তাৎপর্য আমরা যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা হলো, নানা রকমের ব্যবস্থা

গ্রহণের পরও পাকিস্তানের মুসলিম সমাজ এখনো রক্ষণশীলতা ও অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। নারী ও পুরুষ উভয়ের পথে এখনো এমন মানসিক ও বাহ্যিক বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান, যার কারণে নারী ব্যস্ত সমাজকর্মী না হয়ে কেবল ঘরের গিন্নী হয়ে রয়েছে। আমাদের দেশে সহশিক্ষা চালু আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের একত্রে পড়ার ব্যবস্থা বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে। যারা পড়ান তাদের ভেতরেও নারী ও পুরুষ উভয়ই আছেন। ছাত্রী ও শিক্ষিকারা মুখ, চুল, পোশাক এবং শরীরের অন্যান্য সৌন্দর্যপোকরণ ঢেকে ঢুকেও চলেন না। গুরু, শিষ্য ও সহপাঠীরা পরস্পরের দৃষ্টি আনত রাখার পরিবর্তে পরস্পরে অসংকোচে ও বেপর্দাভাবে কথাবার্তা বলে ও মেলামেশা করে। এসব সত্ত্বেও যখন মেয়েরা লেখাপড়া শেষ করে, তখন সরকারী অফিসে, কলে কারখানায় ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা, রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করা এবং সভা-সমাবেশ ও মিছিলে অংশ গ্রহণ করার পরিবর্তে সোজা ঘরে গিয়ে বসে থাকে। বাইরে বের হতে এবং পুরুষদের সাথে পাশাপাশি চলতে তারা নিজেরাও সাহস করেনা, পুরুষরাও তাদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেনা। কমিটির সদস্যরা এ অবস্থা দেখে অসন্তুষ্ট। তারা এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে চান। কিন্তু এ পরিস্থিতির পরিবর্তন কোন্ কোন্ স্তরের মধ্য দিয়ে এগুবে এবং সর্বশেষ কোথায় গিয়ে উপনীত হবে, তা কোনো দূরদর্শী মানুষেরই অজানা নয়।

বিশ্বের বিরাজমান পরিস্থিতি এবং চলমান সভ্যতার মৌল মতাদর্শগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তি মাত্রেরই এ কথা জানা আছে যে, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সভ্যতা এবং লাগামহীন স্বেচ্ছাচারমূলক সংস্কৃতির মূল উপাদান ও প্রধান স্তম্ভ তিনটিঃ ১. নারী ও পুরুষের তথাকথিত সাম্য, ২. নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও জীবন মানের উন্নয়ন এবং ৩. নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা। এ তিনটে উপাদান পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর প্রতিটি উপাদান অপর প্রত্যেকটি উপাদানকে সহায়তা দেয় এবং প্রত্যেকটি অপরটি থেকে সহায়তা গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য সমাজ এই তিনটে মূলনীতিকেই খুব ভালোভাবে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে এবং যাচাই করে দেখেছে। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, নারীর সতিত্ব এবং পুরুষের চারিত্রিক সততা ও পবিত্রতা ধ্বংস হয়ে গেছে। অথচ যে অস্বাভাবিক যৌন আসক্তি উভয়কে পেয়ে বসেছে তা আর কোনক্রমেই দমিত হতে চায়না। অশ্লীলতা ও ব্যভিচার এখন প্রকাশ্যেই সংঘটিত হচ্ছে এবং নিত্য নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে। যৌনব্যাধি মহামারির রূপ নিয়েছে। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ততার নামগন্ধও দেখা যায়না। বৈধ সন্তানের জন্মের হার কমছে এবং অবৈধ সন্তানের জন্মের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। পারিবারিক শৃংখলা বিনষ্ট হওয়ার দরুণ অল্প বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে, অথচ যে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য নারী গৃহ থেকে বেরিয়েছিল বা তাকে বের করা হয়েছিল, তা এখন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার গন্ডী পেরিয়ে অর্থনৈতিক গোলামীতে পর্যবসিত হয়েছে। গৃহাভ্যন্তরের পারিবারিক জীবনে এবং গৃহ বহির্ভূত সামাজিক জীবনে

দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিভক্তি এবং মর্যাদার শ্রেণী বিন্যাস অপরিহার্য। অথচ নৈরাজ্য ও বিশৃংখলার শিকার হয়ে তা অচল ও বিপর্যস্থ হয়ে পড়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এতদসত্ত্বেও আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের অনুসারীরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। আর এই অন্ধ অনুকরণের নাম রেখেছে তারা নারী স্বাধীনতা। কেননা তাদের পশ্চিমা মনিবরা এই নামই মনোনীত করেছে।

আমরা এ বিষয় আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, ইসলাম নারীর নিজের বা তার পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নারীর ঘাড়ে ন্যস্ত করেনি। এ দায়িত্ব সে পুরুষের ওপর অথবা সর্বশেষ পর্যায়ে বাইতুল মাল তথা সরকারী কোষাগারের ওপর অর্পণ করেছে। গৃহে বসবাসকালে গৃহস্থালী দায়িত্ব পালন ও তদারক করা, ঘরোয়া কাজে পরিবারের লোকদের সাহায্য করা, দাম্পত্য জীবনে গর্ভধারণ, সন্তান পালন, শিশুকে স্তনদান প্রভৃতি নাজুক দায়িত্ব পালন করা নারীর প্রাথমিক কাজ। এগুলো তার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদার দিক দিয়ে এ দায়িত্ব পুরুষের কর্মজীবনের দায়িত্ব থেকে কোনো অংশে কম বা খাটো নয়। অনেকে বলেন, কর্মক্ষেত্রের এই বিভক্তি শুধু নগর জীবনেই সম্ভব। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদেরকে হরহামেশা গৃহের বাইরে ক্ষেত, পুকুর ইত্যাদিতে যেতে হয় এবং পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করতে হয়। কিন্তু এটা একটা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। গ্রামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবন সাধারণত নিজ গ্রামের মধ্যেই সীমিত থাকে। নারী যদি ঘরের বাইরে যায়ও, তবে সে মাহ্‌রাম পুরুষ অথবা পরিচিত মেয়েদের সাথেই থাকে ও কাজ-কর্ম করে। তাছাড়া সেখানকার জীবন এত কঠিন ও কষ্ট সাপেক্ষ যে, মেয়েদের পক্ষে সেজেগুজে বের হওয়া ও ঘুরে বেড়ানো প্রায়ই সম্ভব হয়ে ওঠেনা। বেগানা ও গায়রে মাহ্‌রাম নারী ও পুরুষ ঘন্টার পর ঘন্টাব্যাপী নিজের ঘর ও ঘরোয়া পরিবেশ থেকে দূরে এবং নিজের ঘনিষ্ঠ ও গুরুজনদের দৃষ্টির বাইরে মিলে মিশে থাকার যে পরিবেশ অফিস আদালতে, কল-কারখানায়, বা সামষ্টিক কৃষিফার্মে রয়েছে, গ্রামে এখনো তা গড়ে ওঠেনি। এ জন্য এখনো পর্যন্ত গ্রামীণ পরিবেশে মহিলারা ঘর থেকে বের হলেও একটা পরিচিত ও সীমিত পরিসরেই থাকে। তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রতারণাময় ও মোহনীয় শ্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে একেবারেই অচেনা ও দূরবর্তী কোনো জায়গায় গিয়ে গায়রে মাহ্‌রাম পুরুষদের অধীনে ও সাহচর্যে বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে কাজ করেনা। বরং ঘরের বাইরেও তারা পারিবারিক কাজকর্মই করে এবং পরিবারের সহযোগিতা করে। কিন্তু নারী অধিকার কমিটি আসলে যে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতায় ভুগছে তাহলো, যেসব "উচ্চ শিক্ষিত মহিলা" কাজ করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে অফিস-আদালতে বিরাজমান পরিবেশের সাথে কিভাবে খাপ খাওয়ানো যায়? কমিটির রিপোর্টের ৯৩ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ

"দেশে শিল্পের প্রসার এবং ক্রমবর্ধমান উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারীকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।"

এখন প্রশ্ন হলো, পাকিস্তানের মুসলিম নারীকে যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের

জন্য কমিটি উদ্বুদ্ধ করছে সেটি কি? এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত বিবরণ আমরা রিপোর্টের ৯৬ ও ৯৭ নং ধারায় পাই। যথা ঃ

"ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, গৃহাভ্যন্তরে মহিলাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যস্ততা, বিশেষতঃ ছোট শিশু পালনের বাধ্যবাধকতা গৃহের বাইরে খন্ডকালীন বা পূর্ণকালীন চাকুরী করার পথে একটা মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দেশে সরকারী শিশু সদন এবং দিবাকালীন শিশু তদারকী কেন্দ্র না থাকা এমন একটি ব্যাপার, যা মহিলাদেরকে নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক কোনো চাকুরী করতে নিরুৎসাহিত করে। এ জন্য কর্মজীবী মায়েদের জন্য সরকারী শিশু সদন প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত জরুরী।"

এর অর্থ দাঁড়ালো এই যে, যেসব মহিলা শিক্ষিতা এবং বাড়ীর ভেতরের কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত না খেটে বাড়ীর বাইরে কলকারখানা ও অফিস-আদালতে চাকুরী অনুসন্ধানে ইচ্ছুক কিংবা প্ররোচিত তারা যদি গায়রে মাহরাম পুরুষদের কুনজর বা লাম্পট্যের শিকার হয় এবং শরীয়ত ও নৈতিকতার সীমা পদদলিত হয়, তাহলে নারী অধিকার কমিটির তা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা হবেনা। তবে কমিটির এ চিন্তা অবশ্য থাকবে যে, এ ধরনের মহিলারা চাকুরে হওয়ার সাথে সাথে যদি সন্তানের মাও হয়ে যায়, তাহলে সন্তানদের দেখাশুনা কে করবে? কেননা আমাদের দেশে সরকারী শিশু সদন বা শিশু তদারক কেন্দ্র নেই, যেমনটি পাশ্চাত্য এবং বিশেষতঃ সমাজতান্ত্রিক দেশে রয়েছে। এ ধরনের শিশু পালন কেন্দ্রের অভাব নারীদের চাকুরী নিরুৎসাহিত করার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবেনা।এ সমস্যার সমাধানের জন্য কমিটি ৯৮ নং ধারায় প্রস্তাব করেছে যে,

"১৯৬৫ সালে চাকুরীরতদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য যে অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়, তার আওতায় একটা সামাজিক নিরাপত্তা স্কীম চালু করার মাধ্যমে সকল শহরে সরকারী শিশু পালন কেন্দ্র, দিনের বেলায় দেখাশুনা করার কেন্দ্র ও নার্সারী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা উচিত।"

কমিটির প্রস্তাবিত এইসব সরকারী শিশু সদন বা সরকারী নার্সারীগুলোকে ইংরেজীতে ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায় "ক্রেশ" (CRECHE) বলা হয়। নারী অধিকার কমিটির রিপোর্টের ইংরেজী ভাষ্যেও এই শব্দটির ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি আসলে (CRECHE) "ক্রেচ" এর উন্নত রূপ, যা গৃহপালিত জীবজন্তুর খাদ্য, দুধ, পানি ইত্যাদি রাখার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বাড়ীর বাইরে রাখা হয়। পাশ্চাত্য সমাজে যেহেতু ডারউইন, ফ্রয়েড ও তাদের অনুসারীরা মানুষকে পশুর, এমনকি ক্ষেত্র ভেদে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট স্থান দিয়েছে, তাই অফিস আদালতে ও ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলোতে নারী,পুরুষ, গর্ভধারিণী, স্তন্য দানকারিণী সবাইকে একত্রিত করে পশুর মত কাজে জুড়ে দেয়া এবং পশুশাবকদের মতই তাদের শিশু সন্তানদের মায়েদের কাছ থেকে আলাদা করে নিকটবর্তী কোনো খোয়াড়ে রেখে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা তাদের কাছে

দোষের কিছু নয়। এ কারণেই জীব-জানোয়ারের পানাহারের পাত্রের জন্য পাশ্চাত্যবাসী যে নাম মনোনীত করেছে, চাকুরীরত মহিলাদের শিশু সদনের জন্যও তারা সেই নামই পছন্দ করেছে। আর নারী অধিকার কমিটিও এই নাম গ্রহণ করে তাদের নারী অধিকার প্রীতির প্রমাণ দিয়েছে। এরপর প্রত্যেক মুসলমান বিশেষতঃ আমাদের মহিলারা ভালোভাবেই বুঝতে পারবে যে, তাদেরকে এবং তাদের শিশু সন্তানদেরকে ঘর থেকে বের করে কি ধরনের পরিবেশ এবং কি ধরনের ব্যবস্থার কাছে সোপর্দ করার চেষ্টা চলছে। এরই নাম যদি হয় স্বাধীনতা তবে আল্লামা ইকবাল এই স্বাধীনতার সম্পর্কেই বলেছেন ঃ

"পাশ্চাত্য তোমাকে এমন স্বাধীনতা দিয়েছে
যা বাহ্যত স্বাধীনতা, কিন্তু আসলে বন্দীদশা।"

নারী অধিকার কমিটি কোনো আগপাছ না ভেবেই "সরকারী শিশু সদন" প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করলো। কিন্তু ঐসব শিশু সদন নারীদের কর্মক্ষেত্র থেকে কত দূরে স্থাপন করা হবে, অফিস ও কারখানার সংখ্যার সাথে ঐ সব শিশু সদনের সংখ্যার অনুপাত কেমন হবে, ওগুলোতে কত বয়সের বাচ্চাদেরকে রাখা হবে, তাদেরকে রাতদিনভর ওখানে রাখা হবে, না শুধু রাত বা শুধু দিনের বেলা রাখা হবে, তাদের মায়েরা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন তাদের সাথে কোন্ কোন্ সময়ে কতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষাতের অনুমতি পাবে, এ সব প্রশ্নের কোন সমাধান দেয়নি। সম্ভবত কমিটির সদস্যদের মাথায় এসব প্রশ্নের কোন সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট জবাব নেই। তারা হয়তো "ক্রেশ" শব্দটা কোথাও থেকে শুনেছে ও পড়েছে। তারপর তোতা পাখির মত তা আবৃত্তি করেছে। এ জন্য আমরা ঐ কমিটির ও অন্যান্য পাঠকের সুবিধার্থে এবং তাদের জ্ঞানভান্ডারকে আরো তথ্যসমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের এ জাতীয় শিশু সদন সংক্রান্ত একটা রিপোর্ট থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে দিচ্ছি।

রিপোর্টটি The family and the sexual Revolution "পারিবারিক ও যৌন বিপ্লব" নামক বই এর "সোভিয়েট ইউনিয়নের কর্মজীবী মায়েরা" শিরোনাম যুক্ত অধ্যায় থেকে গৃহীত। বইটি ইংল্যান্ডের জর্জ এলিন এন্ড আনভিন কর্তৃক প্রকাশিত। প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উল্লিখিত রিপোর্টের লেখক স্বয়ং রাশিয়ায় গিয়ে এবং সেখানে অবস্থান করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গী বিরোধীসুলভ নয়, বরং সমমনাসুলভ ও সহানুভূতিসূচক। এই বই এর ২৮৫ থেকে ২৯১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিনি শিশুদের সামষ্টিক প্রতিপালন কেন্দ্রের জন্য ক্রেশ শব্দই প্রয়োগ করেছেন এবং এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে "ক্রেশ"কে একটা অনিবার্য অথচ দুঃখজনক প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া স্বীয় সমাজতান্ত্রিক জীবন পদ্ধতি এবং তাদের প্রচলিত সামষ্টিক বসবাস রীতির প্রেক্ষাপটে এই শিশু সদনগুলোকে অত্যন্ত পছন্দনীয় ও সমাজতন্ত্রের অপরিহার্য অংগ বলে গণ্য করে থাকে। পাশ্চাত্যে শিশু পালনের যেসব

মতবাদ ও মানদন্ড প্রচলিত আছে, মায়েদের চাকুরী করা তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অথচ এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বীকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সম্পূর্ণ অনুকূল। রুশ পত্রিকা "সোভিয়েত ইউনিয়ন"-এ গেলিনা নাম্নী জনৈক মহিলার চিঠি ছাপা হয়েছে। এতে সে বলেছে যে, "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আমি আমার চাকুরী ছেড়ে গৃহস্থালী দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত কি না? তাহলে আমি বলবো, না, আমি তা পারবোনা। কারখানায় আমরা একটা বৃহৎ পরিবারের সদস্য হয়ে গিয়েছি। সেখানে আমার বন্ধু অন্তরংগ বন্ধু এবং অত্যন্ত সদয় কমরেড হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ লোকেরা ছাড়া একটা আদর্শ সোভিয়েত পরিবারের সকলেই সকালে নাস্তা করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। মা ছোট শিশুদেরকে সাথে নেয় এবং নিজের কর্মক্ষেত্রের নিকটে অবস্থিত শিশু সদনে সোপর্দ করে। এখানে ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য সেবক সেবিকা শিশুর দেখাশুনা করে। মা জানে যে, তাকে প্রয়োজনের সময় ডাকা হতে পারে। প্রতি সাড়ে তিন ঘন্টা অন্তর শিশুকে দুধ খাইয়ে আসার জন্য তাকে অনুমতি দেয়া হয়। এ জন্য তাকে আধা ঘন্টা ছুটি দেয়া হয় এবং এ সময়টুকু চাকুরীর মধ্যে গণ্য হয়। শিশুর অসুখ বিসুখ হলে তাকে তার সেবাশুশ্রূষার অনুমতি দেয়া হয় এবং বেতন কাটা হয়না।

সাত ঘন্টা কাজ করার পর মা শিশুকে নিজের সাথে করে বাড়ীতে নিয়ে যায়। সেখানে গোটা পরিবার পুনরেকত্রিত হয়।[১] শিশুদেরকে এইসব শিশু সদনে সমবায়ের শিক্ষা দেয়া হয়। যেসব শিশু বাড়ীতে একাকী পালিত হয়ে থাকে, তাদেরকে যতক্ষণ সাম্যভিত্তিক জীবনে অভ্যস্ত করা না হবে এবং তাদের ভেতর থেকে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা উচ্ছেদ না হবে, ততক্ষণ তারা নিছক সমাজের ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকে। তাদের মতে আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতা একাকী ও নির্জন পরিবেশে লালন পালনের কারণে জন্মে থাকে।[২] যে কর্মজীবী মহিলার শিশু সন্তান আছে, তাকে ১১২ দিনের ছুটি দেয়া হয় এর মধ্য থেকে ৫৬ দিন সন্তান ভূমিষ্ট হবার আগে এবং বাকী ৫৬ দিন সন্তান ভূমিষ্ট হবার পরে ভোগ করা হয়।[৩] ডাক্তারের সুপারিশে ছুটি আরো বাড়ানো যায়। গর্ভবতী ও স্তন দাত্রী মহিলাদেরকে ওভারটাইম এবং নৈশকালীন কাজের আদেশ দেয়া হয়না এবং ভারী বোঝাও বহন

---

১. অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, শিশু যদি মায়ের বুকের দুধ না খায় এবং মাকে রাতের শিফটে কাজ করতে হয়, তাহলে শিশু রাত্রেও বাড়ীতে আসতে পারেনা। আর যদি মা-বাবা রাত্রিবেলা ক্লাবে বা বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যায়, তাহলেও এই একই অবস্থা হয়।

২. অর্থাৎ কি না এই ফ্যাক্টরী থেকে প্রত্যেক শিশু বাটারজুতোর মত একই মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ছাঁচে ঢালাই হয়ে বের হওয়া চাই এবং তাদের ভেতরে কোনো স্বাতন্ত্র যেন না থাকে।

৩ মস্কো থেকে প্রকাশিত "সওয়াল ও জওয়াব"-এর ২৮১ পৃষ্ঠায়ও এ কথাই বলা হয়েছে যে, যে মেয়ের শিশু সন্তান আছে, তাকে সন্তান প্রসবকালে ১১২ দিন এবং তারপরে কাজের সময় সাড়ে তিন ঘন্টা পর পর আধ ঘন্টা দুধ খাওয়ানোর ছুটি দেয়া হয়।

করতে দেয়া হয়না। তাদেরকে হালকা কাজ দেয়া হয়। তাদের বেতন কমানো এবং চাকুরীচ্যুত করা বেআইনী। তবে নারী পুরুষের সমানাধিকারের আইন পারিবারিক জীবনে অচল। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী খরিদ করা, রান্না করা, এবং বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ বহুলাংশে নারীকেই করতে হয়। নারী ও পুরুষের জন্য কার্যকাল সমানই রাখা হয়েছে। কিন্তু পুরুষের তুলনায় মহিলাদের দ্বিগুণ সময় কেনাবেচা ও যাতায়াতে এবং চতুর্গুণ সময় ঘরোয়া কাজকর্মে ব্যয় হয়। এভাবে বিশ্রাম, ঘুম, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য মহিলারা পুরুষদের চেয়ে চার ঘন্টা কম সময় পায়। মা আপন সন্তানের দেখাশুনা ও লালন পালনের জন্য বাড়ীতে প্রতিদিন আধঘন্টা এবং বাবা মাত্র ১৫ মিনিট সময় দিয়ে থাকে। বাড়ীর ঝাড়ামোছার কাজে মহিলারা দৈনিক সোয়া ঘন্টা এবং পুরুষ মাত্র ষোল মিনিট দিয়ে থাকে। রান্না ঘরে মহিলারা দৈনিক প্রায় আড়াই ঘন্টা এবং পুরুষরা ১৫ মিনিট ব্যয় করে।"

সবার শেষে প্রবন্ধকার লিখেছেন ঃ

"সোভিয়েত রাশিয়ার চাকুরীজীবী মায়ের ওপর থেকে সন্তানের তদারকীর বোঝা হাল্কা হয়েছে বটে। কিন্তু সাংসারিক কাজকর্মের বোঝা হাল্কা হয়নি। অন্য কথায় বলা যায় যে, কর্মজীবী মায়ের সমস্যা খানিকটা মিটেছে। কিন্তু কর্মজীবী স্ত্রীর সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি।"

এতো গেল মহিলাদের অফিস-আদালত ও কল-কারখানায় চাকুরী এবং শিশুদের যৌথ শিশু পালন কেন্দ্রে লালন-পালনের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক। এ দিকের সঠিক হিসাব-নিকাশ ও লাভ-লোকসান জানতে হলে আগে এই সব শিশু সদন ও তার তত্ত্বাবধায়কের ওপর জাতীয় কোষাগার থেকে সর্বমোট কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, তার আনুমানিক হিসাব জানা চাই। তবে এই ব্যাপারটার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক রয়েছে তা এতই বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক যে, মস্তিষ্কের পক্ষে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ও লেখনীর পক্ষে তা লিখে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। তথাপি স্বয়ং পাশ্চাত্যের গ্রন্থকাররাই এর ফলাফল ও তজ্জনিত পরিস্থিতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করে দিয়েছেন। আমাদের দেশে নারী অধিকারের যে ভড়ং চলছে, তা যদি এভাবে চলতেই থাকে, তাহলে আমরা বাধ্য হয়ে সেই দিকটির ওপর থেকে আবরণ খুলে ফেলতে বাধ্য হবো এবং দেখিয়ে দেবো যে, এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মহিলাদের সতিত্ব ও মানবীয় মানসম্ভ্রম কি সাংঘাতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে।

কিছুক্ষণের জন্য যদি এর নৈতিক দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেই এবং শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীটাই সামনে রাখি, তবুও সমানাধিকার ও নারীর প্রতি সুবিচারের দাবী এটা হতে পারেনা যে, তার কাছ থেকে দ্বিগুণ খাটনি আদায় করতে হবে। এটা কোনো ইনসাফের কথা হতে পারেনা যে, তাকে দিয়ে ঘরের কাজও করানো হবে, আবার বাইরে গিয়ে আয়-রোজগারের দায়িত্বও তার ওপর চাপানো হবে। আর এই আয়-রোজগারের

পথে যদি তার সহজাত নারীসুলভ অক্ষমতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নিছক কয়েকটি অস্বাভাবিক ও দায়সারা গোছের ব্যবস্থা প্রয়োগ করে তার সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এই দায়সারা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে চাকুরীজীবী মহিলাদেরকে তিন বা চার মাসের জন্য সন্তান প্রসব ও নবজাতককে দুধ খাওয়ানোর বাদে সবেতন ছুটি প্রদান, তারপর তাদের শিশুদেরকে তাদের কর্মস্থল সংলগ্ন শিশু সদনে রাখা, আর যখন তারা ক্ষুধার জ্বালায় চেঁচাবে, তখন লাল পতাকা নাড়ানো এবং নাড়ানোর সাথে সাথে মায়ের ছুটে গিয়ে বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে আবার কর্মক্ষেত্রে হাজিরা দেয়া। এ ধরনের মানবীয় ডেয়ারী ফার্মে যে বংশধর লালিত পালিত হবে, তা সমাজতন্ত্রী বা পুঁজিবাদী দোপায়া জন্তু হলেও হতে পারে, কিন্তু স্নেহ মমতা ও ধৈর্য সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত মানুষ কিংবা খোদাভীরু মুসলমান কখনো হতে পারেনা। ইসলাম তো স্বয়ং মুসলিম স্বামীকেই স্ত্রীর জন্য জীবিকা উপার্জনের শিক্ষা দিয়েছে। এমনকি তালাক দিলেও ইদ্দত চলাকালে তালাক প্রাপ্তরা যাবতীয় ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে হবে। শিশু সন্তান থাকলে তাকে মায়ের কাছেই রাখতে হবে এবং সে অবস্থায়ও শিশুর খরচ স্বামীকেই বহন করতে হবে, কিন্তু নারী অধিকার কমিটি নারীকে এরূপ উল্টো শিক্ষা দিচ্ছে যে, তুমি যাও এবং অজানা অচেনা পুরুষদের অধীন ও তাদের পাশাপাশি বসে নিজের জীবিকা নিজেই সন্ধান কর।

এই কমিটি বারংবার ঘোষণা করেছে যে, আমরা নারীকে শুধু সেই সব অধিকার দিতে চাই, যা ইসলাম তাদেরকে দিয়েছে, কিন্তু পুরুষরা ছিনিয়ে নিয়েছে। অথচ এ কমিটির প্রতিটি প্রস্তাব পাশ্চাত্যের নির্লজ্জ ও একেবারেই নির্বোধসুলভ অনুকরণ। এ কথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবেনা যে, আমাদের দেশে এখনো লক্ষ লক্ষ উচ্চ শিক্ষিত যুবক বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের আগে সেই সব উচ্চ শিক্ষিত পুরুষদেরকে চাকুরী দেয়া বেশী জরুরী নয় কি? তারাও তো কোনো না কোনো মায়ের ছেলে, কোনো না কোনো বোনের ভাই অথবা কোনো না কোনো স্ত্রীর স্বামী হতে পারে। তাদের চাকুরী দিলে কি বহু সংখ্যক অসহায় নারীর সহায়তা হয়না? তাছাড়া তাদের ব্যাপারে শিশু পালন ও সন্তান প্রসবের কোনো সমস্যাও নেই। অথচ নারী অধিকার কমিটি তাদের নিয়ে এতটা বিব্রত নয় যতটা "শ্রমজীবী মায়েদের ও তাদের শিশুদের সরকারী সদন" নিয়ে। এর কারণ এই যে, পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোতে প্রত্যেক কর্মচারী ও কর্মকর্তার পাশে একজন মহিলা সচিব নিয়োজিত রয়েছে এবং প্রত্যেক অফিসে পুরুষের পাশপাশি নারী বিরাজমান। কিন্তু আমাদের দেশে এমন "অন্ধকার" ছেয়ে আছে যে, প্রদীপ নিয়ে খুঁজলেও কোনো কারখানায় বা অফিসে কোনো মহিলা বিশেষতঃ শিক্ষিত মহিলা খুঁজে পাওয়া কঠিন।[১]

নারী অধিকার কমিটি "চাকুরীজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ১৯৬৫ ছাড়া ১৯৫৮ সালের একটি অর্ডিন্যান্সেও সংশোধনীর প্রস্তাব করেছে। এ অর্ডিন্যান্সটির

---

[১] ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের যথার্থই এই অবস্থা ছিল। কিন্তু এখন ১৯৮৫ সালে পাকিস্তানের প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য অফিসে মহিলা আছে। (সম্পাদক)

ইংরেজী শিরোনাম হচ্ছে Maternity benefits Ordinance ("সন্তান প্রসব সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা") ১৯৫৮ সালের এ আইনটি শুধুমাত্র ১৯৩৪ সালের কল-কারখানা সংক্রান্ত আইনের (ফ্যাকটরী এ্যাক্ট) আওতায় কারখানা হিসাবে গণ্য এবং অন্ততঃ পক্ষে বিশজন কর্মচারী সম্বলিত কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নারী অধিকার কমিটির ইচ্ছা হলো, যেসব প্রতিষ্ঠানে দশজনের বেশী কর্মচারী আছে, সেখানে ১৯৫৮ সালের আইনটি প্রয়োগ করে সেখানকার মহিলা কর্মচারীদের ঐ আইনে প্রদেয় মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা আদায় করা হোক। কিন্তু সাথে সাথেই কমিটির সদস্যদের মনে পড়ে গেল যে, এভাবে তো অনেক সন্তান জন্ম নেবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী তাতে মাঠে মারা যাবার যোগাড় হবে। এ জন্য কমিটি ১০১ নং ধারায় এ সমস্যার নিম্নরূপ সমাধান উদ্ভাবন করেছে ঃ

> "কমিটির দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, যেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর সংখ্যা দশের ওপরে, সেখানে কর্মরত মহিলাদের সন্তান প্রসবের সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি দেখা যায়না। তথাপি এ ধরনের সুযোগ-সুবিধা অবাধে সম্প্রসারিত করলে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীতে তার যে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, সে সম্পর্কে কমিটি সচেতন। তাই তার মতে, তিনটের বেশী সন্তানের ক্ষেত্রে এই সব সুযোগ-সুবিধা দেয়া উচিত নয়।"

কমিটি যদি পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে ভালোমত পরামর্শ করে তাদের নির্দেশ নিয়ে নিত, তাহলে বোধহয় ভালো হতো, কেননা আমাদের ধারণা, একাধারে তিন তিনটে সন্তানের জন্ম শুধু মেনে নেয়া নয় বরং সেজন্য নারীকে সন্তান প্রসবের সাথে সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধাও দিতে উৎসাহিত করা পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে সাথে পুরোপুরি মানানসই নয়। এর পরিবর্তে বরং এরকম হওয়া উচিত ছিল যে, দশ বছরের কম সময়ের মধ্যে নারী যদি আরো একটা সন্তান প্রসব করে বসে, তবে তার ওপর জরিমানা আরোপ অথবা বেতন হ্রাস অথবা অন্ততপক্ষে তাকে সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হবে। সম্ভবত প্রাথমিক পর্যায়ে কমিটি এতদূর পর্যন্ত যাওয়া সমীচীন মনে করেনি এবং এটাকে হয়তো দ্বিতীয় স্তরের জন্য রেখে দিয়েছে।

নারী অধিকার কমিটি যেহেতু বারবার ইসলামের নামও নিয়ে থাকে, তাই পরিশেষে আমরা শরীয়তের একটি বিধির প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী মনে করছি। সেটি হলো, খোদা না করুন, কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে তার জন্য স্বামী গৃহে বসেই মৃত্যুজনিত ইদ্দত পালন করা বাধ্যতামূলক। অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হওয়া তার জন্য বৈধ নয়। এ ধরনের মহিলা চাকরিজীবী হলে প্রচলিত আইনে তাকে এই ইদ্দত পালনের জন্য ছুটি দেয়ার কোনো অবকাশ নেই। এই ইদ্দতের মেয়াদ অগর্ভবতীর জন্য চার মাস দশ দিন আর গর্ভবতীর জন্য সন্তান প্রসব পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এটা একটা মারাত্মক ত্রুটি। আমাদের জানা মতে, এমন বহু মহিলা আছে যারা

শরীয়ত সম্মতভাবে মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত ছিল। তাদের এরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তারা ইদ্দত পালনের জন্য ছুটির আবেদন করলে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যে শাসন ব্যবস্থায় বিধবার এই সুস্পষ্ট ইসলামী অধিকার পদদলিত করা হয়, তার কর্মকর্তারা কোন্ মুখে মহিলাদের ইসলামী অধিকার সংরক্ষণের বুলি আওড়াতে পারেন? [তরজমানুল কুরআন, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭]

নারী অধিকার আন্দোলন ঃ কারণ ও ফলাফল- (৭)

সরকার প্রতিষ্ঠিত নারী অধিকার কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আমাদের সমালোচনা ও পর্যালোচনা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে। তবুও এ বিষয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা এখনো বাকী রয়েছে। এ যাবতকার আলোচনায় লক্ষ্য রাখা হয়েছে যেন বক্তব্যকে অতিমাত্রায় দীর্ঘ না করা হয় এবং কমিটি নিজের সুপারিশগুলোর যে অংশটুকু ক্রমিক ধারার আকারে প্রণয়ন করেছে, তার মধ্যেই আলোচনাকে যথাসম্ভব সীমিত রাখা হোক। কিন্তু এই রিপোর্টের পেছনে যে সাংস্কৃতিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদসমূহ সক্রিয় রয়েছে, যার স্বাদ এই মতবাদসমূহের ধারকবাহকরা খুব ভালোভাবেই উপভোগ করেছে, তার একটু বিস্তারিত বিবরণ না দেয়া পর্যন্ত বিষয়টির প্রকৃত রূপ উদ্ভাসিত হবেনা। এ জন্য এই পটভূমিতে সামান্য কিছু ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে।

বস্তুত, যে ধরনের সুপারিশ এই কমিটি করেছে, তার পেছনে যেমন কোনো সত্যিকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তা সক্রিয় ছিলনা, তেমনি তা দ্বারা কোনো বেইনসাফীর প্রতিকার কিংবা কোনো ত্রুটির সংশোধনও কাম্য ছিলনা। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল শুধু এই যে, পাশ্চাত্যের নারী এককভাবে কিংবা পুরুষের সাথে যেসব পথে বিপথে এবং যেসব চড়াই উৎরাইয়ে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাকিস্তানের মুসলিম নারীরাও সেই সব পথে-বিপথে ঘুরে বেড়াক এবং পাশ্চাত্যের নারী সমাজ যে শোচনীয় পরিণতির শিকার হয়েছে, পাকিস্তানী মহিলারও তার শিকার হোক। এ রিপোর্টে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্বলিত সুপারিশমালা রয়েছে, তার ভেতরে একটিও এমন নেই যা পাশ্চাত্য সমাজে পরীক্ষিত হয়নি এবং যার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে সেখানকার প্রতিটি মানুষের মন চরম বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠেনি। আমাদের দেশের যেসব লোক এই সব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি চায়, তারা এসব ফলাফল সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, না তারা জেনে শুনেই পাশ্চাত্যে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে এখানেও তা সৃষ্টি করতে চায়, তা আল্লাহই ভালো জানেন?

আমরা মনে করি, অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য ঘেষা একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছাড়া পাকিস্তানের মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ চাই শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত। পুরুষ হোক বা মহিলা, ধর্ম ও নৈতিকতার দিক দিয়ে কিছুটা শৈথিল্য ও উদাসীনতার শিকার হলেও তাদের আদত অভ্যাস ও চালচলন একেবারেই বিকৃত হয়ে যায়নি এবং আল্লাহর রহমতে তারা ধর্মীয় জ্ঞান ও চেতনা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে বসেনি। তাই তাদেরকে যদি জানিয়ে

দেয়া হয় যে, পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লব এবং রাশিয়া ও ফ্রান্সের রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলী থেকে সাম্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার যে অসার ও বিভ্রান্তিকর শ্লোগানগুলোর উৎপত্তি হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে পৃথিবীতে স্বর্গ রচনার যে গালভরা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তার সবই মরিচীকার চেয়েও অসার প্রমাণিত হয়েছে এবং অবশেষে গোটা পৃথিবীকে নরককুন্ডে পরিণত করেছে, তাহলে আশা করা যায় যে, মুসলমানরা তা থেকে শিক্ষা লাভ করবে। এই আশা নিয়েই আমি এখানে পাশ্চাত্যের কতিপয় চিন্তাবিদের কিছু লেখা পর্যায়ক্রমে উদ্ধৃত করছি এবং তার মাধ্যমে দেশবাসী ভাইবোনদেরকে চিন্তা-ভাবনার আহবান জানাচ্ছি।

সর্বপ্রথম আমি ইউনিভার্সাল লাইব্রেরী প্রকাশিত একখানি বই থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এ বইখানার নাম "Modern Woman- The Lost Sex"

এ বইখানা সম্পর্কে পয়লা উল্লেখযোগ্য কথা হলো, এটি একজন পুরুষ ও মহিলার যৌথ রচনা। এ জন্য এ কথা বলার উপায় নেই যে, এটা কেবল পুরুষালি কিংবা মেয়েলি দৃষ্টিভঙ্গী সম্বলিত। এ বইখানা অনেকটা ভারসাম্যপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত। পুরুষ লেখকটির নাম কার্ডিনান্ড লিন্ড বার্গ। ইনি একাধারে একজন সাংবাদিক, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক জীবনীলেখক এবং ইতিহাস ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক। মহিলার নাম মারিনিয়া এফ, ফারণহাইম। ইনি মনস্তাত্ত্বিক ও স্নায়ুবিক রোগের দক্ষ চিকিৎসক। ইনি বেসরকারী পর্যায়ে চিকিৎসা করেন এবং নিউইয়র্কের একটি সরকারী হাসপাতালের সাথে যুক্ত। লন্ডন ও ভিয়েনার একাধিক হাসপাতাল থেকে তিনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং একাধিক সন্তানের জননী। প্রায় পাঁচশ' পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বই-এর ভূমিকায় ও পরবর্তী একাধিক অধ্যায়ে জায়গায় জায়গায় "নারী পুরুষের সমতার ধারণাকে খন্ডন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষকে সর্বদিক দিয়ে সমান আখ্যায়িত করার অত্যন্ত মারাত্মক ফলাফল দেখা দিয়েছে। ৩য় পৃষ্ঠার এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

> "নারী সত্তা পুরুষ সত্তার চেয়ে জটিল। নারীকে সৃষ্টিকর্তা প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির উপযুক্ত একটা স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম দৈহিক কাঠামো দিয়েছেন, যা পুরুষের দেহ কাঠামোর সাথে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যহীন। নারীর স্নায়ুবিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাও অত্যন্ত জটিল ও গভীর এবং তা পুরোপুরিভাবে প্রজননকেন্দ্রিক। একটা সরলরেখার সাথে যেমন গোল ও বক্র রেখার কোনো সাদৃশ্য নেই, তেমনি পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যেও কোনো সাদৃশ্য নেই।"

এরপর ৪-৫ পৃষ্ঠায় দেখানো হয়েছে যে, রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর নারীবাদী আন্দোলন (Feminism) অত্যন্ত তীব্র গতিতে চালানো হয় এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সব রকমের লাগামহীনতা ও উদ্দাম স্বেচ্ছাচারীতার প্ররোচণা দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সালের পর সহসা এই নীতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। স্বাধীন ও অনানুষ্ঠানিক বিয়েতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। তালাকপ্রাপ্তিকে কার্যত অসম্ভব করে তোলা হয়।

গর্ভপাতকে অবৈধ গণ্য করা হয়। সন্তানহীনা নারীকে অপছন্দ করা হতে থাকে। সর্বোপরি পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্টসমূহ ও তার পবিত্রতাকে সরকারীভাবে প্রশংসা করা হতে থাকে।

১০ পৃষ্ঠায় আধুনিক মহিলাদের চরম দূরাবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এভাবেঃ

"আধুনিক যুগের নারীর কাছে এত পরস্পর বিরোধী দাবী তোলা হয়েছে যে, সে অস্থির, হতবুদ্ধি ও দিশাহারা হয়ে পড়েছে। যতক্ষণ তার ধড়ে প্রাণ আছে, রকমারি ব্যস্ততার মধ্যে সে তীব্র প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। এ যুগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। তাকে বাইরের পরিবেশে টেনে আনার একটা উপকরণ তো হচ্ছে শিল্প বিপ্লব ও যান্ত্রিক বিপ্লব। অপর উপকরণ হচ্ছে সেই সব বিজ্ঞ তাত্ত্বিক বোনেরা, যারা তাকে টেনে হিঁচড়ে এই প্রতিযোগিতা সর্বস্ব ময়দানে নিয়ে এসেছে। এখানে প্রতিযোগিতা অনিবার্য এবং এখন এ প্রতিযোগিতা পুরুষদের চেয়ে স্বয়ং মহিলাদের সাথেই বেশী। এক সময় নিজের স্বামীর ওপর তার পূর্ণ আস্থা ছিল এবং বিচ্ছেদের সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। কিন্তু এখন সে জানে যে, কিছু সংখ্যক মেয়ে আছে যারা স্টেনোগ্রাফার বা সেক্রেটারী হিসেবে কর্মরত, কেউ আছে অন্যের ব্যক্তিগত আদত অভ্যাস সন্ধান করে বেড়ায় কিংবা মডেল হতে চায়, ফ্যাশনের নিত্যনতুন ডিজাইন উদ্ভাবন করে বেড়ায় কিংবা বিনা কারণেই পুরুষদের দিকে তাকাতে থাকে। এসব মহিলাদের সকলেই বিবাহিত নারীর স্বামীর সন্ধানে থাকে এবং তাকে কেড়ে নিতে চায়। ছোট গল্প, উপন্যাস ও সিনেমার বিষয়বস্তুও এটাই। কেননা বাস্তবেই তাই হচ্ছে। তার যদি স্বামী না থেকে থাকে এবং সে জীবনসংগীর সন্ধানে থেকে থাকে, তবে তার এ কথা জানা আছে যে, যে জিনিস সে খুঁজছে, তার সন্ধানে আরো বহু মহিলা ব্যাপৃত হয়েছে। নারীদের কোনো ঠিকানা নেই, তারা কোথাও নিরাপদ নয়। বরং তারা দলে দলে শিকার ধরা এবং স্থানাভাবে নিজে শিকারে পরিণত হওয়ার জন্য চারদিকে হণ্যে হয়ে ঘুরছে। এসব নারী যেহেতু সহজ লভ্য এবং যৌন ব্যাপারে কোনো নৈতিকতার ধার ধারেনা, তাই পুরুষরা তাদের সাথে কোনো চূড়ান্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে ও বনিবনা রক্ষা করে চলতে প্রস্তুত হয়না। এ জন্য মহিলারা নিজেদের মধ্যে যথাসম্ভব বেশী করে আকর্ষণ সৃষ্টি করার ও সৌন্দর্য চর্চার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। অপর দিকে রুজী-রোজগারের প্রতিযোগিতায় নারীদের মোকাবিলায় নারী-পুরুষ উভয়ই রয়েছে। এ প্রতিযোগিতা অত্যন্ত নির্দয় এবং প্রাণঘাতী হয়ে থাকে। অফিস-আদালত ও কলকারখানার রাজনীতিতে অফিসার ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের প্রতিযোগিতার সাথে সাথে নারী ও পুরুষের রাজনীতিও যুক্ত হয়ে যায়। এমন কঠিন ও বহুমুখী প্রতিযোগিতা মহিলাদেরকে সবসময় উদ্বেগাকূল করে রাখে।"

আধুনিক সভ্যতা যে মহিলাদের মধ্যে এ ধরনের মানসিক অস্থিরতা ও স্নায়ুবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে দিয়েছে, বই এর লেখকদ্বয়ের মতে, এটা হলো পাশ্চাত্য সমাজকে

অতি দ্রুত গ্রাস করতে উদ্যত মানসিক রোগসমূহ, অপরিণত বয়সের অপরাধ, সমাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্রোহ এবং মানসিক অশান্তি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর তৃতীয় অধ্যায়ের ৭১ পৃষ্ঠায় উপসংহার টানা হয়েছে এভাবে ঃ

এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া গত্যান্তর থাকেনা যে, সুখ-শান্তি ও আনন্দ যে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে, তার কারণ দারিদ্র, রোগব্যাধি, শারীরিক বৈকল্য বা আত্মীয়-স্বজনের অভাব নয়। এসব কারণ তো কেবল দুঃখই বাড়িয়ে তোলে। বস্তুতঃ শুধুমাত্র স্নায়ুবিক বৈকল্যের ফল ও তার বাহ্যিক প্রতিফলন হিসেবে সুখ-শান্তি ও আনন্দ হারিয়ে যাচ্ছে। উল্লিখিত স্নায়ুবিক বৈকল্য ও বিকারের উৎপত্তি হয় শৈশবে বেমানান ও অসংগতিপূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশ থেকে, যার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। মহিলারা ও মায়েরাই মূলতঃ এই বিকৃতির জন্য দায়ী।"

এরপর "Destruction of the Home" "গৃহ বিনাশ" শিরোনামে আর একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে নারীর ঘরের বাইরে আসার ফলাফল আরো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ৯৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ

"শিল্প বিপ্লবের হাতুড়ি নারীকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘর থেকে বের করেছে এবং পুরুষের কাজে নারীকেও নিয়োজিত করেছে। অথচ ঘরই ছিল নারীর আসল কর্মস্থল, যেখানে নারী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উষালগ্ন থেকেই নিজের সর্বোত্তম দৈহিক ও মানসিক পুঁজি খাটিয়েছিল। গৃহ বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হওয়ায় শুধু নারীর সুখ-শান্তিই বিনষ্ট হয়নি বরং গোটা সমাজ তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটা সর্বাত্মক নৈরাজ্যকর অস্থিরতার জন্য মঞ্চ একেবারেই প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং আমরা সকলে তার কুফল ভুগছি। মানসিক ব্যাধি ও স্নায়ুবিক বৈকল্যের রোগী যত বেশী সংখ্যায় আজকাল পাওয়া যায়, মানবেতিহাসে তার নজীর পাওয়া যায়না।"

"আজকের গৃহ কোনো গৃহ নয়, নিছক একটি থাকার জায়গা। কেউ কেউ একে পরিবর্তনশীল গৃহ বলে থাকে। কিন্তু এটা কেবল একটা খোশখেয়াল ও অলীক কল্পনা মাত্র। আধুনিক গৃহ কোনো বিকাশ ও লালনকারী প্রতিষ্ঠান নয়। বরং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা একটা ধ্বংসাত্মক যন্ত্র। তাই শাসক শক্তিগুলো ও তাদের এজেন্সীগুলো নিজেদের সঠিক বা ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থার নিরাপত্তার খ্যাতি এই সব আধুনিক গৃহকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং গৃহে অবস্থানকারীদের ওপর গোপন কিন্তু কঠোর অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। এই সব গৃহে ঘোরতর অস্থিরতা ও অশান্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং অধিকতর সামাজিক নৈরাজ্যের জন্ম দিচ্ছে। সরকার যত গোয়েন্দাগিরিই করুক, এ নৈরাজ্যরোধ করতে সক্ষম হবেনা। এখানে ভাবাবেগের কোনো প্রশ্ন ওঠেনা বরং এটা একটা বাস্তব ও সত্য ঘটনা, যার মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই।"

এরপর ঐ বইতে দেখানো হয়েছে যে, এ যুগে গৃহ পরিণত হয়েছে বাসস্ট্যান্ড অথবা মুসাফিরখানায়। এখানে গৃহের অধিবাসীরা কেবল গোসল করতে বা ঘুমাতে আসে।

অন্যথায় রাত ও দিনের বেশীর ভাগ সময় গৃহগুলোতে বিরাজকরে নিঝুম নিরবতা। তবে থিয়েটার, কফির দোকান, মদ্যশালা, রেষ্টুরেন্ট, নৃত্যশালা ও খেলাধূলার কেন্দ্রগুলো সারা দিনরাত জনাকীর্ণ থাকে। স্ত্রী বা মা হয়ে ঘরে বসে থাকার প্রবণতা নারীর ভেতর থেকে দ্রুত বিদায় নিতে চলেছে এবং সন্তান জন্মদান ও লালন পালনের গুরুত্ব শুধু নারীর কাছে নয়, গোটা সমাজের কাছেই ম্লান হয়ে পড়েছে। ১২৪ পৃষ্ঠায় এই পরিস্থিতির চিত্র আঁকা হয়েছে এভাবে ঃ

"গীর্জা ও রাষ্ট্র তাত্ত্বিকভাবে তো মাতৃত্বের দায়িত্বের খুবই প্রশংসা করে থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে, মা হওয়াটা এখন স্ত্রীর পক্ষে লাভজনক মনে হয়না। এর এখন আর কোনো মান-মর্যাদা নেই। যে শ্রেণীর হাতে চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্বের চাবিকাঠি বিদ্যমান এবং যারা চিন্তা-গবেষণার মাপকাঠি সরবরাহ করে থাকে, সে শ্রেণীটি এখন সন্তান প্রসবকে ঘৃণার চোখে দেখে। যে নারী সন্তানের ঝামেলা থেকে মুক্ত কিন্তু আইন সভার সদস্যা, পত্রিকার সম্পাদিকা, প্রবন্ধকার, অভিনেত্রী, চাকুরে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা বা শিক্ষিকা, সমাজে তার সম্মান মা হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা মহিলার চেয়ে বেশী। আজকালকার নারীর অনেক মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা রয়েছে। তবে তার জন্য সবচেয়ে জটিল সমস্যা হলো সন্তান জন্ম দেয়া। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অর্থনীতির দৃষ্টিতে সন্তান জন্মদানের পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে নারীর পথে কঠিন বাধা দাঁড় করানো হচ্ছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের সমর্থকরা সন্তান প্রসবকে সবসময় একটা অর্থনৈতিক আপদ হিসেবে তুলে ধরতে অভ্যস্ত। এ দ্বারা নারীর একটা প্রাকৃতিক কর্তব্য পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। আবার সন্তান থেকে বঞ্চিত থাকাও তার জন্য মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের বৈধতার স্বপক্ষে শুরুতে এই বলে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছিল যে, পৃথিবীতে যে গতিতে মানব সংখ্যা বেড়ে চলেছে, সেই গতিতে মানুষের খাদ্য পৃথিবীতে জন্মানো সম্ভব নয়। সুতরাং জনসংখ্যা সীমিত রাখা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু এটা এমন একটা মতবাদ ও অনুমান সর্বস্ব বক্তব্য যাকে সাম্প্রতিকতম উদ্ভাবিত তথ্য তত্ত্বের আলোকে সঠিক প্রমাণিত করা সম্ভব নয়। এছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য যত রকমের ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলোর ক্ষতিকর হওয়াও সন্দেহের ঊর্ধে নয়। কিন্তু গর্ভপাত ও জন্মনিয়ন্ত্রণ যেহেতু যৌন স্বেচ্ছাচারিতা ও লাগামহীনতার একটা কার্যকর মাধ্যম, তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভক্ত ও অনুরক্ত প্রাচ্য ও এশীয় দেশগুলিও তা জোরপূর্বক প্রবর্তনে বদ্ধপরিকর, চাই জনগণ তাতে সম্মত হোক বা না হোক। সম্প্রতি ইন্দিরা গান্ধী যে নির্বাচনী বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, তার প্রধান কারণ ছিল এই যে, তিনি ও তার পুত্র দেশে বাধ্যতামূলক জন্মনিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের সরকারী পরিবার পরিকল্পনা বিভাগও এই কর্মসূচী খুব ধুমধামের সাথে চালু রেখেছে। যত্রতত্র প্রকাশ্য স্থানে বড় বড় বিজ্ঞপ্তি টানানো রয়েছে। এসব

বিজ্ঞাপনে অগণিত শিশুর মাথা দেখিয়ে ওপরে দর্শনীয়ভাবে শিরোনাম দেয়া হয়েছেঃ "এই প্লাবন রোধ করুন।" একটা ছবিতে একটা ঝুড়ি দেখানো হয়েছে। ঝুড়িতে এক ডজন শিশু ভরে তা বাপের ঘাড়ে চাপিয়ে এই মহা দুর্যোগ থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। জাতিসংঘ, বৃটেন, জার্মানী, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা সবাই পাকিস্তানের জনসংখ্যা হ্রাসে বর্তমান সরকারকে সাহায্য করে চলেছে। কেননা ২৩ বছরে পাকিস্তানের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। নারী অধিকার কমিটি ও নারী সমাজের এই মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে উদাসীন নয় যে, তাদেরকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির "ধ্বংসাত্মক" কাজ থেকে বিরত থেকে অন্যান্য "গঠনমূলক" কাজে লাগানো দরকার। যে সরকারের হাতে এ কমিটির নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, সেটি কেমন কীর্তিমান সরকার, তাতো দেখতে হবে। সেই সরকার নিজের গৌরবময় কৃতিত্ব জাহির করে চলেছে যে, "পাকিস্তানের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কোনো মহিলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিয়োগ করা তারই কৃতিত্ব।" এহেন কীর্তিমান সরকারের নিযুক্ত কমিটি এরূপ করিৎকর্মা হবেনা তো কে হবে? এ জন্য কমিটির রিপোর্টের শেষাংশে পরিবার পরিকল্পনার জন্য কিছু নতুন আইন রচনার প্রস্তাবও করা হয়েছে। রিপোর্টের ১১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ঃ

"পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে কমিটি বিশেষভাবে মনোযোগী রয়েছে। কেননা একমাত্র পরিবার ছোট রাখলেই মহিলারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ ও নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়ন করতে পারে।" আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ নিম্নরূপ ঃ

ক. সকল ওষুধ বিক্রেতার জন্য গর্ভনিরোধক ওষুধ মজুদ রাখা বাধ্যতামূলক ও তার লাইসেন্সের জন্য অপরিহার্য শর্ত গণ্য করতে হবে। তাছাড়া ক্লিনিক ও হাসপাতালসমূহেও বিবাহিত লোকদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে বন্টনের জন্য গর্ভনিরোধক মজুদ রাখতে হবে।

খ. এম, বি, বি, এস-এ পাঠ্যক্রমে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়টি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

গ. মেডিকেল ডিগ্রীধারী ফিল্ড চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হয়নি, এমন নারী ও পুরুষ মাত্রকেই পরিবার পরিকল্পনার প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ঘ. পুরুষদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর থেকে বাড়িয়ে ২১ বছর করা হোক।

এখানে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও চরম দুঃখজনক সত্য উদঘাটন করা জরুরী মনে হচ্ছে। সেটি এই যে, এই রিপোর্ট যখন চূড়ান্ত আকারে প্রণীত হয়ে গিয়েছিল, তখনও তাতে ক্লিনিক ও হাসপাতালের সাথে "<u>সরকারী কর্মচারীবৃন্দ ও দশজনের চেয়ে বেশী কর্মচারী বিশিষ্ট বেসরকারী বাণিজ্য কেন্দ্রসমূহ</u>" এ শব্দগুলি লেখা ছিল। একেবারে শেষ মুহূর্তে যখন কমিটির চেয়ারম্যান সাহেব স্বাক্ষর দেন, তখন এ শব্দগুলো বাদ দেয়া

হয়েছে। অনুরূপভাবে রিপোর্টের চূড়ান্ত খসড়ায় "বিবাহিত লোকদের মধ্যে" কথাটা লেখা ছিলনা। এটিও পরে সংযোজিত হয়েছে। আমাদের কথা যদি কারো বিশ্বাস না হয়, তবে তিনি যেন একই রিপোর্টের সেই ভাষ্যটি পড়ে দেখেন। লাহোরের দৈনিক "সিন" এর ১৯শে জুলাই, ১৯৭৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ওটাই পত্রিকায় পাঠানো আসল রিপোর্টের ফটোকপি। ওটিতে উপরোক্ত রেখাটানা কথাটি ছাপানো অক্ষরে বিদ্যমান। কিন্তু তাকে কেটে দেয়া হয়েছে। অবশ্য খেয়াল করে দেখলে তা সহজেই পড়া যায়, "বিবাহিত" শব্দটা ১১৪ নং ধারায় আদৌ বর্তমান নেই। তবে চেয়ারম্যান সাহেব এটি নিজ কলম দ্বারা বাড়িয়ে দিয়েছেন। রিপোর্টের শেষে এর যে সারাংশ সংযোজন করা হয়েছে, তার ৩১ নং ধারায় এ শব্দটি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

শেষ পর্যায়ের এই রদবদল, সংযোজন ও বাদ দেয়া দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, এসব লোকের যদি সাধ্যে কুলাতো, তবে পাকিস্তানী জাতির লজ্জা, শরম এবং সতিত্ব ও সম্ভ্রমকে সমূলে উপড়ে ফেলে দিতো। আমার জিজ্ঞাস্য হলো, পৃথিবীর কোনো একটি দেশেও কি এমন দৃষ্টান্ত আছে যে, সেখানকার প্রত্যেক ওষুধের দোকান, ক্লিনিক, সরকারী অফিস ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ওপর গর্ভনিরোধক ওষুধ ও সরঞ্জাম মজুদ রাখা ও বিবাহিত অবিবাহিত নির্বিশেষে সকলকে তা সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে?

জন্মনিয়ন্ত্রণের সমর্থকগণ যেহেতু অনবরত এই আশ্বাস দিয়ে থাকে যে, জন্মনিরোধক বড়ি ও ওষুধসমূহ একেবারেই নির্দোষ বরং স্বাস্থ্য সংরক্ষক, তাই এখানে লাহোরের দৈনিক "সিন" পত্রিকার ১৬ই এপ্রিল ১৯৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত নিউইয়র্কের সাম্প্রতিকতম গবেষণালব্ধ রিপোর্টের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছিঃ

"নিউইয়র্ক, ৫ই এপ্রিল ঃ পোর্টরিকোতে স্থাপিত একটি বৃহৎ ওষুধ কারখানায় গর্ভনিরোধক ওষুধ তৈরী হয়ে থাকে। এখানে কর্মরত নারী ও পুরুষদের দেহে নারী হরমোনের আধিক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা কারখানার যে বাতাস ও পরিবেশে তারা শ্বাস গ্রহণ করে, তাতে এস্টোজেন নামক রাসায়নিক দ্রব্য ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে কতক পুরুষের বক্ষ অস্বাভাবিকভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং পুরুষত্বের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের পাউডার হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতো এমন পাঁচজন মহিলার এবং তৈরী বড়িগুলোকে শুধু স্পর্শ করতো এমন ১৮ জন মহিলার মধ্যে দশজনের যৌনাঙ্গ থেকে অস্বাভাবিক রকমের রক্তপাত শুরু হয়ে গেছে। এক বছর যাবত পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালানোর পর তার ফলাফল আটলান্টার ফেডারেল কেন্দ্রে পেশ করা হয়েছে। এই কেন্দ্রটি রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই অনুসন্ধান কার্যের তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর ম্যালকম হেরিংটন বলেছেন, এই বড়িগুলোর উপাদান প্রক্রিয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ বিপজ্জনক। এতে ক্যানসার হবেই, এমন কথা নিশ্চয় করে বলা না গেলেও আমি সন্দিহান। তিনি আরো বলেন, যে কোম্পানী এই অনুসন্ধান ও গবেষণা কর্মের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তা পাউডারের ধুলোবালি নিয়ন্ত্রণে

আদর্শ মানের ছিল তা সত্ত্বেও রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে বুঝা যায় যে, এই সব রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নতুন কোনো কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তিনি আরো জানান যে, ফেডারেল স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ বেশ কিছুকাল আগেই এই বিপদাশংকা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু বিগত মে মাস থেকে যে অনুসন্ধান কাজ চালানো হয়েছে তা অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করে দিয়েছে।"

উপরোক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে আমি নিজে কোনো পর্যালোচনা করার পরিবর্তে দৈনিক "সিন" এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করাই ভালো মনে করছি। পরের দিন ৭ই এপ্রিল এই রিপোর্ট সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে সম্পাদকীয়টি ছাপা হয়। উল্লেখ্য যে, এই পত্রিকাটি সাধারণতঃ সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক ও প্রবক্তা। "বড়ি ও মানুষ" (pills and the man) শিরোনামযুক্ত ঐ সম্পাদকীয় নিবন্ধে জনাব সম্পাদক সাহেব বলেন ঃ

"প্রকৃতি মানুষের চেয়ে বেশী জ্ঞানী। প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ নিঃসন্দেহে অর্থহীন। এ সংঘাতে মানুষ নিজেই আহত হয়ে থাকে। মানুষ প্রকৃতিকে বশীভূত করার চেষ্টা করে। অবশেষে প্রকৃতি তার প্রতি বিদ্রুপ করে। মানুষ তাকে বশীভূত করার পরিবর্তে নিজেই তার বশীভূত হয়ে যায়। প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করার পরিবর্তে তার সীমার ভেতরে থাকাই ভালো। নিজের সত্তার ভেতরেই হোক বা বাইরেই হোক, মানুষ যখন প্রকৃতির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন পরাভূত হয়। আমেরিকার রোগ প্রতিরোধ কেন্দ্র থেকে সম্প্রতি যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তার সারকথা এটাই। জন্মনিয়ন্ত্রণের ওষুধ প্রস্তুতকারী পুরুষ ও মহিলারা রোগাক্রান্ত। তাদের স্বাস্থ্য বিপদের সম্মুখীন। রাসায়নিক উপাদানগুলো যদি শুধু বাতাসের মাধ্যমে মানুষের দেহের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর ভাগকে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে যারা এই ওষুধ খায় ও ব্যবহার করে তাদের ও তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের কিরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, যে কারখানায় এই ওষুধ তৈরী হয়, তাতে বাষ্প ও কণাসমূহ নিয়ন্ত্রণের ভালো ব্যবস্থা রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এসব ওষুধের ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণুও তীব্র বিষক্রিয়াসম্পন্ন। এসব ওষুধ ব্যহারকারীরা এবং তাদের সন্তানেরা নিজেদের শরীর ও রক্তে যে কি কি বস্তু শুষে নিচ্ছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করছে, তা কে জানে?

সম্ভবতঃ এ কারণেই এসব লোকের পরবর্তী পুরুষ প্রজন্ম নিজেদের চালচলন ও আদত অভ্যাসে ক্রমবর্ধমান হারে নারীসুলভ হাবভাব প্রকাশ করছে। পক্ষান্তরে নারীদের ভেতরে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। এ রিপোর্ট থেকে এ শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, জাতীয় স্বাস্থ্য এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়, যাকে স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দয়ামায়ার ওপর ছেড়ে দেয়া চলেনা। উল্টো চলার পরিবর্তে প্রকৃতির সহজ সরল পথে চলার চেষ্টা করাই ভালো।"

নিত্যনতুন পরিসংখ্যানের ভেল্কি দেখিয়ে দিনরাত এই প্রচারণাও চালানো হয় যে, পৃথিবীতে বিশেষতঃ প্রাচ্য জগতে খাদ্যের ঘাটতি এত প্রকট যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি

থামানো না গেলে একদিন মানুষই মানুষকে খেতে আরম্ভ করবে। কিন্তু এই প্রতারণার জাল প্রতিনিয়তই ছিন্ন হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, ইংল্যান্ডের পত্রিকা গার্ডিয়ানের ১৯৭৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী সংখ্যায় ভাষ্যকার রিচার্ড নর্টন টেলারের একটা নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। ঐ নিবন্ধে খাদ্যাভাবজনিত দুর্ভিক্ষকে একটা "কেলেংকারি" সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে এতে বলা হয়েছে যে, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর খাদ্য উৎপাদন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে শতকরা ১৫৫ ভাগ। অথচ এই সময়ে দুনিয়ার জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র শতকরা ৬৬ ভাগ। সারা দুনিয়ায় বছরে প্রায় ১২৫ কোটি টন খাদ্য উৎপাদন হয়, যার অর্ধেক উন্নত দেশগুলোই খেয়ে ফেলে। অথচ তাদের লোকসংখ্যা গোটা পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মাত্র। কৃষি বিভাগের গত বছরের এক রিপোর্ট অনুসারে বাহির থেকে খাদ্য আমদানিকারক দেশের সংখ্যা পঞ্চাশ। এগুলোর মধ্যে ছেচল্লিশটি দেশের কৃষি উৎপাদনকে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ইচ্ছাকৃতভাবে সীমিত করে রাখা হয়। চীন ও ভারতে মানুষ যত খাদ্য খায়, তত খাদ্য উন্নত দেশগুলোর জন্তুজানোয়ার খায়।" এরপর প্রশ্ন জাগে যে, পাশ্চাত্যের দেশগুলো এশিয়া ও আফ্রিকার জনসংখ্যা কমানোর জন্য যেসব ওষুধ বা যন্ত্রপাতি এবং যেসব বই-পুস্তক সাহায্য হিসেবে পাঠায়, তার বদলে তারা কি মানুষের প্রতি সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে নিজেদের দেশের কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া ও অন্যান্য অনাবশ্যক বন্য ও গৃহপালিত জন্তু খতম করে অথবা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের খাদ্য বাঁচিয়ে প্রাচ্যের দেশগুলোতে পাঠাতে পারেনা। নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু যেহেতু তারা জানে যে, গর্ভনিরোধক বড়ি না খাওয়ালে নারী জাতির লজ্জা শরম খতম করা যায়না এবং তাদের ইচ্ছামত লাগামহীন সভ্যতার প্রচলন ঘটানো যায়না, তাই তারা খাদ্যের ন্যায়সঙ্গত' বন্টনের চেয়ে গর্ভনিরোধক বড়ি ও সরঞ্জাম বন্টনের কথাই বেশী ভাবে। অথচ "সভ্যতাবিবর্জিত ও অনুন্নত" দেশগুলোর জনগণ এই সব দান গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। ভারতের নয়া পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছেন যে, "পরিবার পরিকল্পনা" শব্দটিকে জনগণ এত ঘৃণা করে যে, আমি এই বিভাগের নাম পাল্টে "পরিবার কল্যাণ" নামকরণ করতে চাই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোনো জিনিসের নাম পাল্টালেই তার বাস্তবতাও কি পাল্টে যেতে পারে? [তরজমানুল কুরআন, মে, ১৯৭৭]

তুলুয়ে ইসলাম কর্তৃপক্ষের জ্ঞানের বহর

[হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠির মাসিক মুখপত্র তুলুয়ে ইসলামের কর্তৃপক্ষ নিজেদের একাধিক বই-পুস্তকে ইমাম বুখারীর (রঃ) ওপর এই মর্মে এক অত্যন্ত গর্হিত অভিযোগ আরোপ করেছে যে, তিনি বুখারী শরীফে অস্বাভাবিক যৌন সংগমের বৈধতা প্রতিপন্ন করে এরূপ একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পত্রিকার প্রকাশকদের কোন কোন সমর্থক কতিপয় পত্র-পত্রিকায়ও উক্ত অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছে। মালিক গোলাম আলী সাহেব এই মিথ্যা অভিযোগটি সুস্পষ্টভাবে খন্ডন করেছিলেন এবং ১৯৮৫ সালের

'তাসনীম' পত্রিকার হাদীস সংখ্যায় হাদীস অস্বীকারকারীদের রুচি ও তাত্ত্বিক সমতা" শিরোনামে তা ছাপা হয়েছিল। এই প্রতিবাদমূলক নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে, বুখারীর যে উক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, ওটা আসলে হাদীস এবং রসূল (সঃ)-এর বাণী নয় বরং বিশিষ্ট তাবেয়ী ও হাদীস বিশারদ আতার নিজস্ব উক্তি। আর এই উক্তির যে ব্যাখ্যা হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠী করেছে; তা আভিধানিক দিক দিয়েও ঠিক নয়। হাদীসের বিশ্লেষকগণের নিকটও গ্রহণযোগ্য নয়। মালিক সাহেবের ঐ নিবন্ধে প্রসংগত একথাও বলা হয়েছিল যে, যারা অন্যের বই অনুবাদ করে তাকে কোনো বরাত ছাড়াই নিজের মৌলিক রচনা হিসেবে প্রকাশ করে, তাদের পক্ষে অ-রসূলের বক্তব্যকে রসূলের বক্তব্য হিসাবে পেশ করা মোটেই বিচিত্র কিছু নয়। আসলাম জিরাজপুরীর দিকে ইংগিত করে এ কথাটা বলা হয়েছিল। কেননা তিনি কয়েকটি আরবী বই অনুবাদ করে নিজের নামে ছেপে দিয়েছিলেন। মালিক সাহেবের ঐ নিবন্ধটি পড়ে এক ব্যক্তি মাসিক "তুলুয়ে ইসলাম"কে চিঠি দিয়ে ঐ প্রতিবাদী বক্তব্য সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলেন। পত্রলেখক তার জবাবে তুলুয়ে ইসলাম পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষ থেকে একটি জবাব পান। তিনি এই জবাবের একটা কপি মালিক সাহেবকেও পাঠান এবং তার জবাব জানতে চান। মালিক সাহেব তার জবাব পাঠিয়ে দেন। এই জবাব তিনি (পত্র লেখক) তুলুয়ে ইসলাম সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে পুনরায় তাদের জবাব চান। তুলুয়ে ইসলাম দ্বিতীয় পর্যায়ে যা কিছু লেখেন, তার পাল্টা জবাব পুনরায় মালিক সাহেবের কাছে চাওয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত জবাবও লিখে পাঠান। তুলুয়ে ইসলাম ও মালিক সাহেবের জবাব লাহোর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক শিহাবে বেরিয়েছিল।] -সম্পাদক

তুলুয়ে ইসলামের প্রথম জবাব

আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবে জানাচ্ছি যে, হাদীস কয়েক রকমের আছে। একটি হচ্ছে মারফু হাদীস। এ হাদীসে সনদের ধারাবাহিকতা রসূল (সঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। আরেক প্রকার হচ্ছে মাওকূফ হাদীস। এ ধরনের হাদীসে বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা কোনো সাহাবী পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়। হযরত আতা (রাঃ) একজন সাহাবী। তাই যে হাদীস তিনি বর্ণনা করেন তা মাওকূফ হাদীস। ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থে হাদীসসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আলোচ্য হাদীস তার গ্রন্থে রয়েছে।

(২) আপনি আরবী অভিধানের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ "মুহীতুল মুহীত"-এ দেখুন। এতে বলা হয়েছে যে, مَسَّ যখন أَصَابَ يُصِيبُ সহযোগে ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হয় স্ত্রী সহবাস করা।

(৩) আমরা আল্লামা আসলাম জিরাজপুরীর লেখা "তারীখে নাজদ" (নাজ্দের ইতিহাস) দেখিনি, তবে তার লেখা "তারীখুল উম্মাত" (মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস) গ্রন্থখানা আমার সামনে রয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃতি

দিয়েছেন যে, তার এ গ্রন্থ আল্লামা শেখ মুহাম্মদ আল খারাজীর গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। "তারীখুল উম্মাত" ঐ গ্রন্থের অনুবাদ নয়, বরং ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

এই সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়ার পর আপনি নিজেই স্থির করুন কে মিথ্যা বলেছে এবং কে সত্য বলেছে? আপনি হয়তো জানেন, সাবেক জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওদূদী সাহেব এই ফতোয়া দিয়েই রেখেছেন যে, কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য মিথ্যা বলা শুধু জায়েয নয় বরং ওয়াজেব। তাই তার জামায়াতের লোকদের জন্য এ ধরনের ভুল বক্তব্য দেয়া তাদের আমীরের বক্তব্য অনুসারে শুধু জায়েয নয় বরং তাদের ওপর ওয়াজেব হয়ে যায়।

প্রসংগত জানাচ্ছি যে, পারভেজ সাহেব তুলুয়ে ইসলামের সম্পাদক নন। (সম্পাদক, তুলুয়ে ইসলাম)

গ্রন্থকারের প্রথম জবাব

আপনার চিঠি ও তুলুয়ে ইসলামের চিঠি পেলাম। তুলুয়ে ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক যে জবাব দিয়েছেন, সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা জরুরী মনে করছি।

মাওকূফ হাদীসের সংজ্ঞা কি এবং সাহাবীর উক্তি মাত্রই 'মাকূফ' পদবাচ্য কি না, আপাততঃ সে বিতর্কে আমি যেতে চাইনা। যারা হাদীসই মানেনা, তাদেরকে হাদীসের প্রকারভেদ ও সংজ্ঞা বুঝানো আর মোষকে বাঁশী বাজিয়ে শোনানো আমি একই রকম মনে করি।

তবে যে ব্যক্তি আতাকে সাহাবী বলে বা লেখে, তার অজ্ঞতা দেখে করুণা জাগে। ভেবে অবাক হই যে, এহেন জ্ঞানের বহর নিয়ে হাদীস ও মুহাদ্দিসগণ সম্পর্কে মন্তব্য করার ধৃষ্টতাও দেখানো হয়। আপনি যদি এই সম্পাদক সাহেবের নামটি আমাকে জানাতেন তবে খুবই ভালো হতো। সে যাই হোক, পারভেজ সাহেব না হয়ে থাকলে তাঁর কোনো না কোনো শিষ্য নিশ্চয়ই হবেন। সম্পাদক সাহেবকে বলে আর কি হবে, আপনাকেই বলছি যে, আতা সাহাবী নন, বরং মক্কার বিখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনে আবি রাবাহ। ইতিহাস, রিজাল শাস্ত্র, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের যে কোনো সাধারণ ছাত্রও তাকে চেনে। এ কথা বলা নিছক কথার মারপ্যাচ ছাড়া আর কিছু নয় যে, "ইমাম বুখারী স্বীয় সংকলনে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এ হাদীস তার সংকলনে আছে।" এ কথা বলা আর "চিড়িয়াখানার প্রত্যেক প্রাণীর নাম চিড়িয়া" বলা একই রকম। প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তিরই জানা আছে যে, বুখারীতে লেখা প্রত্যেক কথাই হাদীস নয়। সেখানে হাদীসের শিরোনামও আছে, যাকে "তরজমাতুল বাব" বলা হয়। সেখানে আভিধানিক, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও আছে এবং সংকলকের নিজের এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মতামত এবং ফতোয়াও লেখা আছে। এখন সংকলনে আছে বলে এগুলোর সবই হাদীস, এ কথা কি কেউ বলতে পারে? আকবর ইলাহাবাদী যেমন বলেছিলেন, "প্রত্যেক সাদা বর্ণের মানুষকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনে করলো" এটা তো

সেই ধরনেরই কথা হলো। তা ছাড়া বুখারীর সব হাদীসের মানও এক রকম নয়। একে যে কুরআনের পরেই সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ বলা হয়, সেটা বুখারীর সেই সব হাদীসকেই বলা হয়, যা ইমাম বুখারী সর্বোচ্চ মানের বিশুদ্ধ হাদীস জেনে লিপিবদ্ধ করেছেন।

"মুহীতুল মুহীত" এই মুহূর্তে আমার সামনে নেই। তবে এটি সম্পর্কে আপনাকে তিনটে কথা বলবো। প্রথমতঃ এটা একজন কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী খৃস্টান পাদ্রী প্যাট্রিস বুসতানীর সংকলন। আমি দেখেছি যে, হাদীস অস্বীকারকারীরা যত্রতত্র নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে এই গ্রন্থের বরাত দিয়ে থাকে। কিন্তু আমি এটিকে মোটেই নির্ভরযোগ্য মনে করিনা। কোনো মুসলমানের পক্ষে এটাও সমীচীন মনে করিনা যে, সে আরবী ভাষার শব্দ বিশেষণে বিশেষত ইসলামী ও ধর্মীয় বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে এ ধরনের লোকদের ওপর নির্ভর করুক। এ সব লোক একান্তভাবে তাত্ত্বিক ও গবেষণাসুলভ ভংগীতে যে সব কথা লিখেছে, তাতেও অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে এবং মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ, এই মহলেরই এক ব্যক্তির রচনা হচ্ছে 'আল মানজিদ'। এতে "তুলাকা" শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে, মক্কা বিজয়ের সময় যাদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান করা হয়েছিল। অথচ রসূল (সঃ) মক্কা বিজয়ের সময় মক্কাবাসীকে উদ্দেশ্য করে প্রদত্ত ভাষণে এ শব্দটির উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আজ আমি তোমাদেরকে সেই কথাই বলবো, যা নবী ইউসুফ তার ভাইদেরকে বলেছিলেন যে ঃ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ فَاذْهَبُوا فَانْتُم الطُّلَقَاءُ -

"আজ তোমাদের ওপর কোনো অভিযোগ নেই। যাও, তোমরা স্বাধীন।" ভেবে দেখুন মক্কা বিজেতার ঘোষণা কি ছিল, আর এই মুর্খ খৃস্টান কি বলে! মুহীতুল মুহীত সম্পর্কে দাবী করা হয় যে, আল্লামা মাজদুদ্দীনের লেখা "আল কামুসুল মুহীত" অবলম্বনে এটি লিখিত। কিন্তু "আল কামুসুল মুহীত" গ্রন্থে اَصَابَ مِنْ অর্থ 'সংগম' লেখা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ কোনো শব্দ বা পরিভাষা কুরআন, হাদীস বা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকলে তার মর্ম উদ্ধার করার জন্য নিছক অভিধানের সাহায্য নেয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। এমনকি অনেক সময় তা মারাত্মক গোমরাহীরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের শব্দের সার্থক মর্ম উদ্ধারের জন্য মূল গ্রন্থাবলীতে যেখানে যেখানে ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করা চাই। আর মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও হাদীস বিশ্লেষকগণ তার ব্যাখ্যায় যা কিছু লিখেছেন, তাও নজরে রাখতে হবে। এ সব জরুরী জিনিসগুলো উপেক্ষা করে যে ব্যক্তি কেবল অভিধান দেখেই ব্যাখ্যা করা শুরু করবে, তার পক্ষে বিচিত্র নয় যে, وَمَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ (যে বিপদই আসুকনা কেন, আল্লাহর অনুমতিক্রমেই

আসে) এ আয়াতেও হয়তো 'সংগম' এর অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করবে। (কেননা অভিধানের বক্তব্য অনুসারে এখানেও اصاب من এসেছে।)

তৃতীয়তঃ অস্বাভাবিক সংগমকে দ্ব্যর্থহীনভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা সম্বলিত সহীহ হাদীস যখন রয়েছে এবং মুফাসসির মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ যখন এটিকে শুধু হাদীস থেকে নয়, বরং কুরআন থেকেও হারাম প্রমাণিত করেন, তখন একমাত্র তাবেয়ী আতার বক্তব্যকে সম্বল করে এবং তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে তার প্রচার করে বেড়ানো কি কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হতে পারে? হাদীস অস্বীকারকারী এবং অন্য সমস্ত বাতিল ও গোমরাহ ফেরকার গোমরাহীর আসল কারণ এটাই যে, তারা সুস্পষ্ট সত্যকে দেখতে পায়না, অথচ বিরল অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক উক্তিগুলো খুঁজে খুঁজে তার আশ্রয় নেয়। তারা যদি নিজেদের আসল রোগটি চিনতো এবং তা চিকিৎসার চেষ্টা করতো, তবে তাদের এমন দুর্গতি হতোনা।

মোটকথা, এই উক্তি থেকে হাদীস অস্বীকারকারীগোষ্ঠী যে মর্ম বা তত্ত্ব উদ্ধারের চেষ্টা করছে, তার বিপক্ষে এক অকাট্য সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান যে, এক আধটা উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের ভ্রান্ত ও অস্বাভাবিক ধ্যান-ধারণাকে সঠিক প্রমাণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তারা যদি "মানিনা , মানবোনা" জপ করতেই থাকে, তাহলে তাদেরকে ফেরানোর সাধ্য কারো নেই।

"তারীখুল উম্মাত" বইখানার প্রথম সংস্করণ আপাততঃ আমার কাছে নেই। আমার মনে হচ্ছে যে, তাতে আল্লামা আল খাজরীর অনুকরণে লেখা- এই মর্মে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। পরে যখন তা নিয়ে গুঞ্জন উঠেছে, তখন দায়সারা গোছের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে যে, এই বই আল খাজরী সাহেবের বই এর অনুবাদ নয়- তবে ওটা অবলম্বনে লেখা। একজন পাঠক উভয় বই মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে, কথাটা সত্য কি না। (বিনীত গোলাম আলী)

তুলুয়ে ইসলামের দ্বিতীয় জবাব

যে হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা কোনো তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায় তাকে "মাকতু" বলা হয়। হাদীসকে মারফু, মাওকুফ ও মাকতু-এ তিন শ্রেণীতে স্বয়ং হাদীস শাস্ত্রকারগণই বিভক্ত করেছেন। ইমাম বুখারী হযরত আতার এই উক্তিকে নিজের পক্ষ হতে সংযোজিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হিসেবে উল্লেখ করেননি কাজেই একে হাদীস বলা ভুল হলো কেমন করে।

(২) এ কথা সত্য যে, অমুসলিমরা বিদ্বেষের বশে অনেক কিছু ইসলামের বিরুদ্ধেও বলে থাকে। কিন্তু অভিধানের একটা মামুলী শব্দ সম্পর্কে এরূপ বলা যে, "যেহেতু এ কথা একজন খৃস্টানের অভিধানে লেখা হয়েছে, কাজেই তা ভুল", জ্ঞানগতভাবে খুবই বাড়াবাড়ি। اصاب يصيب এর এ অর্থ শুধু একজন খৃস্টানের অভিধানেই রয়েছে, তা নয়- বরং 'মিসবাহ'তেও এই অর্থ দেয়া হয়েছে। দুঃখের বিষয়

যে, চিঠিপত্রে কোনো বিষয়ে বেশী বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়। নচেৎ আমরা বিস্তারিতভাবে লিখতাম যে, এই শব্দের এই অর্থ ধাতুগতভাবে কিভাবে এলো।

(৩) আপনার এই চিঠি থেকে মনে হয়, আপনার আসল খট্‌কা স্ত্রীর মলদ্বারে সংগম করা সম্পর্কে। আপনি শুনে অবাক হবেন যে, এ বিষয়ে আমাদের বিভিন্ন ইমাম অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ এ কথাও লিখেছেন যে, আমাদের অনেক বড় বড় ইমাম, যেমন ইমাম মালেক (রঃ) এ কাজকে শুধু বৈধ মনে করতেননা, নিজে এটি অনুসরণও করতেন। আপনি যদি এর বিশদ বিবরণ চান তবে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রচিত বুখারীর ব্যাখ্যায় نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ এই আয়াতের তাফসীর অংশে দেখুন। বুখারীর অপর ব্যাখ্যা ফাতহুল বারীতেও এই আলোচনা দেখা যেতে পারে। আমাদের মতে, এ বিষয়টি যেহেতু সরাসরি কুরআনের বিরুদ্ধে যায়, তাই এটি ভ্রান্ত।

(৪) তারীখুল উম্মাতের যে সংস্করণ আল্লামা আসলাম জিরাজপুরীর জীবদ্দশায় জামেয়া মিল্লিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে এ স্বীকৃতি রয়েছে। আমার জানা নেই যে, ওটাই প্রথম সংস্করণ, না তার আগেও কোনো সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। যারা বলে যে, জিরাজপুরী সাহেব নিজের বইতে এ স্বীকৃতি দেননি, তাদের নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা উচিত যে, তাঁর বই-এর কোনো সংস্করণে এ কথা বলা হয়নি। (সম্পাদক-তুলুয়ে ইসলাম)

মালিক গোলাম আলীর দ্বিতীয় জবাব

তুলুয়ে ইসলাম কর্তৃপক্ষের জবাবের কপি পেয়েছি। আমার মতে, এটা বিবেচনার যোগ্য নয়। তথাপি আপনি যেহেতু এটি পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাই আরো কয়েকটি কথা বলছি। প্রথম জবাবে তুলুয়ে ইসলাম সম্পাদক আতাকে সাহাবী আখ্যায়িত করে বলেছিলেন যে, এটি সাহাবীর উক্তি। এটি হাদীসে মাওকূফ। এখন আতাকে তাবেয়ী মেনে নিয়ে বলা হয়েছে এটি তাবেয়ীর উক্তি, তাই হাদীসে মাকতু। তিনি যে আতাকে তাবেয়ী মেনে নিয়েছেন, এও তার কম দয়া নয়। নচেৎ তারা যদি জিদ ধরে বলতেন যে, আতা তো সাহাবীই ছিলেন, কিন্তু অনারব বিশ্বের ষড়যন্ত্রের কারণেই তাকে সাহাবীর দল থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে, তাহলে কিছু করার ছিলনা। কিন্তু আমি এখনো বুঝতে পারলামনা যে, তারা কি বলতে চান, আর যা বলতে চান তার অর্থ তারা বোঝেন কিনা। নাকি কেবল তোতা পাখির মত না বুঝেই আউড়ে যাচ্ছেন। আমার অনুরোধ, আপনি তাদেরকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করুন যে, প্রত্যেক সাহাবীর প্রত্যেক উক্তি মাওকূফ এবং প্রত্যেক তাবেয়ীর প্রত্যেক উক্তি মাকতু-এ কথা কি হাদীস শাস্ত্রকারগণ যথার্থই বলেছেন? সাহাবী ও তাবেয়ীদের যে হাজার হাজার লাখ লাখ উক্তি হাদীসগ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে, তার সবই কি মাওকূফ ও মাকতু হাদীসের পর্যায়ভুক্ত? প্রত্যেক সাহাবী ও তাবেয়ীর ২৪ ঘন্টার যাবতীয় কথাবার্তা কি শুধুই মাওকূফ ও মাকতু হাদীসের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ এবং এ ছাড়া তাদের মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুতনা? তুলুয়ে ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক সাহেব যদি এর জবাব ইতিবাচক দেন, তাহলে তিনি যেন এমন দু'চারজন মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করেন যারা এ ধরনের উদ্ভট বক্তব্য দিয়েছেন। তাছাড়া ঐ সব মুহাদ্দিসের স্বলিখিত কিছু উক্তিও আপনি তুলুয়ে ইসলাম কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে চাইবেন, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা তাদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মুহাদ্দিসগণের ওপর অপবাদ আরোপ করছে কি না অথবা মুহাদ্দিসগণ যা বলেছেন, এরা তার ভিন্ন মর্ম উদ্ধার করেছেন কি না?

এ প্রসংগে আরো একটা প্রশ্ন জাগে। সম্মানিত সম্পাদক সাহেব এ কথাও লিখেছেন যে, হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা যদি কোনো তাবেয়ী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায়, তাকে মাকতু বলে। তাই আতার উক্তিও হাদীসে মাকতু। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইমাম বুখারী কি এই মাকতু হাদীসের বর্ণনা পরম্পরা তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছিয়েছেন এবং আতা পর্যন্ত গিয়ে থেমে যাওয়া বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়াও খুবই জরুরী। 'মিসবাহ'এর বরাত দিয়ে যে কথা বলা হয়েছে তাও আমি বুঝতে অক্ষম। এর অর্থ যদি আল্লামা আহমাদ আল ফাইয়ুমীর প্রণীত "আল মিসবহুল মুনীর" হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান। কিন্তু এর যে কপিটি আমার কাছে আছে তাতে আমি উল্লিখিত উদ্ধৃতিটি পাইনি। আপনি এও জেনে নেবেন যে, মিসবাহ কার লেখা বই এবং তার কোন্ সংস্করণের কত পৃষ্ঠায় এই অর্থ লেখা রয়েছে। মূল উদ্ধৃতিটি তুলে দিলে পুরো বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যাবে। এ প্রসংগে আমার পূর্ববর্তী প্রতিবাদী বক্তব্য বহাল থাকবে।

اَصَابَ يُصِيبُ এর অর্থ যদি কোনো অভিধানে সংগম লেখা থাকেও, তথাপি বড় জোর এ শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক হিসাবে চিহ্নিত থাকবে। আর এ ধরনের একটা দ্ব্যর্থবোধক শব্দের এরূপ অর্থ করা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়, যা পূর্বাপর বক্তব্যের সাথেও মিল খায়না। যার ব্যাখ্যাকারীরাও এরূপ ব্যাখ্যা করেনি এবং যা কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের মতেরও বিরোধী।

আল্লামা আইনী কৃত বুখারীর ব্যাখ্যার বরাত দিয়ে ইমাম মালেক সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তাও হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠীর চিরাচরিত বিপথগামিতারই ফসল। তারা তাদের কালো চোখ দিয়ে যা দেখে, তা কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয় এবং তার অন্ধকার দিকটাই শুধু তাদের সামনে আসে। যে দিকটা উজ্জ্বল কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যের বিরোধী সেটিকে তারা উপেক্ষাই করে। আসল ব্যাখ্যা এই যে, প্রাচীন পুস্তক লেখকদের তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহের একটা আলাদা নিয়ম ছিল। তাদের কাছে তাদের পূর্বসূরীদের পক্ষ থেকে যে যুক্তি ও উক্তির উদ্ধৃতি পৌছতো তা তারা হুবহু নিজেদের বই পুস্তকে লিখে নিতেন এবং পক্ষের ও বিপক্ষের সকল মতামত একত্রিত করতেন। গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য এগুলো কাঁচামাল হিসেবে গণ্য হতো এবং তার বিভিন্ন দিকের তুলনামূলক পর্যালোচনার পরই একজন গবেষক বা ছাত্রের পক্ষে বুঝা সহজ হয়ে যেত

যে, কোন কথাটা সঠিক ও যুক্তির দিক দিয়ে সবল, আর কোন্ মতটা ভুল এবং যুক্তির বিচারে দুর্বল। প্রাচীন মনীষীদের মধ্যে যারা এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক ভিত্তিক বিশ্বকোষ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই সব সংগৃহীত তথ্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে নিজেই তার ব্যক্তিগত গবেষণায় কোন্ মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। আবার কেউ কেউ এই সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার অন্যদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটি তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সততা ও ইনসাফের নিদর্শন যে, তারা কোনো কোনো তথ্য বা মতামতকে অপছন্দনীয়, অকথ্য এবং ব্যক্তিগত মত ও পথের বিপরীত জেনেও তাকে নিজের আলোচনা ও যুক্তিতর্কে শুধু এজন্য স্থান দিয়েছেন যে, পাঠকের সামনে সকল তথ্য এসে যাক এবং যে ব্যক্তি এর কোনো তথ্যকে প্রত্যাখ্যানযোগ্য মনে করে সে যথাযোগ্য সমালোচনা ও তথ্যানুসন্ধানের পর উপযুক্ত যুক্তির সাহায্যে তা প্রত্যাখ্যান করুক। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা গ্রহণযোগ্য মনে করে সে যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে তাকে গ্রহণ করুক ও বৈধতা দান করুক। এ ধরনের বিরাট বিরাট গ্রন্থ থেকে সত্য ও হেদায়াত অনুসন্ধানের জন্য ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও ন্যায়নিষ্ঠার মত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। যারা সংকীর্ণমনা, অসহিষ্ণু ও দ্রুততাপ্রিয় এবং যারা আগে থেকেই নিজের পছন্দনীয় মতামত স্থির করে রেখেছে, তাদের পক্ষে এসব গ্রন্থ থেকে উপকৃত হওয়া ও সুপথের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব। তাদের অবস্থা হবে এই যে, নিজের মতের পক্ষে সামান্য একটা উক্তি পেলেই বোগল বাজিয়ে নাচবে। আর তার বিরোধী কোনো কথা হয়তো তাদের চোখেই পড়বেনা। আর পড়লেও তা দেখেও না দেখার ভান করবে।

আল্লামা আইনীর গ্রন্থের বেলায়ও এটাই হয়েছে। ঐ গ্রন্থে তুলুয়ে ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক শুধু এটাই দেখতে পেয়েছেন যে, ইমাম মালেক মলদ্বারে সংগম করা বৈধ মনে করতেন এবং নিজেও করতেন-এই মর্মে একটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। অথচ আল্লামা আইনী এই উক্তিটি উদ্ধৃত করার পর এ কথাও বলেছেন যে, ইমাম মালেক সম্পর্কে এরূপ মতামত প্রচলিত থাকলেও তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে এবং ইমাম মালেকের শিষ্যরা এ কথা অস্বীকার করেছেন। আল্লামা আইনী এ ব্যাপারে খ্যাতনামা মালেকী ফেকাহবিদ ইবনে আরাবীর গ্রন্থ আহকামুল কুরআনের উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। সেই আহকামুল কুরআন পড়লে দেখা যাবে যে, সেখানে ইবনে আরবী এ ব্যাপারে নিজের দ্বিমত প্রকাশ করার পর মালেকী মাযহাবের ফতোয়াও এই মর্মে উদ্ধৃত করেছেন যে, মলদ্বারে সংগম অবৈধ। সেখানে একই মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম কাযী তুসীর এই বক্তব্যও তুলে দিয়েছেন যে, "মলদ্বারে সংগম করা অবৈধ করেছেন তা হলো ঐ অংগের সাময়িক অপবিত্রতা। আর সাময়িক অপবিত্রতার কারণে যখন যোনিতে সংগম নিষিদ্ধ, তখন চিরস্থায়ীভাবে ও অনিবার্যভাবে অপবিত্র ও নোংরা মলদ্বারে সংগম করা অবশ্যই অবৈধ প্রমাণিত হয়।" ইমাম মালেকের মতামতকে মালেকী মাযহাবের এই সব বড় বড়

আলেমের চেয়ে ভালোভাবে আর কে বুঝতে পারে!

তা ছাড়া আইনী এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, জাবের, আমর ইবনুল আস, আবুদ দারদা খুযায়মা ইবনে সাবেত, আবু হুরাইরা, উবাই বিন তারেক ও উম্মে সালমা প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম এ কাজকে হারাম জানতেন। আর তাবেয়ী ও অন্যান্য ইমাম ও ফকীহদের যে তালিকা আইনী দিয়েছেন, তার মধ্যে অন্যান্যরা ছাড়া স্বয়ং আতা ইবনে আবি রাবাহও রয়েছেন। এরা সবাই এই কাজটি হারাম মনে করতেন।[১] তা ছাড়া যে সব হাদীস দ্বারা এ কাজের হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়, তাও আইনী উল্লেখ করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, মুসলিম উম্মাহর সকল উল্লেখযোগ্য আলেম এ ব্যাপারে একমত। এখন আইনীর গ্রন্থে এসব কথা যার নজরে পড়েনা, অথচ শুধুমাত্র ইমাম মালেকের মলদ্বারে সংগমের বৈধতা সংক্রান্ত উক্তিটাই চোখে পড়ে, তাকে মাছি ছাড়া আর কিসের সাথে তুলনা করা যায়? মাছি তো বাগানের সমস্ত ফুল ও ফল বাদ দিয়ে কেবল নোংরা পঁচা জিনিসে ও ময়লার ওপরই যেয়ে বসে।

সমাপ্ত

---

১ হযরত আতার এই অভিমত জানার পর বুখারীতে তাঁর উদ্ধৃত উক্তির যে অর্থ মুনকিরে ইসলাম কর্তৃপক্ষ বর্ণনা করেছেন, তার যৌক্তিকতা কোথায় থাকে?

رسائل و مسائل

حصۂ ہفتم

শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২